চাঁদনী

শুজা রশীদ

চাঁদনী – শুজা রশীদ

মাইন্ডটকার্স পাবলিশিং

প্রথম প্রকাশঃ জুন ২০১৭

স্বত্বঃ লেখক

প্রচ্ছদঃ মঞ্জুর মুরাদ

মুদ্রনঃ টরন্টো, কানাডা

মূল্যঃ ৯.৯৯ ডলার (কানাডা)

ISBN #: 978-1-928061-03-8

Copyright © 2017 by Shuja Rasheed

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner.

This is a work of fiction. Names, characters, places and incidents either are the product of the author's imagination or are fictitiously, and any resemblance to any actual persons, living or dead, events, or locales is entirely coincidental.

First Edition

Cover page: Manzur Murad

Printed in Canada

Publisher: MindTalkers Publishing

উৎসর্গ

স্ত্রী মিলিকে, ভৌতিক কর্মকান্ডে যার প্রগাঢ় বিশ্বাস

এই লেখকের অন্যান্য বইঃ

নিশীথ কুহু
গহীন অরণ্যে বৃষ্টি
জ্যোৎস্না রাতে
কান্না হাসির সমুদ্র
নীলি
মোহনায় দাঁড়িয়ে
লুকোচুরি
যাদুকরের তাণ্ডবলীলা
ভুল করেছি ভালোবেসে
দামামা
সুখে দুখে কানাডা
শুভ্র বর্ষন
এই যাত্রা
স্পর্শ
জুজুবা
A boy and A War
Kicking in Toronto
Chronicles of Ali
Space Tiger
Crazy, Mad Adventure

এক

হরিণীটা অনেক্ষন ধরে ওর দিকে অপলক চেয়ে আছে। কাঠের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে শ' খানেক ফুট দূরে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রানীটাকে পরম আগ্রহ ভরে দেখছে জুলেখা। তিন তলা কাঠের বাড়ীটার সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচ ঢালা রাস্তা, সেখানে সারাক্ষন গাড়ী চলছে। রাস্তার শরীর ঘেঁষে এবং বাড়ীটার দুই পাশে ঘন পাইনের জঙ্গল পুরু হয়ে জন্মে চমৎকার আড়ালের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পেছনটাতে অনেক খানি জায়গা জুড়ে শুধু ঘেষো জমি, কিছুটা শুকনো, কিছুটা ভেজা - নিকটবর্তি একটা জলাভূমির অংশ, কয়েক শ' ফুট সমতলের পর খানিকটা উত্তাল হয়ে আরেক পশলা ঘন জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।
ওন্টারিওর শীতের প্রকোপ পেরিয়ে গিয়ে বসন্তের উষ্ণতা ঘিরে ধরছে মাত্র প্রকৃতিকে। তুষার এবং বরফের যেটুকু ছিল তাও সপ্তাহ দুয়েক আগেই গলে গেছে, কিন্তু এখনও চারদিকে ভেজা ভেজা একটা ভাব। হঠাৎ করেই চারদিকে যেন অসম্ভব জীবনের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে নব বসন্ত। জুলেখার ওন্টারিওতে প্রথম বসন্ত।
হরিণীটা এখনও অপলক তাকিয়ে আছে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে তার ভয় পাবার কোন কারণ আছে কিনা। জুলেখা নরম গলায় নিজ মনে বলল, "ভয় পেও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"
তার খুব ইচ্ছা করছে দৌড়ে বাসার ভেতর থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে আসে, কিন্তু ভয় হচ্ছে হঠাৎ নড়াচড়া দেখলে প্রানীটা ঘাবড়ে গিয়ে ছুট দেবে। আরও কয়েক মুহূর্ত তাকে পরখ করবার পর নিজ মনে আবার মাটি থেকে ছোট ছোট গাছ পালা খাওয়ায় মনযোগ দিল হরিণীটা। একটু পরে আরও দুটা কম বয়স্ক হরিণ এসে তার সাথে যোগ দিল। মুগ্ধ হয়ে গেল জুলেখা। কে ভেবেছিল এই সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসে, এই অদ্ভুত অচেনা জায়গায়, সে এমন অসম্ভব সুন্দর কিছু বন্ধু পাবে? সে মা হরিণীটার নাম দিল ডাগর। ছোট হরিণ দুটি খুব সম্ভবত তার বাচ্চা। তাদের নাম সে দিল চঞ্চল এবং টুকটুকি। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকা তাদের খুব পরিচিত। হয়ত কাছেই কোথাও তাদের বাস। হলে খুব ভালো হয়। একটা বন্ধু পরিবার পাওয়া গেল। চারদিকের এই জংলা পরিবেশে না দেখা যায় কোন মানুষ, না অন্য কোন বসত বাড়ী। কাছাকাছি মানুষের বসত আছে, কিন্তু গাছপালার জন্য নজর চলে না। এতো জায়গা থাকতে এমন নির্জন স্থানে এসে কেউ বাড়ী কেনে? জুলেখার অবশ্য তাতে তেমন কোন সমস্যা নেই। সে গ্রামের মেয়ে। নির্জনতায় সে অভ্যস্ত। এই দূর দেশে যখন পাড়ি জমিয়েছিল মনে অনেক আশংকা ছিল না জানি কোথায় কিভাবে গিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এই স্থানটা দেখার পর তার মনের ভয় কেটে গেছে। এ যেন পুরো একটা গ্রাম, শুধু তার একার জন্যে।
মিজান অবশ্য খুব ভয়ে ভয়ে আছে। মিজান তার স্বামী। বয়েসের অনেক ফারাক, কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়। পুরুষ মানুষের একটু বয়েস হলেই ভালো। তাদের মেজাজী ভাবটা চলে যায়, তারা অনেক স্থির হয়, মনযোগ দিয়ে কথা বার্তা শোনে। তাছাড়া,

জুলেখার অন্য কোন উপায় ছিল না। তার অর্থহীন, গতিহীন জীবনের গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসার এই একটাই উপায় তার ছিল। যা হয়েছে, হয়েছে। সে ওসব নিয়ে একদম ভাবতে চায় না। মিজান মানুষটা ভালো। হাসি খুশী, প্রেমময়। কথা বলে নরম গলায়, কথা বললে চুপ করে শোনে, জুলেখার প্রতিটি প্রয়োজন সে বলার আগেই ধরে ফেলে। মাত্র মাস খানেক হল এখানে এসে উঠেছে জুলেখা। মিজান নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে সেই সুদুর জামালপুর থেকে। প্লেনে সারাটা পথ শুধু শুনিয়েছে এই নতুন দেশের কথা। এই বাড়ীর কথা। নতুন স্বপ্নের কথা। বরাবরই তার ভয় ছিল জুলেখা এখানে এসে এই এতো বড় বাড়ী আর নির্জন প্রাঙ্গন দেখে ঘাবড়ে যায় কিনা। জুলেখা তাকে ভুল প্রমাণ করেছে। প্রথম দিন থেকেই সে যেন সব কিছুর সাথে ঝট করে একাত্ম হয়ে গেছে। নির্জনতা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। মিজান অবশ্য এতো সহজে আশ্বস্ত হয় নি। জুলেখার ভয় না করতে পারে, কিন্তু সে তো জানে না কত বিপদ নিরক্ষণ চারদিকে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন বদমাশ যদি জানতে পারে জুলেখা বাসায় একাকী থাকে, তাহলে হয়ত পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে। মিজান একটা কম্পিউটিং ফার্মে কাজ করে। বাসা থেকে সে কালে ভদ্রে কাজ করতে পারে, কিন্তু অফিসে তাকে প্রায়ই যেতে হয়। ক্লায়েন্টদের সাথে নিয়মিত মুখোমুখি আলাপ করাটা তার কাজের অংশীভুত। তার সর্বক্ষনের ভয় সে যখন অফিসে থাকবে, তখন জুলেখার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতি আধা ঘন্টায় একবার করে বাসায় ফোন করছে। খবর নিচ্ছে জুলেখার। কেমন আছে সে? বাইরে একা একা যেন বের না হয়। সে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে চলে আসতে চেষ্টা করবে।

জুলেখা তার এই উদ্বেগ দেখে মনে মনে হাসে। অযথা ভয় পায় লোকটা। নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা জুলেখার আছে।

ডাগর তার বাচ্চা দুটিকে নিয়ে দূরে সরে গেল। গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল একসময়। এবার কি করবে - ভাবছে জুলেখা। বাসার ভেতরে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে সে বিরক্ত হয়ে উঠছে। তাছাড়া এমন সুন্দর র্সুয জ্বলা দিনে কেউ কি ভেতরে বসে থাকতে পারে?

সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। পাঁচ ছয়টা কাঠের সিঁড়ি। ভুমি থেকে সামান্য উঁচুতে নির্মিত দোতলা কাঠের বাড়ী। উপরে ঢালু ছাদ, যেমনটা তুষারের দেশগুলোতে হয়ে থাকে। সে যেদিন এসেছিল সেদিনও অল্প কিছু তুষার জমে থাকতে দেখেছিল ছাদে। তারপর হঠাৎ করেই আবহাওয়া গরম হতে শুরু করল। মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই চারদিকের সমস্ত তুষার গলে গিয়ে একেবারে পানি পানি হয়ে গেল সব।

গ্রামে জুলেখার বাবার বিরাট বড় বাড়ী ছিল, দোতলা ইটের বাড়ী। বড় ব্যবসায়ী ছিল বাবা। মাছের ব্যবসা। যে বছর ব্যবসা ভালো হত সে বছর বাড়ীতে টাকা রাখবার জায়গা হত না। সারাক্ষন একটা উৎসব উৎসব ভাব লেগে থাকত। বাবার হাত খোলা ছিল। সবাইকে দরাজ দিলে দান খয়রাত করত। গ্রামের গরীব চাষারা তার নাম বলতে অজ্ঞান ছিল। মতি আলী বললে আশে পাশের আট দশ গ্রামের মানুষ চোখ বন্ধ করে চিনত।

একবার ভোটে দাঁড়াতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য মত পালটে ফেলে। ভোটে জিতলে সারা দেশের মানুষ তাকে নির্ঘাত চিনে যেত । নিজের বাবাকে নিয়ে জুলেখার খুব গর্ব ছিল। জুলেখার কাছে মনে হয় তার বাবার বিশাল বাড়ীও মিজানের বাড়ীর তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল। মিজানের সাথে তার যখন বিয়ে হয়েছিল বছর খানেক আগে, তখন সে শুনেছিল কানাডাতে মিজান আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, কিছু সহায় সম্পত্তিও আছে, কিন্তু বোঝে নি লোকটা এতো জায়গা জমি নিয়ে আর এমন রাজ প্রাসাদের মত একটা বাড়ী নিয়ে বসবাস করে। এখানকার বাসাবাড়ীগুলো অবশ্য তার দেশের মত না। নীচ তলায় সব খোলা মেলা, রান্না ঘর, লিভিংরুম, ফ্যামিলিরুম, ডাইনিং রুম, স্টোরেজ রুম আর উপরে আধা ডজন বিরাট সাইজের শোবার ঘর। তাদের মাত্র দু'জনার সংসারের জন্য অত্যন্ত বিশাল মনে হয়। একা একা তার বাসার মধ্যে হাঁটলে একটু অস্বস্তিই লাগে মাঝে মাঝে। নিরালা ভালো, কিন্তু এ যেন বেশী নিরালা।

পেছনের অঙ্গনে নেমে প্যাঁচপ্যাঁচে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ীটার এক পাশে চলে এলো জুলেখা। বাড়ীটা পশ্চিম মুখী। ফলে সামনে রোদ আসে বিকালে, আর পেছনে রোদ আসে সকালে। অধিকাংশ ফুল গাছের রোদ লাগে অন্তত আধা দিন কিংবা আরও বেশী, জানে সে। বাড়ীর দক্ষিন পাশটাতে বেশ বড় সড় জায়গা নিয়ে বাগান করা হয়েছে। এখানটাতে প্রায় সারাদিন রোদ পড়ে। যত্ন করে চারকোনা বাগান বানিয়ে সেখানে নানান জাতের পেরেনিয়াল উদ্ভিত লাগানো হয়েছিল। বসন্তের উষ্ণতা আসার সাথে সাথে হঠাৎ করেই যেন টগবগিয়ে মাথা উঁচিয়ে আকাশমুখী ছুটতে শুরু করেছে নতুন গজিয়ে ওঠা গাছগুলো। মাত্র ক'দিন আগেই বিষন্ন হয়ে থাকা প্রকৃতি আচমকা যেন কি এক নতুন বলে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। জুলেখা মুগ্ধ হয়ে গেছে এসব দেখে। পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে সে সযত্নে ছোট ছোট চারাগুলোর শরীরে হাত বোলায়। এই সব গাছ তার পরিচিত নয়। কিন্তু বইয়ে সে পড়েছে তারা শীতের সময় চুপটি মেরে পড়ে থাকে মাটির নীচে। গরম এলেই লাফিয়ে উঠে আসে। কোন গাছে কি ধরণের ফুল হয় দেখবার জন্য সে খুব উদগ্রীব হয়ে আছে।

বাগানটা পেরিয়ে আরও ফুট ত্রিশেক গেলে মাঝারী আকারের একটা শেড। ছোটখাট একটা একতলা বাড়ীর মত। পনের ফুট বাই বিশ ফুটের মত সাইজ। ভিনাইলের তৈরী, ঢালু ছাদ। ভেতরে রাজ্যের সব জিনিষপত্র রাখা – অধিকাংশই যন্ত্র পাতি, চার চাকার গ্রাস মোয়ার, কোদাল, কুড়াল থেকে শুরু করে কাঠ কাটার ইলেকট্রিক করাত... আরও কত কি! একবার কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকেছিল জুলেখা। এতো যন্ত্রপাতি এমন অগোছাল হয়ে আছে দেখে সে বেশ অবাকই হয়েছিল। মিজান এমনিতে খুব গোছান। একদিন সে সময় নিয়ে ভালো করে গুছিয়ে দেবে, ভাবল জুলেখা।

শেড টাকে পেছনে ফেলে আরেকটু এগিয়ে যেতে দেখল বিশাল এক পাইন গাছ শেকড় উপড়ে পড়ে আছে। গাছটা কম করে হলেও সত্তর-আশি ফুট লম্বা। হয়ত শেকড় দূর্বল ছিল, ঝড় ঝাপটায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। অনেক খানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে

আছে গাছটা। এই গাছ মিজানের পক্ষে একাকী সরানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। করাত দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে সরাতে হবে। বাসার ভেতরের ফায়ার প্লেসটা কাঠ ব্যবহার করে। মিজানের কাছেই শুনেছে, আজকাল এই ধরণের ফায়ার প্লেস খুব কমই আছে। তার বাড়ীটা কম করে হলেও চল্লিশ বছরের পুরানো। সে যখন কিনেছিল বছর বিশেক আগে তখন দাম অনেক কম ছিল। এখন কিনতে গেলে রাজার কোষাগার ফাঁকা হয়ে যাবে। এদিকে নাকি সাংঘাতিক দাম বেড়েছে বাড়ীর। বাড়ী ঘর, টাকা–পয়সা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চায় না জুলেখা, কিন্তু তারপরও মানুষটা যখন নিজ থেকে বলে তখন না শুনেও পারে না। মিজান এই এলাকার অনেক ইতিহাস বলে। সে যখন এই জায়গা কিনেছিল পানির দামে তখন আশে পাশে কেউ ছিল না। এখন তো চারদিকে মানুষ আর মানুষ। মাত্র আট দশ মিনিট ড্রাইভ করলেই দুনিয়ার যাবতীয় দোকান পাট। এজাক্স ছোট শহর কিন্তু কোন কিছুর অভাব নেই। তার বিশ্বাসই হয় না শহরের এতো কাছে এমন গ্রামীন জায়গা থাকতে পারে।

ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছটার পেছনে কিছুক্ষন সময় ব্যয় করল জুলেখা। মিজান হয়ত রাগ করবে কিন্তু তারপরও যেটুকু সে করতে পারে ততটুকু সে করবে। মিজানের কাজ একটু কমবে। এই গাছ নিশ্চয় এবারের শীতেই পড়েছে। বসন্ত এলে পরিষ্কার করবে বলে রেখে দিয়েছে।

ঘন্টা খানেকও হয়নি, বাসার মধ্যে ফোনটা বাজার শব্দ শুনতে পেল জুলেখা। নিশ্চয় লোকটা আবার অফিস থেকে ফোন করেছে। এতো ভয়ে ভয়ে থাকে। একটু পর পর ফোন করে জুলেখার গলা না শোনা পর্যন্ত তার ভয় কাটে না। একটা সেল ফোন ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে জুলেখা, বাসায় আরেকটা ল্যান্ড ফোন আছে। দুটোই পর পর বাজল। কোন টা না ধরায় একটার পর একটা বাজতেই থাকল। জুলেখা সেল ফোনটা সাথে আনতে ভুলে গেছে। সে দ্রুত পায়ে বাসায় ফিরে এসে দেখল ফোন ততক্ষনে থেমে গেছে। মিজানের সেলফোনে একটা ফোন দিল জুলেখা। ফোনে তাকে না পেলে মিজান ভয়ানক ভয় পেয়ে যায়। মিজান তড়িঘড়ি করে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসার দিকে রওনা দিচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মনে হয় কথা বলতে চেয়েছিল। জুলেখার ইচ্ছা হল না। সে *ব্যাস্ত আছি* বলে ফোন রেখে দিল। বাসায় এলেই কথা যা বলার বলা যাবে।

দুই

সে ফোন রেখে আবার পেছনের মাঠে ফিরে গেল। এবার দক্ষিনে না গিয়ে উত্তরের জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। প্রায় শ' তিনেক ফুট ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটার পর জঙ্গল।

নানা ধরণের নাম না জানা ঝোপ-ঝাড়, গাছ পালা, বসন্তের আগমনে গজিয়ে ওঠা নতুন পাতায় ঝলমল করছে। ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান জাতের চির সবুজ পাইন। শীতেও তাদের পাতা পড়ে না। কিন্তু বসন্তের প্রাণোচ্ছলতা যেন তাদেরকেও ছুঁয়ে গেছে। একটা পায়ে চলা চিকন পথ একে বেঁকে বনের ভেতরে দিয়ে চলে গেছে। ঢোকার মুখটাতে বেশী প্যাঁচপ্যাঁচে। শাড়ী এক হাতে গোড়ালীর বেশ উপরে তুলে কাদা ভেঙ্গেই এগিয়ে গেল জুলেখা। পায়ের স্যান্ডেল কাদায় মাখামাখি হল, পায়েও বেশ লাগল। লাগুক। ধুয়ে ফেল্লেই হবে। ক'দিন ধরেই আসব আসব করেও শেষ পর্যন্ত আসা হয় নি। বনের ভেতর দিয়ে ভেজা মাটি আর আগাছার ভীড় পেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতে পুকুরটা নজরে পড়ল। মিজান তাকে ইতিমধ্যেই বলেছে পুকুরটার কথা। এক শ' ফুট হবে লম্বায়, চওড়ায় হয়ত ফুট ষাটেক। দেখে মনে হয় না সেখানে কোন মাছ-টাছ আছে। শীতে নাকি পুরোটাই জমে বরফ হয়ে যায়। বসন্তে সেখানে ব্যাঙ, কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীরা এসে জড় হয়। পুকুরটার পাশ ঘেঁষে আরেকটু এগিয়ে গেলে বায়ে পড়ে চিকন ঝর্ণাটা, একে বেঁকে চলে গেছে প্রায় ফুট বিশেক ঢালু টীলার শরীর বেয়ে। ঢালের পাশে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে তাকাতে কলকলিয়ে ছুটে যাওয়া জলের ধারা দেখল জুলেখা। বরফ এবং তুষার গলছে, সেই পানি বহন করে নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটে গেছে অগভীর স্রোতস্বীনিটা। পানি প্রবাহের ক্রমাগত শব্দটা শুনতে ভালোই লাগছে। একবার ভাবল নীচে নেমে পানি পেরিয়ে জঙ্গলের ঐ পাশটা দিয়ে একটু হেঁটে আসবে। কিন্তু খেয়াল হল ঢালের মাটি ভেজা, কাদা কাদা হয়ে আছে। পিছলে পড়ে গেল শাড়ী টাড়ী সব নষ্ট হবে। ফোনটা আবার বাজছে। ধরল জুলেখা। মিজান। সে অফিস থেকে আজ একটু আগে বেরিয়ে পড়বে। কিছু আনতে হবে জুলেখার জন্য? কোথাও যেতে চায় জুলেখা? বাইরে খেতে চায়? মলে যেতে চায়? কি চায় সে? তার জন্য মিজান আকাশ পাতাল এবং সারা বিশ্ব এনে দিতে প্রস্তুত।

জুলেখা সেসব কিছুই চায় না। সে সংক্ষেপে সেটা জানিয়ে দিয়ে ফোন রেখে দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিল। রান্না করতে মন চাইছে। লোকটা বাংগালী খাবার খেতে পছন্দ করে। না হয় আজকে একটু রান্না করল। ফিরতি পথে দেখল ইয়াব্বড় একটা কালো কুচকুচে কাঠবেড়ালী। চারদিকে ছুটাছুটি করে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল। জুলেখাকে দেখেই একেবারে পাথর বনে গেল। হাঁ করে সেই যে তাকিয়ে আছে, চোখের পলকও ফেলছে বলে মনে হল না। জুলেখা ফিক করে হেসে ফেলল। "কি দেখছিস রে অমন হা করে?"

কাঠবেড়ালীটা মনে হল তার কথা বুঝতে পেরেছে। সে শরীরটাকে কেমন করে যেন একটু দোলাল, যেন বলতে চাইছে 'জানি না'। তারপর কথা নেই বার্তা নেই এক দৌড় দিয়ে একেবারে জুলেখার গায়ের উপর এসে পড়ল। জুলেখা ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু ধরা দিল না সে। আরেক লাফ দিয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৌড় দিয়ে

পালাল। জুলেখা তার নাম দিল 'পিচ্চী'। এমন কালো কুচকুচে কাঠবেড়ালী দেশে থাকতে সে কখন দেখেনি। এখানে আসা অবধি হ্যাংলা পাতলা কয়েকটাকে দেখেছে বনের মধ্যে ছোটাছুটি করে বেড়াতে। পিচ্চীকে প্রথম দেখল।

যতই সাবধানে চলাফেরা করুক, শাড়ীর তলটা ঠিকই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল। পা এবং জুতা কাদায় মাখামাখি। এভাবে সারাদিন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাসায় ফিরে একেবারে গোছল করবার সিদ্ধান্ত নিল। তার শুচিবায়ু আছে। আছে, আবার নেই। যখন নেই তখন সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, আবার যখন আছে তখন একটা ঝকঝকে জিনিষও ছুঁতে গেলে শরীর ঘিন ঘিন করে। যখন যেমন বোধ করে।

দোতলায় মাস্টার বেডরুমে চলে এলো জুলেখা। বিশাল কামরা, চারদিকে বড় বড় কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের অপূর্ব দৃশ্য উঁকি মারছে ভেতরে। ভারী কাপড়ের পর্দা দু' পাশে সরিয়ে রাখা। পেছনটাতে কোন মানুষ জনের বসতি না থাকায় ওগুলো বন্ধ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। তবুও রাতে বন্ধ করে জুলেখা। পুরো ঘর ভালো মত ঢাকা না থাকলে সে ঘুমাতে পারে না। বেডরুম সংলগ্ন বিশাল বাথরুম। গভীর বাথটাব। গ্রামে থাকতে সে কখন এসব ব্যবহার করে নি। তার বাবার বাড়ীতে মেয়েদের জন্য আলাদা পুকুর ছিল। সেখানেই সারা জীবন সাঁতার কেটে মনের সুখে গোছল করেছে সে। বিয়ের আগ পর্যন্ত। অনেক ইতিহাস। মোবাইল ফোনটাকে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা লক করল জুলেখা। বাড়ীতে কেউ না থাকলেও সে কখন দরজা খুলে গোছল করতে পারে না। তার অস্বস্তি লাগে।

বাথ টাবে গোছল করতে পছন্দ করে সে। একবার ভাবল দ্রুত শাওয়ার করে রান্নাঘরে চলে যাবে। কিন্তু শেষে মত পাল্টাল। মিজান নিজেও চমৎকার রান্না করে। জুলেখার চেয়ে ভালো। সুতরাং রান্না করে তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারটার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। সে হয়ত খেয়ে পছন্দ করবে না। মুখে অবশ্য কিছু বলবে না। হাসি মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ভাব করবে যেন সব কিছু খুব সুস্বাদু হয়েছে।

জুলেখা সময় নিয়ে বাথটাবে পানি ভরল। এই সময়টুকু সে চুপচাপ বসে বাথরুমের দেয়ালে টাঙানো কয়েকটা ছবি দেখল। বিখ্যাত এক ইটালিয়ান আর্টিস্টের ছবির কপি। আর্ট সম্বন্ধে সে খুব একটা জানে না। ছোটবেলায় অল্প বিস্তর ছবি আঁকতে পারত। কিন্তু তার বেশী কোন জ্ঞান তার নেই। মিজান তাকে বলেছে সে ছবি টবি তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রী নায়লা আবার অসম্ভব ছবি ভক্ত ছিল। সস্তায় সুন্দর কোন ছবি পেলেই সে কিনে ফেলত। অধিকাংশই বিখ্যাত ছবির কপি। বাড়ীর ভেতরের কোন দেয়ালেই কোন ছবি ঝুলতে দেখে নি জুলেখা। যার অর্থ সে আসবার আগেই সব সরিয়ে ফেলেছে মিজান। হয় কোথাও দিয়ে এসেছে, নয়ত বাড়ীর মধ্যেই কোথাও গুদাম করে রেখেছে। বাথরুমের দেয়ালে ঝোলানো এই দু'টি ক্ষুদ্র আকারের ছবির কথা সে হয়ত ভুলেই গেছে। দু'টি ছবিতেই নানা রঙের খেলা। কোন বাস্তব বস্তু নিয়ে আঁকা নয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষন তাকিয়ে থাকা যায়। কি যেন একটা যাদু আছে। জুলেখার ভালো লাগে দেখতে। তার নিজের অজান্তেই সে নায়লার কথা ভাবতে শুরু করে। কেমন ছিলেন মহিলা? নিশ্চয় খুব জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমতি ছিলেন। প্রেমময় ছিলেন কি? খুব কি কথা বলতেন? খুব

সামাজিক ছিলেন? নায়লা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই তার। মিজান এই ব্যাপারে একেবারেই কথা বলতে চায় না। যেন সে তার পূর্বের জীবনকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

বাথটাবের পানি ভরে গেছে, সাবধানে পানির মধ্যে নামতে নামতে একটা চাঁপা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে জুলেখা। একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষকে কি এতো সহজে ভুলে যাওয়া যায়? মিজান যতই চেষ্টা করুক, সে পারবে না। জুলেখা সেটা চায়ও না। একজন মৃত মানুষের প্রতি তার কোন রকমের হিংসাবোধ নেই। দু'বছর আগে বেশ ভোগার পর ক্যানাসারে মারা যান নায়লা। এইটুকু সে বিয়ের আগেই শুনেছিল। কিন্তু তার বেশী কিছু এখনও মিজানের মুখ থেকে বের হয় নি। প্রশ্ন করলেও উত্তর পাওয়া যায় না।

বাথটাবে গোছল করতে অদ্ভুত লাগে জুলেখার। এইটুকু পানির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে কি কোন আনন্দ লাগে? পুকুরময় সাঁতরে বেড়ানোর যে আনন্দ আর উচ্ছলতা, এই আবদ্ধ বাথরুমে সেই অনুভূতি কি করে আসবে? মিজান তার সাঁতার কাটবার আগ্রহের কথা জানতে পেরে তাকে সুইমিং পুলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। সারা রাজ্যের মানুষের সামনে পানিতে নামার কথা চিন্তাই করতে পারে না সে। মিজানের প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে। পানিতে শরীর ডুবিয়ে ধীরে ধীরে মাথাটাকে সম্পূর্ণ পানির নীচে নিয়ে এলো জুলেখা, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃসাড়ে ডুব দিয়ে থাকল। অনেক দিনের প্রিয় খেলা। দীর্ঘক্ষন থাকতে পারে।

মিজান বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে এসেছে। এখনও রাস্তায় অফিস ফেরত ট্রাফিকের ভীড় পুরোপুরি শুরু হয়নি। কোথাও কোথাও সে খানিকটা ভীড় পেয়েছে কিন্তু মোটামুটিভাবে বেশ দ্রুতই চলে এসেছে। চক্রাকার ড্রাইভয়েতে গাড়ীটাকে রেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছে। জুলেখার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। কোন প্রত্যুত্তর নেই। সে পেছনের দরজা খুলে কাঠের ডেক-এ বেরিয়ে এলো। চারদিকে দ্রুত নজর বোলাল। জুলেখাকে কোথাও দেখা গেল না। সন্দেহজনক কিছুও নজরে পড়ল না। সে ভেতরে ঢুকে এক দৌড়ে দোতলায় উঠে এলো। মাস্টার বেডরুমের দরজা বন্ধ। জুলেখা গোছল করতে গেলে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়, সে লক্ষ্য করেছে। মিজানের উপস্থিতিতেও। হয়ত নিরাপদ বোধ করে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। এতো বড় বাড়ীতে জুলেখাকে একা রেখে যেতে তার সর্বক্ষন ভয় করে কিন্তু আপাতত খুব একটা উপায় নেই। জুলেখা তাড়াতাড়ি ড্রাইভিং শিখে ফেলতে পারলে তাকে সে একটা গাড়ী কিনে দেবে। জুলেখা খানিকটা স্বাবলম্বী হলে মিজানের দুশ্চিন্তা কমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে যতখানি ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক বেশী সহজ-সরল জুলেখা। তাকে স্বাবলম্বী করতে সময় লাগবে।

জুলেখা গোছল করছে জানার পর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বাসার পেছনে চলে এলো মিজান। বসন্ত আসছে। বাগানে টিউলিপ উঠছে। নায়লার লাগানো টিউলিপ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার ভাবতেও কষ্ট হয় নায়লা আর নেই। নায়লার সাধের বাড়ীতে এখন জুলেখার বাস। নায়লা যদি কোনভাবে জানতে পারত মিজান তার মৃত্যুর পর এক তরুণী মেয়েকে নিয়ে আবার সংসার করবে, সে কি খুব রাগ করত? নায়লার শেষ দিনগুলোতে

মিজান শুধু চেষ্টা করেছে তাকে নানান ধরণের উপহারে ভরিয়ে দিতে। নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে, তাবৎ রেস্টুরেন্টে খেয়েছে – নায়লার মন থেকে সব অসুখ সংক্রান্ত উদ্বেগ সে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে নায়লার চিন্তা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে মিজান। কি লাভ? যতদিন সে বেঁচে ছিল মিজান তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। কিন্তু সে চলে যাবার পর নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। সে একা থাকতে চায় না। তার মনে হয় এই বাড়ী তাকে নিঃশব্দে গ্রাস করবে।

দক্ষিণের মাঠে বিশাল একটা পাইন গাছ ভেঙ্গে পড়ে ছিল, অনেক দিন আগেই খেয়াল করেছে মিজান। তার কাছে যন্ত্রপাতি সব আছে, কিন্তু এতো বড় একটা গাছ একা একা কেটে সরানোর মত ইচ্ছাশক্তি তার নেই। মাইক নামে একটা শ্বেতাঙ্গ হ্যান্ডিম্যান আছে, ঘর সংসার বলে কিছু নেই। বেসমেন্টে রুম ভাড়া করে থাকে। অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকে। যখন ভালো থাকে তখন কিছু কাজকর্ম করে। বিশ্বাসযোগ্য। মিজান অনেক দিন ধরে চেনে। কম করে হলেও পনের বছর। প্রথম দিকে তার নিজস্ব এপার্টমেন্ট ছিল, গার্ল ফ্রেন্ড ছিল, বেশ সুস্থ জীবন যাপন করত। কিন্তু তারপর ঠিক কি হল কে জানে, মদ খাওয়া বেড়ে গেল মাইকের, গার্লফ্রেন্ডের গায়ে হাত দেবার পর সেও লাথি মেরে সটকে পড়ে। বছর দশেক ধরে মাইকের জীবনের কোন ধরা বাঁধা গতি আছে বলে জানা নেই মিজানের। কিন্তু হাতের কাজ ভালো পারে। ইলেক্ট্রিক কাজ, প্লাম্বিং, মাটি কাটা, বাগান করা, কাঠ কাটা – যাবতীয় কাজ সে করতে পারে। তার কাজের রেটও খুবই সস্তা। মিজানের মত বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্ট আছে তার। তাদের ফাই ফরমায়েশ খেটে কোনরকমে দিন গুজরান করে মাইক।

মিজান দু' দিন আগে ফোন করে তাকে আসতে বলেছিল। গাছটার একটা ব্যাবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য করল গাছটা গতকালও যেখানে ছিল সেখান থেকে কম করে হলেও ফুট বিশেক সরে গেছে জংগলের দিকে। একটু অবাক হল মিজান। মাইক এতো তাড়াতাড়ি আসবে সে ভাবে নি। খবর দেবার দু'চার দিনের মধ্যে সাধারণত তার টিকি দেখা যায় না।

তিন

খাবার টেবিলে চুপচাপ বসে খাচ্ছে জুলেখা। গোছল করে একটা লাল-নীল ডোরা কাটা সুতির শাড়ী পরেছে। সোজা, ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে যতখানি সম্ভব শুকিয়ে পাট পাট করে আচড়িয়েছে। হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিয়েছে মিজান, কিন্তু জুলেখা ব্যবহার করে না। তার পছন্দ হয় না। চুল এমনিতেই শুকিয়ে যায়। সময় লাগে, কিন্তু শুকিয়ে যায়।

রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড থাকলেও সেখানে প্রায় কখনই খায় না মিজান। তাদের এমন চমৎকার একটা ডাইনিং রুম আছে; দামী, দশ জনের বসার উপযোগী টেবিল।

সেখানে বসে খেতেই সে পছন্দ করে। জুলেখা রান্নাঘরের কাউন্টারে বসে খেতে পছন্দ করে, কিন্তু মিজানকে অযথা মনকষ্ট দিতে চায় না।

জুলেখাকে গোছল করতে দেখে মিজান নিজেই দ্রুত রান্না করেছে। সে ভালো রান্না করে, করতে পছন্দও করে। জুলেখা রান্নাঘরের কাজ কর্ম পারে, রান্নাবান্নাও কিছু পারে বলে মনে হয়, কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা করতে দেখে নি মিজান। নতুন জায়গায় নতুন সংসারে কিছু সময়তো লাগবেই, নিজেকে বুঝিয়েছে মিজান। নায়লা বেঁচে থাকতেও অধিকাংশ সময় মিজানই রান্না করত। এটা তার কাছে কোন নতুন বিষয় নয়।

"মাছটা কেমন হয়েছে?" মিজান নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

নিঃশব্দে মাথা দোলায় জুলেখা। ভালো। মুখে কিছু বলে না। মিজান খেয়াল করেছে এটা জুলেখার একটা স্বভাব। কোন প্রশ্নের উত্তর সে ঝট করে দেয় না। ঘাড় নাড়িয়ে চালানোর চেষ্টা করে।

"আমার রান্না তোমার ভালো লাগে?"

আবার মাথা দোলায় জুলেখা। হ্যাঁ।

"আরেকটু ভাত দেব?"

মাথা নাড়ায় জুলেখা। না।

নিজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর আছে জুলেখার। সে একহারা গড়নের, চমৎকার শারীরিক কাঠামো। মিজান এটা পছন্দ করে। সবারই উচিৎ শারীরিকভাবে সুন্দর এবং ফিট থাকার চেষ্টা করা। তার নিজেরই তো প্রায় ষাটের মত বয়েস হল, কিন্তু সে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজের শরীর ঠিক রেখেছে, নিয়মিত ব্যায়াম করে। তাকে এখনও অনেক তরুণ দেখায় বয়েসের তুলনায়। জুলেখা তার দিকে তাকালে কি দেখে? সে কি বুঝে শুনেই এই বয়েসী লোকটাকে বিয়ে করেছিল? জিজ্ঞেস করেছে মিজান, কোন উত্তর কখনই পায় না।

"ও, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি," মিজান বলল। "মাইক এসেছিল নাকি? গাছটার ব্যবস্থা করবার জন্য ওকে আসতে বলেছিলাম।"

আবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ে জুলেখা। একটু পরে নীচু গলায় বলল, "জানি না। ও তো চুপি চুপি কাজ করে চলে যায়।"

কথাটা ঠিক। কয়েক দিন আগে এসে ড্রাইভওয়ে থেকে জমে থাকা তুষার এবং বরফ সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এতো বড় ড্রাইভওয়ে একা একা পরিষ্কার করতে পারে না মিজান। মাইককে বললে সে একটা স্নো প্লাউ কারো কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এসে সব পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। সাধারণত অনেক তুষার পড়লে তাকে ডাক দেয় মিজান। এপ্রিল মাসে তুষার খুব কমই পড়ে কিন্তু এবার হঠাৎ একদিন খুব তোড়জোড় করে পড়েছিল। জুলেখা আসার পর ঐ একদিনই পড়েছে। ভীষণ খুশী হয়েছিল জুলেখা। চারদিকে এমন সাদা ধবধবে হয়ে যেতে পারে সে চিন্তাই করতে পারে নি।

খাবার পর মাইককে ফোন দেবে, মনে মনে ভাবল মিজান। কথা ছিল মাইক গাছটাকে কেটেকুটে একেবারে নিয়ে যাবে। একপাশে সরিয়ে রেখে কি লাভ? একা একা মাইক এই গাছ কিভাবে সরালো সেটাও একটা প্রশ্নের ব্যাপার। মিজানের চেয়ে আরও বছর

পাচেকের বড়ই হবে মাইক। লম্বা চওড়া, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য দেখে আরও বুড়ো মনে হয়। হয়ত সাথে কাউকে নিয়ে এসেছিল।

ডিনার শেষ হতে সাতটা বাজল। মিজান ফিরতি পথে চকলেট কেক নিয়ে এসেছিল, সেটা পরিবেশন করল খাবার পর। জুলেখার খুব পছন্দ। কথাবার্তা অবশ্য প্রায় কিছুই হয় না। জুলেখা নিজের থেকে কখন কথাবার্তা শুরু করে না। মিজানকেই আলাপ চালাতে হয়। খাওয়া শেষ হলে বাইরের ডেকে গিয়ে বসল জুলেখা। সুর্যাস্ত হতে এখনও ঘন্টা খানেকের উপর বাকী। এদিকটাতে বসলে অবশ্য সুর্যাস্ত দেখা যায় না। কিন্তু আকাশের শেষ আলোটুকু দেখতে ভালোই লাগে। জুলেখাকে নিঃশব্দে বসে সামনের জংগলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুগ্ধ হল মিজান। কেমন মায়াময় একটা দৃশ্য! তার ইচ্ছে হল সেও তার পাশে গিয়ে বসে। কিন্তু সাহস হল না। তার উপস্থিতিতে জুলেখা নির্ঘাত নার্ভাস হয়ে পড়বে। কয়েকদিন আগে মিজান পাশে বসবার পর পাঁচ মিনিটও যায়নি, সে হঠাৎ উঠে চলে গিয়েছিল। তাকে বুঝতে পারে না মিজান। তার পূর্ণমত নিয়েই বিয়ে করেছিল মিজান। কিন্তু এখন তার মনে প্রচুর সন্দেহ এবং প্রশ্ন। কোথায় যেন কি একটা সমস্যা রয়েছে। সে ঠিক ধরতে পারছে না। জুলেখাকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। সে কোন উত্তর দেয় না।

থালা-বাসন খলিয়ে ডিশওয়াসারে ঢুকিয়ে দিয়ে মেশিন চালিয়ে দিল মিজান। মাইককে ফোন দিল। ধরল না মাইক। মিজান একটা ভয়েস মেইল রাখল তার জন্য। মাইক খুব সম্ভবত শুনবেই না। মিজানকেই আবার কল করতে হবে পরে একসময়। ব্যাটা পাঁড় মাতাল। কোথায় চিত পটাং হয়ে পড়ে আছে কে জানে?

ধীরে ধীরে সুর্যাস্ত গ্রাস করল চারদিক, পাখীরা কিচিরমিচির করে ফিরে গেল জঙ্গলে, দূর আকাশে নানা রঙের খেলা একটু একটু করে মুছে যেতে শুরু করল, আকাশে মিটি মিটি করে জ্বলা তারাগুলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। আজ আকাশটা একেবারে ঝকঝকে করছে। কোথাও বিন্দুমাত্র কালো মেঘের চিহ্ন নেই। চাঁদের কোন নাম গন্ধ নেই। সাধারণত শহর থেকে একটু দূরে হওয়ায় চাঁদ এবং তারা দেখার জন্য চমৎকার জায়গা মিজানের এই বাড়ী। এমন নিরালা করে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার এর চেয়ে ভালো স্থান খুব একটা পাওয়া যাবে না এই এলাকায়।

একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে বাইরে ডেক-এ এসে জুলেখার পাশে একটা চেয়ারে বসেই পড়ল মিজান। সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। তার সাথে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করাটা তার জন্য এখন কর্তব্যের মত। বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে। কাগজ পত্র করতে করতে প্রায় বছর খানেকই লেগে গেল। ইতিমধ্যে সে একবার দেশে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য কিন্তু সেই সময় খুব একটা ঘনিষ্ট হবার সুযোগ হয় নি। জুলেখা হতে চায়নি। মিজান জোর জবরদস্তি করবার কোন চেষ্টা করে নি। সে ধরেই নিয়েছিল ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। জুলেখার লজ্জা নিশ্চয় ভাঙবে, সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

"আজ মনে হচ্ছে চাঁদ উঠবে না," তারা ভরা আকাশটাতে চোখ বুলাতে বুলাতে মৃদু কণ্ঠে বলে মিজান।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল জুলেখা। সূর্যের শেষ আলোটুকু পরিপূর্ণ ভাবে মুছে যাবার পর আকাশটা যেন হঠাৎ করেই বহুগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু অসংখ্য নক্ষত্রের গুচ্ছ! "আজ অমাবস্যা," জুলেখা মৃদু গলায় বলে।
"তাই নাকি? এই জন্য আকাশটা আজ এমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে! খুব ভালো লাগছে দেখতে, তাই না?" আবেগ ভরে বলে মিজান। একটা সময় ছিল যখন মিজানও হাঁ করে ঘন্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তখন নায়লা বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল।

নিঃশব্দে মাথা দোলায় জুলেখা।
"তুমি গান গাইতে পার?" আলাপটা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে মিজান।
নিঃশব্দে মাথা নাড়ে জুলেখা। সে গান গাইতে পারে না। গুন গুন করে কখন গান গায় না তা নয়, হয়ত শুনতে খারাপও লাগে না, কিন্তু সত্যিকারভাবে যাকে গান গাওয়া বলে তেমনটা সে কখনই গায় নি। অন্যের সামনে কখনই গায় না।
মিজান তাতে একটুও দমল না। "নো প্রবলেম। আমিই গাইব তাহলে। আমার গলা একেবারে মন্দ না। রবি গুরুর 'আজ জোৎস্না রাতে' গানটা শুনেছ না, দাঁড়াও ওটাই গাই।"
"আজ জোৎস্না না, অমাবস্যা," মৃদু গলায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় জুলেখা।
হেসে শ্রাগ করে মিজান। "কি আসে যায় তাতে? জোৎস্নাও সুন্দর, অমাবস্যার রাতে তারা ভরা আকাশও সুন্দর।"
সে সত্যি সত্যিই খুব দরদ দিয়ে 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গাইতে শুরু করল। তার গলা খুব মন্দ নয়। কানে খোঁচা দেয় না। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষন শোনে জুলেখা। হঠাৎ তীব্র বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে ঘন বন, সাগরের ঢেউয়ের মত আলোড়ন তোলে গাছের ডগায়, পাতায় পাতায় বাতাসের গর্জন। চমকে ওঠে জুলেখা, চারদিকে তটস্থ ভঙ্গীতে তাকায়, দুরের অন্ধকারে উদবিগ্ন দৃষ্টি মেলে কিছু দেখে; চঞ্চল বাতাসে ঘুড়ির মত উড়ছে তার ছাড়া চুল। সে হঠাৎ নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। ত্রস্ত পায়ে ভেতরে চলে যায়।
"কোথায় যাচ্ছ?" মিজান অবাক হয়ে জানতে চায়। "ভয়ের কিছু নেই। একটু জোর বাতাস হচ্ছে।"
কোন উত্তর দেয় না জুলেখা, এক রকম দৌড়ে সিড়ি বেয়ে উপরে তার শোবার ঘরের দিকে চলে যায়। মিজান ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। হঠাৎ জুলেখার এমন ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে উঠবার কি কারণ? সে গ্রামের মেয়ে। বাতাসের ঝাপটায় ভয় পাবার তো কোন কারণই থাকতে পারে না। সে গান থামিয়ে আরও কিছুক্ষন একাকী বসে থাকল। এই অল্প বয়স্ক মেয়েটাকে সে একেবারেই বুঝতে পারছে না। কোথাও কিছু একটা সমস্যা আছে কিন্তু সে ঠিক ধরতে পারছে না। কেউ তাকে কিছু বলেও নি। পুরোটাই তার নিজের মনের ভুলও হতে পারে। অসম্ভব নয়। হলেই ভালো। এই বয়েসে আর নতুন করে কোন সমস্যায় সে পড়তে চায় না।

ইচ্ছে করেই নীচতলায় লিভিংরুমে বসে কিছুক্ষন টেলিভিশন দেখল মিজান। শোবার ঘরেও একটা টেলিভিশন আছে। জুলেখাকে ধাতস্থ হবার সময় দেবার জন্যই ঝট করে উপরে যায় নি। কিছু জিজ্ঞেস করে যে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ঘন্টা খানেক পর সব দরজা জানালা লাগিয়ে এলার্ম সেট করে দিয়ে সে দোতলায় তার শোবার ঘরে উঠে এল। সব সময় তাড়াতাড়িই বিছানায় যায়, ভোরবেলা ওঠে। দশটার মধ্যেই সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ে। জুলেখা নিজেও তাড়াতাড়ি ঘুমায়। ফলে পরস্পরের সাথে মানিয়ে নিতে তাদের কোন সমস্যা হয় নি। কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। পাশাপাশি একই বিছানায় শুলেও তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই বাড়ীতে জুলেখা আসা অবধি গত এক মাসে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে মিজান কিন্তু তার ভাগ্য এখনও তাকে কোন কৃপা করে নি। নানা অছিলায় এড়িয়ে গেছে জুলেখা। সে পরিষ্কার করে কিছুই বলে না। কোন দিন তার অসম্ভব মাথা ব্যাথা থাকে, কোন দিন বমি বমি লাগে, কোন দিন আবার সে কোন রকম অজুহাত দেবারও চেষ্টা করে না। মিজান বেশ বিপদেই পড়েছে। অপেক্ষা করতে তার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু জুলেখার এই ব্যবহারের পেছনে মিজানের কোন অপরাধ আছে কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আলো বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছে জুলেখা। আলাদা লেপ গায়ে দেয় তারা। বাসার ভেতরের তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থাকলেও জুলেখার ঠান্ডা লাগে। সে পুরু লেপ গায়ে দেয়। মিজানের গরম লাগে। সে পাতলা একটা লেপ ব্যাবহার করে। কিং সাইজ বিছানা। দু'জনে দু' দিকে নিজস্ব লেপের মধ্যে গুটিসুটি দিয়ে ঘুমায়। দু'টি ভিন্ন দ্বীপের মত। মিজানের একেবারেই ভালো লাগে না কিন্তু এমন কিছুও করতে চায় না যা জোর জবরদস্তি বলে মনে হতে পারে।

বিছানায় শুয়ে সে নীচু গলায় ডাকল, "জুলেখা! ঘুমিয়ে গেলে?"

সর্বাঙ্গে লেপ জড়িয়ে শুয়ে ছিল জুলেখা। কোন উত্তর দিল না। সে এতো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল মিজানের, কিন্তু আর ডাকাডাকি করল না। এটাচড বাথরুমে একটা নাইট লাইট মিটি মিটি করে জ্বলছে। সেই আলোতে খুব একটা দৃষ্টি চলে না। সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চয় ঠিক হবে। তাকে শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

রাত ঠিক ক'টা বাজে আন্দাজ নেই মিজানের। মাথার মধ্যে নানা ধরণের চিন্তা নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না। সাধারণত তার ঘুম গভীর হয়। যদিও বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সামান্য শব্দেও ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলে অন্ধকারে পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করে সে। বাথরুমের নাইট লাইটটা আর জ্বলছে না। হয়ত ফিউজটা গেছে। সস্তা জিনিষ। বেশিদিন টেকে না। জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। বাইরে অবশ্য আজ অমাবস্যা, সুতরাং খোলা থাকলেও কোন আলো আসবার সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে পেছনের মোশন সেন্সিং লাইটটা অকারণে জ্বলে থাকে। সেটার আলো কড়া। আজ সেটাও জ্বলছে না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতের নাগালের মধ্যেই টেবল ল্যাম্প আছে একটা। চাইলেই সে হাত বাড়িয়ে সেটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালাল না মিজান। কিছু

একটা শুনেছে সে, যে কারণে তার ঘুম ভেঙেছে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করছে। তার বাড়ীটা একটু নির্জন জায়গায় হলেও আজ অবধি কখন চোর ডাকাত নিয়ে কোন সমস্যা হয় নি। সে ধনী মানুষ নয়। তার কাছে কাঁচা টাকা কিংবা সোনা দানা বলতে কিছুই নেই। বিয়ের পর জুলেখাকে সে কয়েক ভরি সোনার গহনা কিনে দিয়েছে, কিন্তু এতো অল্পের জন্য কেউ ঝুঁকি নিয়ে রাতে বাড়ীতে ঢুকবে ভাবতে কষ্ট হয়। যদি ঢুকে থাকে, তাহলে অবশ্য সমস্যা। তার বাসায় অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। একটা বেসবল ব্যাট আছে, কিন্তু দরকারের সময় সেটা কতখানি উপকারে আসবে সন্দেহ। রান্নাঘরে কিছু ছুরি টুরি আছে কিন্তু চোরের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই পর্যন্ত যাওয়াটা কঠিন হবে। নায়লা থাকতে সে একটা বন্দুক কিনতে চেয়েছিল। নায়লা আগ্নেয়াস্ত্রের নাম শুনলেও ভয়ে সিটিয়ে যেত। ফলে সেই প্ল্যান সফল হয়নি।

নিঃসাড়ে শুয়ে কান খাড়া করে চারদিকের শব্দ শোনার চেষ্টা করল মিজান। একটা চাঁপা ফোপানীর মত শব্দ কানে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই শব্দটার উৎস ঠাহর করতে পারল। তার বিছানার অন্য পাশে শুয়ে থাকা জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লেপের ভেতরে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখার জন্য শব্দটা ভোতা হয়ে কানে আসছে, মনে হচ্ছে যেন দূরের কোথাও থেকে আসছে।

গড়িয়ে জুলেখার পাশে চলে এলো মিজান। আলতো করে লেপের উপর দিয়ে ধাক্কা দিল জুলেখাকে। "এই জুলেখা! কি হয়েছে? দুঃস্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

জুলেখা মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দ হয়ে গেল। তাকে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে দেখে আবার ধাক্কা দিল মিজান। "জুলেখা! কি হয়েছে?"

পর মুহূর্তে যা ঘটল সেটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিজান। এক ঝটকায় নিজের শরীরের উপর থেকে লেপটা সরিয়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসল জুলেখা। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকার ফলে মিজানের চোখে এখন অন্ধকার সয়ে গেছে। তার দৃষ্টি এখন ভালোই চলছে। পাথরের মত কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জুলেখা। তারপর হিসহিসিয়ে উঠল, "চুপ করে ঘুমান! আমার গায়ে আবার হাত দিলে হাত ভেঙে দেব।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল মিজান, কি বলবে বুঝতে পারে না। তাকে কিছু বলার সুযোগ দেয় না জুলেখা। তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। তার পায়ের শব্দ শুনে মিজান বুঝল সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল, রান্নাঘরের দিকে গেল। কান পেতে শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকল। নীরবতা। আন্দাজ করল জুলেখা কাউন্টারের একটা চেয়ারে নিঃশব্দে বসে আছে। একবার ভাবল নীচে নেমে জুলেখার সাথে কথা বলে। তার উপর এতো রেগে গেল কেন? কাঁদছিলই বা কেন? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পালটাল। জুলেখার এমন ক্রুদ্ধ রূপ আগে কখনও দেখে নি। মনে মনে একটু ভয়ই পেয়েছে সে। ঝট করে কিছু না করাটাই ভালো। মেয়েটার মনের মধ্যে কি চলছে বোঝার জন্য তার আরোও সময় দরকার। মিজান আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আর আসে না।

চার

ভোরবেলা উঠে গোছল করেছে মিজান। প্রতিদিন করে। ফজরের নামাজ পড়েছে। সে খুব ধর্মভীরু না হলেও নামাজটা পড়ে। যখন বাসায় থাকে তখন তো পড়েই। জুলেখা নামাজ কাজা করে না। তার বাবা-মায়ের শিক্ষা। জীবনে বিপদ আপদ যাই আসুক আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করতেই হবে। তার নানীবু অবশ্য খুব একটা ধর্ম কর্ম করত না। কিন্তু একেক জন মানুষ একেক রকম হয়। নানীবু মানুষ হিসাবে অসম্ভব ভালো ছিল। সবাই বলত তার নাকি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। জুলেখা জানে না সত্যিই ছিল কিনা। তার আচার আচরণ, কথা বার্তায় কখন কোন কিছু প্রকাশ পায় নি। দু' মাস আগে তার চোখের সামনেই যখন নানীবু মারা গেল, তখনও সে তার নিশেষ ক্ষমতার কোন ইঙ্গিত পায়নি। আরোও দু' দশটা সাধারণ বয়েসী মানুষের মত হাঁস ফাঁস করতে করতে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা যায় সে। নানীবু চলে যাবার পর একেবারে একা হয়ে পড়ে জুলেখা। সৌভাগ্যবশত কানাডার কাগজপত্র তার মাত্র কয়েকদিন আগেই হয়ে যায়। দাদীবুর মৃত্যুর পরপরই মিজান দেশে গিয়ে তাকে নিয়ে এল। জুলেখার জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। রান্নাঘরে বসে এইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিল জুলেখা। মিজানের নামাজ পড়া শেষ হতে সে তাকে খেতে ডাকল। তার জন্য যত্ন করে পরাটা এবং আলু ভাজি করেছে। লোকটা খুব পছন্দ করে। হাসি মুখে খেতে এলো। রাতের ঘটনাটা নিয়ে কোন কথা হল না। ভালো হয়েছে। জুলেখা জানে না সে কি বলত।
মিজান জুলেখার পাশে বসে খুশী মনে নাস্তা করল। জুলেখা চমৎকার পরাটা বানায়। তার আলু ভাজিরও তুলনা হয় না। খুব সাধারণ বাঙ্গালী খাবার কিন্তু মিজানের কাছে অতুলনীয় মনে হয়। জুলেখা নিজে কিছু খেতে চায়নি। সে তাকে খেতে বাধ্য করেছে। মিয়া বিবি পাশাপাশি বসে নাস্তা করাটা মিজানের খুব পছন্দের একটা ব্যাপার। নায়লা এবং সে সব সময় এভাবে নাস্তা করেছে।
নাস্তা সেরে পোষাক আশাক পরে কাজে বেরিয়ে পড়ল মিজান। গত রাতের প্রসঙ্গ সে একেবারেই তোলে নি। হয়ত সময় এলে জুলেখা নিজের থেকেই ব্যাখ্যা করবে। গাড়ীতে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা জুলেখাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল সে। জুলেখা হাসি মুখে হাত নাড়ল। কাল রাতের জুলেখা এবং আজ সকালের এই জুলেখার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক।

মিজান কাজে চলে যেতে কিছুক্ষন বাড়ীময় অকারণে হাঁটাহাঁটি করল জুলেখা। রান্না করবার দরকার নেই। মিজান আগের দিন রাতে অনেক রান্না করেছে। দিন দুয়েক ভালো ভাবেই চলে যাবে। টেলিভিশন দেখতেও ইচ্ছা করছে না। মিজান দেশী চ্যানেল নিয়েছে কিন্তু টেলিভিশন দেখার তেমন আগ্রহ নেই জুলেখার। মন যখন অস্থির থাকে তখন ওসব

ভালো কাগে না। বাইরে বেরিয়ে জঙ্গলের দিক থেকে হেঁটে আসবে কিনা ভাবল একবার। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। আজ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। দুপুরের পরে গরমটা বাড়লে তখন যাওয়া যাবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ডাগরকে চারদিকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। সে কিংবা তার দুই বাচ্চার কাউকেই দেখা গেল না। হয়ত অন্যদিকে খাবার খুঁজতে গেছে। কাল পরশু আবার চলে আসবে। ফোনটার দিকে তাকাল। কাউকে ফোন করবে? কাকে? কাউকে ফোন করে দুইটা কথা বলার মত মানুষ তার নেই। মিজান ছাড়া। কিন্তু মিজান নিজেই সারাদিনে বিশবার ফোন করছে। তাছাড়া অফিসে সে কখন কাজ করছে কিংবা কখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে আছে, জুলেখা কি করে জানবে? অসময়ে ফোন করে হয়ত আরোও বিরক্ত করবে।

খানিকটা আনমনে দোতলায় উঠে এলো জুলেখা। গুটি গুটি করে ওর শোবার ঘরের পাশের একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মিজান তাকে নিজের থেকে কিছু বলে নি কিন্তু এই বাড়ীতে আসা অবধি জুলেখা লক্ষ্য করেছে, এই কামরাটা সব সময় বন্ধ থাকে। মিজান নিজে সেখানে কখন ঢোকে না। জুলেখাকেও যেতে মানা করে নি। কিন্তু জুলেখা জানে মিজান চায় না সে ঐ কামরায় ঢুকুক। কৌতুহলের বশবর্তি হয়ে একবার সে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে পরীক্ষা করেছিল। দরজা খোলে নি। তালা বন্ধ। মিজানকে সে কিছু জিজ্ঞেস করে নি কিন্তু ধরেই নিয়েছিল এখানেই নায়লার সব জিনিষপত্র রেখেছে মিজান, জুলেখার দৃষ্টির বাইরে।
যদিও জানে দরজাটা তালাবন্ধ, তারপরও হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আরেকবার চেষ্টা করল। খুল্ল না। একটু ভাবল। চাবিটা কোথায় থাকতে পারে? মিজানের রিডিং রুমে একটা ড্রয়ারের মধ্যে অনেক চাবি রাখা আছে, ঘর গোছাতে গিয়ে দেখেছে সে। একবার চেষ্টা করে দেখবে? মিজান টের পেলে কি খুব রাগ করবে? একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে ঝুঁকিটা নেবারই সিদ্ধান্ত নিল। ড্রয়ারে অনেকগুলো চাবি পাওয়া গেল। খুব বেশী চেষ্টা করতে হল না। চার পাঁচবার চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল।
ভেতরে পা দিয়েই থেমে যেতে হল জুলেখাকে। এগিয়ে যাবার মত কোন পথ নেই। বেশ বড়সড় একটা ঘর, ভেতরের জিনিষ পত্র সব বিশাল বিশাল চাদর দিয়ে ঢাকা। চাদরের উপর ধুলা জমেছে। কতদিন এভাবে রাখা কে জানে? নায়লা মারা গেছে প্রায় দু' বছর।

চাদরগুলো সব সরিয়ে নীচের জিনিষপত্রগুলো উন্মুক্ত করল জুলেখা। অবাক হবার পালা তার। কিং সাইজের বিছানা থেকে শুরু করে, বিশাল ড্রেসার, আরাম কেদারা, ড্রেসিং টেবিল, কম করে হলেও এক ডজন বিরাট সাইজের বাক্স, কয়েক শ' বাংলা গল্পের বই, মেয়েদের জুতা, ব্যাগ, কয়েক ডজন বিশাল সাইজের ছবি, ইজের, তৈলচিত্র, আরোও কত কি! নায়লার প্রতিটি ব্যবহার্য বস্তু বোধহয় এই কামরায় বন্দী হয়ে আছে। বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে জুলেখা। একজন মৃত মানুষের জিনিষের প্রতি তাকিয়ে থাকতে অনেকের হয়ত খারাপ লাগতে পারে, জুলেখার লাগছে না। মানুষের মৃত্যুকে সে অন্যদের মত করে দেখে না। সে বিশ্বাস করে মানুষ চলে গেলেও তার আত্মার একটা অংশ পড়ে থাকে তার প্রিয় মানুষদেরকে ঘিরে। তার নানীবু তাকে শিখিয়েছে। নায়লা নিশ্চয় আজও তার প্রিয় বস্তুগুলোর উপর নজর রাখছে। বেঁচে থাকতে কত ভালোবেসে সে তাদেরকে

ব্যবহার করেছে, তার মৃত্যুর পর সেগুলোকে এমন করে ময়লা চাদরের নীচে লুকিয়ে রাখার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? সে তা হতে দেবে না।

অফিস থেকে কিছুক্ষন পর পরই ফোন করে জুলেখার খবর নেয়াটা একটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে মিজানের। তার প্রধান দুঃশ্চিন্তা নিরাপত্তা নিয়ে। কিন্তু জুলেখা মনে হয় ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। প্রায়ই সে ফোন ধরে না। ভয়েস মেইলে চলে যায়। পরে কল ব্যাকও করে না। জিজ্ঞেস করলে বলবে সে মিজানের কাজের সময় ফোন করে বিরক্ত করতে চায় না। মিজান তাকে বোঝাতেই পারছে না, ফোনে তার কণ্ঠ শুনলে সে কতখানি স্বস্তি বোধ করে। এতো বড় বাড়ী এবং প্রাঙ্গণে একা থাকলেও জুলেখার মধ্যে কোন ভীতিবোধ আছে বলে মনে হয় না। গ্রামে বড় হয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, অপেক্ষাকৃত নির্জনতায় সে হয়ত অভ্যস্ত, কিন্তু বাংলাদেশ এবং এখানে এই অজানা অচেনা স্থান কি এক হল? জুলেখার ইংরেজীতেও ব্যুতপত্তি আদৌ নেই। কিছু একটা হলে সে তার সমস্যার কথা কাউকে বলতেও পারবে না। মিজান তাকে নাইন-ওয়ান-ওয়ান কল করে কিভাব পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে হয় শিখিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় জুলেখা আদৌ সেটা করতে পারবে কিনা তা নিয়ে মিজানের মনে সন্দেহ আছে।

মাইক তাকে অফিসে ফোন করল লাঞ্চের সময়। "সরি, মিজান। একটু শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। গাছের ব্যবস্থা করে ফেলব। চিন্তার কিছু নেই।"

মিজানের অবাক হবার পালা। "তুমি এর মধ্যে আমার বাড়ীতে যাওনি?"

"না। মন্ট্রিয়ল গিয়েছিলাম। আজ সকালেই ফিরলাম। আমার সৎ মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। খুব করে যেতে বলল।"

"তুমি শিউর?" মিজান আবার জানতে চায়।

"একশ' পার্সেন্ট। কেন কি হয়েছে?" এবার মাইকের অবাক হবার পালা। "বাড়ীতে সব ঠিক আছে তো?"

"গাছটা কে যেন প্রায় পনের-বিশ ফুট জঙ্গলের দিকে সরিয়ে রেখেছে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত তুমি কোন একসময় এসেছিলে।"

হেসে ফেলল মাইক। "একবার ঐ পথে যাবার সময় গাছটা আমি দেখেছি। আমি একা ঐ গাছ এক ইঞ্চিও সরাতে পারব না। কেটে কেটে সরাতে হবে। তুমি শিওর গাছ সরে গেছে? অনেক সময় হঠাৎ দেখে ঐরকম মনে হয়। তুষার সরে যাবার পর সব কিছু অন্যরকম দেখায়"।

শ্রাগ করল মিজান। "তুমি এলেই দেখবে। কখন আসবে?"

"কাল সকালে আসি? শনিবার। তুমি তো বাসায় থাকবে।"

সম্মতি জানিয়ে ফোন রেখে দিল মিজান। গাছের ব্যাপারটা তাকে একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তার বাড়ির সীমানার মধ্যে এসে কে গাছ সরিয়ে রাখবে? জুলেখাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সে কিছু দেখেছে কিনা। হয়ত ভুলে গেছে বলতে। যদিও এভাবে তার সীমানার মধ্যে কারো আসার প্রশ্নই ওঠে না। তার অনুমতি ব্যাতিরেকে তো নয়ই।

দেরী করে লাঞ্চ করল জুলেখা। এমনিতে ঘরে শুয়ে বসে কাটায় বলে খুব একটা ক্ষুধা লাগেও না। তারপরও অল্প করে খায়। নাহলে আবার মিজান দেখা যাবে খুব হৈ চৈ শুরু করে দেবে। জুলেখার সব ব্যাপারে এতো চোখ তার। ভালই লাগে, আবার মাঝে মাঝে একটু বিরক্তও লাগে। সব কিছু নিয়ে এতো খবর্দারী করা কি ঠিক? তিনটার দিকে সামান্য একটু খেয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দিল জুলেখা। আজ বার বার বাইরে তাকিয়েছে কিন্তু ডাগরকে দেখেনি। অন্য দিন দু' একটা দল ছুট হরিণ দেখে। আজ তাও দেখে নি। দক্ষিণের বাগানের ফুল গাছগুলো তর তর করে বাড়ছে। ওখানে তেমন কিছু করবার নেই। শুধু অপেক্ষার পালা এখন। ক'দিন বাদেই ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে এলাকাটা। জুলেখার তর সয় না।

সে উত্তরের পায়ে চলা পথ ধরে ঝর্নাটার দিকে রওনা দেয়। পুকুরটার পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া চিকন পথটাকে অনুসরণ করে গভীরতর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায়। তার মনে আছে মিজান বলেছিল উত্তর দিকে কম করে হলেও মাইলখানেক কোন বাড়ী ঘর নেই। জঙ্গলের কতটুকু তার সীমানার মধ্যে মিজান সঠিক জানেও না। এদিকে যেহেতু কেউ থাকে না, সার্ভে করবার প্রয়োজন কখন হয় নি। চারদিকে নানান জাতের গাছপালা, লম্বা লম্বা। অধিকাংশই জুলেখার অপরিচিত। সুর্যের আলো সরাসরি মাটি পর্যন্ত পৌঁছায় না। চারদিকে স্যাঁতস্যাঁতে একটা ভাব। মাটির সোঁদা গন্ধটা ভালোই লাগে জুলেখার। আজও শাড়ী পরে এসেছে। শাড়ীর তলাটা ভিজছে। ভিজুক। ভেজা ভাবটাও ভালই লাগছে। প্যান্ট শার্ট পরতে মোটেই ভালো লাগে না তার। পায়ে জুতা পরবার ব্যাপারটাও রপ্ত করতে পারে নি। সারা জীবন স্যান্ডেল পরে এসেছে। সেই অভ্যাস ভাঙ্গাটা সহজ নয়। গলায় একটা হ্যান্ড ব্যাগ অবশ্য ঝুলিয়ে এসেছে। মোবাইল ফোনটাকে ব্যাগের মধ্যে রেখেছে। মিজান ফোন করে তাকে না পেলে আবার ছুটাছুটি করে বাড়ী ফিরে আসবে। এতো ভয়ে ভয়ে থাকে লোকটা? জুলেখাকে নিয়ে তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এই সামান্য ব্যাপারটা সে বোঝে না।

পায়ে চলা পথটা বেঁকে গিয়ে পুকুরটার সীমানা বরাবর এগিয়ে গেছে। কিছুদূর যাবার পর বিশাল একটা গাছের পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জুলেখা। কম করে হলেও আশি-নব্বই ফুট লম্বা হবে গাছটা। বিশাল কান্ড এবং শাখা প্রশাখা দেখে খানিকটা বট গাছের মত মনে দেখায়। এই গাছটা জুলেখা চেনে। ব্ল্যাক ওয়াল নাট। গাড়ীতে করে ঘুরতে বেরিয়ে কোথাও দেখেছিল। মিজানকে প্রশ্ন করে নামটা জেনে নিয়েছে। মিজানের এই ব্যাপারে জ্ঞান খুব ব্যাপক নয়, কিন্তু সাধারণ গাছপালা গুলো চেনে। এদিকে অবশ্য নানা ধরণের মেপল গাছই বেশী।

ব্ল্যাক ওয়াল নাট গাছটার গুঁড়িটা চওড়ায় ছয়–সাত ফুটের কম হবে না। মাটি থেকে ফুট ছয়েক উপরে গিয়ে বিশাল দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন,

সবুজ পাতায় গাছটাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। এক হাতে গুঁড়িটাকে ছুঁয়ে চারদিকে একবার চক্কর দেয় জুলেখা। পেছন দিকে একটা বড় সড় গর্ত দেখল। হয়ত বাজ পড়েছিল। মোটামুটি গভীর। দুটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ দিব্যি ধরে যাবে। মুচকি হাসে জুলেখা। তার বাবার বাড়ীতেও পুকুরের পারে একটা বিশাল আম গাছের গুঁড়িতে এমন একটা গুহা ছিল। কত দিন সে একাকী সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। মা আর নানীবু তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে মনে হল ভেজা হবে, তারপরও নিজেকে সামলাতে পারল না। একটু কষ্ট করে হলেও গুহার মধ্যে ঢুকে, মাটিতে গুটিসুটি মেরে বসল। ভালই লাগছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বড় হবার পর সেই আম গাছটাতে সে প্রায় কখনই যায় নি। যাবার সুযোগ হয় নি। অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে।

পাঁচ

যত জোরে সম্ভব গাড়ী চালিয়ে বাসায় ফিরেছে মিজান। বিকাল তিনটা থেকে সমানে বাসায় ফোন করছে সে, ধরেনি জুলেখা। কম করে হলেও পাঁচটা ভয়েস মেইল রেখেছে। কল ব্যাক করে নি।

বাড়ীতে ফিরে জুলেখাকে কোথাও দেখল না। কিন্তু যা দেখল তাতে তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাড়াতে হল। নায়লার ঘরের দরজা হাঁট করে খোলা। তার পছন্দের অয়েল পেইন্টিংগুলো আবার দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। ইজি চেয়ারটা তাদের শোবার ঘরে চলে গেছে। জুলেখার জন্য নিজের পছন্দ মত একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছিল মিজান। সেটা নায়লার ঘরে চলে গেছে। নায়লার ড্রেসিং টেবিল চলে গেছে ওদের শোবার ঘরে।

নায়লার মৃত্যুর পর তার পছন্দের সমস্ত পর্দা সরিয়ে সেখানে ভিন্ন পর্দা লাগিয়েছিল সে। নায়লার ব্যাবহার্য প্রতিটি জিনিষপত্রই সরিয়ে সযত্নে গুছিয়ে রেখেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল জুলেখাকে একটা সম্পূর্ণ নতুন সংসার উপহার দেয়া। জুলেখা নতুন পর্দা সরিয়ে প্রতিটি জানালায় আবার পুরানো পর্দা লাগিয়ে দিয়েছে। কারণটা পরিষ্কার হল না মিজানের কাছে। একাকী সে এতো কিছু কিভাবে করল সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। ড্রেসিং টেবিলটা ভারী মেহগণী কাঠের। তিন জনে মিলে সেটাকে নায়লার ঘরে ঢোকাতে হয়েছিল। জুলেখার একার পক্ষে সেটাকে বহন করে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। মিজানের মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

দ্রুত পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মিজান। কোথাও জুলেখার কোন চিহ্ন নেই। পেছনের মাঠে একটু খেয়াল করে তাকাতে ভেজা মাটিতে কিছু পদচিহ্ন দেখা গেল, উত্তরে ঝর্নার দিকে চলে গেছে। দৌড় দিল সে। কে জানে হয়ত ব্যাথা পেয়ে

কোথাও পড়ে আছে। পুকুরটা পার হবার ঠিক আগেই জুলেখাকে হন্ত দন্ত হয়ে হেঁটে আসতে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মিজান। মেয়েটা যে অক্ষত আছে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। মিজানকে পথের উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল জুলেখা। "ফোন করেন নি কেন? কখন এসেছেন?"

মিজান হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। "সেই কখন থেকে সমানে ফোন করছি। কম করে হলেও আধা ডজন মেসেজ রেখেছি।"

জুলেখা নিজের ব্যাগ হাতড়ে তার মোবাইল ফোনটা বের করল। "কই, ফোন তো বাজেনি।"

"এই জঙ্গলের মধ্যে কতক্ষন ধরে আছ?"

"তিনটার দিকে এসেছিলাম।"

"চারদিকে এতো বড় বড় গাছ। একটু ভেতরে গেলে সেলফোন কাভারেজ নাও থাকতে পারে। তুমি যে ঠিকঠাক আছো সেটাই বড় কথা।" ফিরতি পথে রওনা দিল মিজান। "এখানে একাকী এভাবে হাঁটাহাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক না। কাউকে কখন এদিকে আসতে দেখিনি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আসতে পারে না। তোমার জন্য চিন্তায় কবে আমার হার্ট এটাক হবে।"

তার পিছু পিছু নিঃশব্দে হেঁটে আসছিল জুলেখা। সে এবার নীচু গলায় বলল, "আমার কিছু হবে না। আমাকে নিয়ে ভয় পাবেন না।"

তার কণ্ঠে এমন একটা কিছু ছিল, মিজান অবাক হয়ে তাকাল। মাঝারী আকারের রোগা পাতলা একটা মেয়ে, হাঁটা চলায় শক্তিমত্তার ছাপ আছে, চোখের দৃষ্টিতে দৃঢ়তা আছে, কিন্তু তাই বলে এমন মনবল সে কোথা থেকে পায়? এমন জংলা, চুপচাপ এলাকায় সম্পূর্ণ একাকী ঘুরে বেড়াতে তার ভয় না লাগার কারণ কি? সে কি বিপদের সম্ভাবনাটুকু বোঝে না? নাকি বিপদের গুরূত্বটুকু বোঝে না? জুলেখা চোখ নীচু করে হাঁটতে থাকে। মিজানের চোখে চোখ রাখে না।

জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে খোলা মাঠে উঠে এলো ওরা। এদিকটাতেই একটু ভেজা বেশী। কিছু কিছু অংশ ঢালু হওয়ায় তুষার এবং বরফ গলা পানি গড়িয়ে সেই সব ঢালু এলাকায় গিয়ে জমে চারদিকে একেবারে প্যাঁচপ্যাঁচে করে দেয়। একটানা সূর্যের আলো পেলে শুকিয়ে যায়, কিন্তু বৃষ্টি হলে আবার পানি জমে। মিজান লক্ষ্য করল জুলেখার শাড়ী ভিজছে।

"কত দিন বলেছি প্যান্ট শার্ট পরে আসবে। শাড়ীগুলো সব নষ্ট করছ।" কণ্ঠের বিরক্তিটুকু ঢাকতে পারে না মিজান।

জুলেখা কিছু বলে না। শাড়ি পরতেই তার ভালো লাগে। প্যান্ট শার্ট পরাটা তার বাবা, মা, নানী বু কেউ পছন্দ করত না। গ্রামের কিছু কিছু স্কুলে কলেজে যাওয়া মেয়েরা অনেক দিন ধরেই পরছে। জুলেখা ছোটবেলায় পরতে চেয়েছে কিন্তু বাবা-মা যখন অনুমতি দেয়নি, তখন প্রথমে সালোয়ার কামিজ, পরে একটু বড় হলে শাড়ী পরেই খুশী থেকেছে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে দক্ষিণের মাঠে পড়ে থাকা বিশাল পাইন গাছটার উপর নজর আটকে গেল মিজানের। এই রহস্যটা তাকে ভেতরে ভেতরে খুব খোঁচাচ্ছে। "এই গাছটা কে এতখানি সরালো আমার মাথায় ঢুকছে না। তুমি কাউকে আসতে দেখেছিলে? মাইকের সাথে কথা হল। সে এখানে ছিলই না। যদিও একা এই গাছ তার পক্ষে সরানো সম্ভব নয়।"

"আমি সরিয়েছি," খুব নরম গলায় বলল জুলেখা। "ওটার পেছনে অনেক পানি জমে ছিল। ডোবার মত হয়ে যাচ্ছিল। বদ্ধ পানি আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। মশা ডিম পাড়ে। গন্ধ হয়।"

মিজান থেমে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে জুলেখার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। "তুমি একাকী ঐ গাছটাকে অত খানি কি করে সরালে? আমি চেষ্টা করে দেখেছি। আমি তো নড়াতেই পারিনি!"
জুলেখা তার পাশ কাটিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠতে উঠতে নীচু গলায় বলল, "আমাকে দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আমার গায়ে অনেক শক্তি। গ্রামে সবাই জানে।"
"কিন্তু...কিন্তু...কিভাবে?" মিজান এমন সরল স্বীকারোক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"জানি না।" দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল জুলেখা। তার যাবার পথের দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মিজান। তারপর বাসার ভেতরে না ঢুকে সে দক্ষিনের মাঠের গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। মোক্ষম মত একটা মোটাসোটা ডাল ধরে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে নড়ানোর চেষ্টা করল। এক সুতাও নড়ল না। হাতির চেয়েও ভারী গাছ। জুলেখা এই গাছ একাকী নাড়িয়েছে সেটা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা কি করে সম্ভব হয়?
জানালায় খুটখাট শব্দ হতে চোখ তুলে তাকাল মিজান। উপরে ওদের শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে জুলেখা। তার ঠোটের কোণে কি এক চিলতে হাসি? ঠিক ঠাহর করতে পারল না মিজান। তাকে মুখ তুলে তাকাতে দেখে জানালা থেকে সরে গেল জুলেখা। গাছটাকে রেখে বাড়ীতে ফিরে এলো মিজান। কাল মাইক আসুক। দু'জনে মিলে কেটে গাছটাকে সরিয়ে ফেলবে। জুলেখা কি করেছে না করেছে সেটা কারো জানার কোন প্রয়োজন নেই। এই পৃথিবীতে কত অসম্ভব বস্তুই তো হয়ে থাকে। জুলেখার শরীরেও হয়ত অসুরিক শক্তি আছে। আল্লাহ চাইলে কি না হয়! মেহগণী কাঠের ঐ বিশাল ড্রেসার সে একাকী সরিয়েছে। অসুরিক শক্তি না থাকলে সেটা কখনই সম্ভব হত না। সমস্যা শুধু একটাই। হঠাৎ করেই তার দৃষ্টিতে একটু আগের সেই ক্ষীণ তনু লাবণ্যময়ী মেয়েটি এক ভিন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। নিজের কাছে স্বীকার করতে তার একটু কষ্ট হলেও তাকে মানতে হল, জুলেখাকে তার এখন সত্যিই একটু ভয় করছে।

ছয়

রাতে বরাবরের মতই পাশাপাশি শুলেও দূরত্বটুকু বজায় থাকে। মিজান অন্যদিন ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করে, আজ করল না। নিজেই খাটের একেবারে প্রান্তে এসে শুয়েছে। জুলেখার মত হ্যাংলা-পাতলা একটি মেয়ের শরীরে কি করে এমন অসম্ভব শক্তি থাকতে পারে ব্যাপারটা তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। এই ব্যাপারে সে জুলেখার সাথে আর আলাপ করে নি। কিন্তু তার কৌতুহল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এটা নিয়ে সে একটু রিসার্চ করতে চায়। সে নিজে বিজ্ঞান পড়া মানুষ। বৈজ্ঞানিক প্রমানের তার কাছে মূল্য আছে। সে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজছে। জুলেখার অগোচরে ইনটারনেটে গিয়ে কিছু সার্চ করেছে কিন্তু মোক্ষম কিছু পায়নি।

তার ঘুম আসতে একটু দেরীই হল। জুলেখা প্রতিদিনের মতই নিঃশব্দে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এই মেয়েটা কোন কারণে যদি মিজানের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমন করে, তাহলে মিজানের পক্ষে তার শক্তির বিরুদ্ধে দাড়ানো সম্ভব হবে না। পুরুষ হয়ে নিজের বাড়ীতেই নিজ স্ত্রীকে শারীরিকভাবে ভয় পাবার ব্যাপারটা একটা নতুন ধরণের অনুভূতি। মিজানের কাছে মোটেই ভালো লাগছে না।

কখন রাজ্যের কথাবার্তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানেও না মিজান। সকালে যখন ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছাড়ল, তখন ফযরের ওয়াক্ত বেশ অনেকক্ষণ গত হয়েছে। এমনটা তার কখনই হয় না। রাতে ঘুমাতে দেরী হয়েছে। নামাজ কাজা হওয়ায় তার একটু মন খারাপ হল। জুলেখা তাকে ডাকতে পারত। সে নিজেও প্রতিদিন ভোরে উঠে নামাজ পড়ে।

হাত মুখ ধুয়ে, অজু করে কাজা পড়ল মিজান। আজ শনিবার। তার অফিস নেই। ইদানিং খুব ব্যস্ত থাকতে হয় কাজে। এদিকে আবার জুলেখাকে নিয়ে ভাবনা। ছুটির দিনটা সে খুবই উপভোগ করছে। নীচে রান্নাঘরে এসে দেখল জুলেখা তার জন্য লুচি ভেঁজেছে। সুন্দর করে ব্রেকফাসট কাউন্টারে একটা প্লেটে সাজিয়ে রাখা। সে নিজে বোধহয় জঙ্গলে হাঁটতে গেছে কারণ তাকে কোথাও দেখা গেল না। মিজান মনে মনে খুশী হল। তার পছন্দ অপছন্দের যে মূল্য দিচ্ছে জুলেখা, এটা তার ভালো লাগছে। যদিও নায়লার জিনিষগুলো তাকে জিজ্ঞেস না করে সরানোটা মিজানের পছন্দ হয় নি, কিন্তু জুলেখার মনে যদি কোন হিংসা বোধ না থাকে, তাহলে মিজানেরও কোন সমস্যা নেই। নায়লাতো আর নেই। তার জিনিষ যদি অন্য কারো কোন কাজে আসে, তাহলে সে নিশ্চয় উপর থেকে দেখে তা নিয়ে মন খারাপ করবে না।

তার নাস্তা সারা হতে সে নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে ডেক-এ গিয়ে বসল। সুন্দর রোদ জ্বলা দিন। কিন্তু গরম বেশী না। ভালোই হল। মাইক একটু পরেই চলে আসবে। দু' জনে মিলে গাছটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে বড় বড় করে কাটতে হবে, পরে আগুনে পোড়ানো জন্য ছোট ছোট টুকরা করবে। কম কাজ নয়। কিন্তু মাইককে দেখে মোটাসোটা, মাতাল মনে হলেও সে চাইলে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে পারে। টাকা পয়সাও

বেশী চায় না। যে কারণে মিজান তাকে খুবই পছন্দ করে। আজকাল বিশ্বাসী আর অল্পে খুশী মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন। বিশেষ করে হ্যান্ডিম্যানদের যে চাহিদা।

মাইক তার রদ্দি মার্কা পিক আপ ট্রাক চালিয়ে যখন তার ড্রাইভয়েতে এসে থামল, তখন প্রায় সকাল দশটা। চা টা মাত্র শেষ করেছে মিজান। দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে জুলেখাকে বের হতে দেখে স্বস্তি পেল। আর কিছুক্ষনের মধ্যে না ফিরলে সে হয়ত নিজেই চলে যেত তাকে খুঁজতে।
মাইককে দেখেই বুঝল আগের দিন রাতে সে পেট পুরে বিয়ার খেয়েছে। দামী মদ খাবার পয়সা তার নেই। সে সাধারণত সস্তা বিয়ার খায়। খেয়ে ডাব্বা হয়ে থাকে। এক বৈঠকে পাঁচটা-ছয়টা সাবাড় করা তার জন্য তেমন কোন অসাধ্য ব্যাপার নয়। মিজানকে দেখে বিশাল একটা হাই ফাইভ দিল। "কেমন আছো বস? কাজ কর্ম কেমন চলছে?"
তার জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনেই একটু প্রমাদ গুনল মিজান। সে মাইককে অনেক দিন ধরে দেখছে। জানে, মাতাল থাকুক, না থাকুক, মাইক কখন কোন ফালতু কাজ করে না। সে নিজের মত কাজ করে চলে যাবে। বাসায় গিয়ে আবার কাড়ি কাড়ি বিয়ার খাবে। তার কাজে সেই জন্য কোন সমস্যা হয় না। অবশ্য তাকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করালে মিজান সতর্ক থাকে। একবার ইট পাথরের কাজ করিয়েছিল। তখন কাজে ছুটি নিয়েছিল।
মিজান মাইকের পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল, "আমি তো ঠিকই আছি। তোমার যে অবস্থা, পুলিশ ধরলে তো ঐ মুড়ির টিন গার্বেজে চলে যেত, তোমার ড্রাইভিং করাও বন্ধ হয়ে যেত।"
খ্যাক খ্যাক করে উঁচু গলায় হাসল মাইক। "আরে, পুলিশ কেন আমাকে ধরবে? আমি যখন মাতাল থাকি, তখন খুব সাবধানে গাড়ী চালাই।"
হেসে মাথা ঝাঁকাল মিজান। "সব মাতালরাই তাই মনে করে। এক্সিডেন্ট কি এমনি এমনি হয় মনে করেছ? চল, কাজ শুরু করা যাক। সময় লাগবে।"
"তুমি এগুতে থাক। আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছি।" শেডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পিছু ফিরে তাকিয়ে দূরে জুলেখাকে নজরে পড়ল তার। "তোমার বউ না?ওদিকে কোথায় গিয়েছিল? জঙ্গলের মধ্যে কত ধরণের প্রানী আছে। অনেকে বলে এদিকে নাকি কয়োটি আছে। সাবধান করে দিও। এতো কম বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করেছ তুমি! ইংরেজীওতো কিছু জানে না। তার সাথে কথাবার্তা কিছুই বলা যায় না।"
মিজান নীচু গলায় বলল, "ওর সাথে তোমার কথা বলার দরকার নেই। যা লাগে আমাকে বল। ও ইংরেজী পড়তে, লিখতে পারে, বলতে অসুবিধা।"
মাইক বিড়বিড়িয়ে বলল, "আমার কথা বলতে বয়েই গেছে। আমি কাজ করতে আসি। কাজ শেষ হলে চলে যাবো।"
মিজান জুলেখা বাসায় না পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তাকে দেখে মনে হল সে খুব চমৎকার মেজাজে আছে। মিজানকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। "জঙ্গলের ভেতরটা এতো সুন্দর। পায়ে চলা পথটা দিয়ে অনেক দূর যাওয়া যায়। পথটা কে বানিয়েছে?"

শ্রাগ করল মিজান। "আমি যখন কিনেছিলাম তখন থেকেই আছে। হয়ত আগে মানুষ জন চলাফেরা করত। কত দূর গিয়েছিলে আজকে?"
"আধা মাইল হবে। পথটা ভেজা। বেশী জোরে হাঁটা যায় না। চা খেয়েছন?"
"হ্যাঁ। তোমাকে এক কাপ বানিয়ে দেব?"

মাথা নাড়ল জুলেখা। "আমি বানিয়ে নেব। আপনি যান। লোকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে শেড থেকে বেরিয়ে দক্ষিন দিকে গেল। টলে টলে হাটছে। এই মাতালটাকে ছাড়া কি অন্য মানুষ পাওয়া যায় না?"
"ও মানুষটা ভালো। একটু টানে এই আরকি!" মিজান মাইকের হয়ে অজুহাত বের করার চেষ্টা করল। জুলেখা মদ্য পান পছন্দ করে না। তাদের পরিবারে কেউ নাকি কখন ওসব করে নি। মিজানকে সে প্রথমেই এই একটা ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করেছে।
জুলেখা শুষ্ক গলায় বলল, "মদ মানুষের স্বত্তাকে নষ্ট করে দেয়। এই সাদা লোকটাকে আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না। ও পয়সার জন্য সব করতে পারে।"
এই কথা বলার কারণটা পরিষ্কার হল না মিজানের কাছে। মাইক সৎ মানুষ। জুলেখার এমন একটা খারাপ ধারনা হবার কোন কারণ নেই। জুলেখা বাসার মধ্যে চলে গেল।
মিজান মাইকের পিছু নিল। সে এক হাতে চেইন স এবং অন্য হাতে একটা কুড়াল নিয়ে খুব হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। মাইকের কোন কিছুতেই কোন তাড়া নেই। যে কাজ এক ঘন্টায় হয় সেই কাজ সে দুই ঘন্টায় করে। মিজানের তাতেও কোন সমস্যা নেই। মাইক পয়সা ডাবল হাঁকে না। তার দুই ঘন্টা লাগুক আর তিন ঘন্টা লাগুক, পয়সা সেই এক ঘন্টারই। এটাই মিজানের পছন্দ। সে কারো মাথায় কাঠাল ভাঙার চেষ্টা করে না।
চেইন স নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, অতিরিক্ত শব্দ করে। মিজানের এতো শব্দ পছন্দ হয় না। মাইক আবার ওসব নিয়ে তোয়াক্কা করে না। সে কানে হয়ত একটু অল্প শোনে। একসময় নাকি খুব বন্দুক পিসতল নিয়ে ঘাটাঘাটি করত। কানের উপর খুব অত্যচার যায়, তার ভাষ্য অনুযায়ী। প্রায় ঘন্টা দুয়েক একটানা কাজ করল মাইক। মিজান তার সাথে এদিক সেদিক একটু হাত লাগাল। প্রথমে গাছটাকে তিন-চার ফুটের ছোট ছোট অংশে কাটছে মাইক। সরিয়ে সরিয়ে সেগুলোকে এক জায়গায় স্তুপ করছে সে। পরে কুড়াল দিয়ে এই প্রত্যেকটাকে আবার জ্বালানী কাঠের সাইজ করে কাটবে।
কাজ করতে করতে হেড়ে গলায় গান ধরে মাইক। ইংরেজী কোন একটা গান। সেই গানের মাথামুন্ডু কিছুই বোঝে না মিজান। শুধু এই টুকু বোঝে, এটা কান্ট্রি মিউজিক। সে কিছু কিছু শুনেছে, কিন্তু মাইকের গাওয়া গান গুলো সে কখন শোনে নি। হয়ত অনেক পুরানো গান। মাইককে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। সে শুধু জোরে জোরে হাসে, ব্যাখ্যা করে কখন কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে না।
ঘন্টা দুই পরে একটু বিরতি নেবার পালা এলো। মিজান এক জগ পানি এনে দিল। বেচারী একেবারে ঘেমে গেছে। মে মাসে তাপমাত্রা এখনো তেমন গরম নয়। কিন্তু কিছুক্ষন কাজ করলেই ঘাম ছুটে যায়। রোদে দাঁড়িয়েই মিজান শার্টের নীচে ঘামছে।

একটা গুঁড়ির উপর আরাম করে বসে জগ থেকে ঢক ঢক করে পানি খেল মাইক। তার ব্যবহার চাঁচাছোলা নয়। সে শ্রমিক শ্রেনীর মানুষ, সেই রকমই তার আচার আচরণ। মিজান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাইক হঠাৎ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল,"হরিণ! দেখেছ? এই তিনটেকে আমি আগেও দেখেছি। তোমার এদিকেই বোধহয় কোথাও থাকে। ওহ, মেরে খেতে যা মজা লাগবে না! আগে যেতাম হরিণ শীকারে। কয়েক বছর আর যাই না। আজকাল শীকারে যেতেও আলস্য লাগে। আমার বাবা ছিল খুব বড় শীকারী। ভল্লুক পর্যন্ত মেরেছে। আরেকটু হলে তাকেও পরপারে পার করে দিয়েছিল এক ভল্লুক। হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে। কিন্তু বাবার কপাল ভালো ছিল। এক মুহূর্ত আগে টের পেয়ে যায়। সময় মত সরে গিয়ে একটা গুলী জন্তুটার হার্ট বরাবর চালিয়ে দেয়। যাই হোক, বাবার সাথে আমি ছোটবেলায় হরিণ শীকারে যেতাম খুব। প্রত্যেক বছর দুইটা তিনটা বিশাল বিশাল হরিণ মারতাম। সবাইকে দিয়ে থুয়েও যা থাকত তাতে আমাদের বছর চলে যেত। মজাই লাগে হরিণের গোশত।"
হরিণ তিনটাকে মিজানও আগে দেখেছে। মা এবং দুই বাচ্চা। হরিণটা শীতের আগে আগে বাচ্চা প্রসব করেছিল। প্রতি শীতেই সে বাচ্চা নিয়ে হরিণীদেরকে চলাফেরা করতে দেখে। দেশে থাকতে সুন্দরবনে গিয়ে হরিণের মাংশ দু' একবার খেয়েছে, কিন্তু তাতে তার নিজের খুব একটা আগ্রহ নেই। দেখতেই তার ভালো লাগে। মা হরিণীটা বড় বড় চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চা দু'টা এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করছে। তাদের চলাফেরার কোন ঠিক নেই; কখন সন্ধ্যায় আসে, কখন আবার ভর দুপুর বেলা। তাদেরকে যেহেতু কেউ কোন বিরক্ত করে না, মানুষ দেখে তারা আদৌ ভয় পায় না।
মাইকের বোধহয় একটু খেলা করতে ইচ্ছে হল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখ, এই খান থেকে আমি কিভাবে ঐ হরিণীটাকে আঘাত করি। শ' খানেক ফুট তো হবেই, না? এক সময় আমি বুমেরাং চালানোয় খুব দক্ষ ছিলাম। এখানে তো আর বুমেরাং নেই। একটা ডাল কেটে সাইজ করে নিলে বুমেরাং হিসাবে চালানো যাবে।"
সে চেইন স ব্যবহার করে দ্রুত হাতে একটা বুমেরাং সাইজের ডাল কাটল। সেটাকে হাতে নিয়ে হরিণীটাকে নিশানা করতে করতে বলল, "এটা অবশ্য ফিরে আসবে না, কিন্তু ওর গায়ে আমি ঠিকই লাগাব।"
মিজান তটস্থ কণ্ঠে বলল, "মরে-টরে যাবে নাতো? তুমি তো জান এটা বেআঈনী।"
হা হা করে হাসল মাইক। "আরে, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ, বস। কিচ্ছু হবে না ওর। একটা ধাক্কা মত খাবে, তার পর দেবে দৌড়। দেখ এবার। এক, দুই, তি...ন..."
মাইক কাঠটাকে ছুড়বার আগেই একটা কাঁচের প্লেট বুলেটের মত ছুটে এসে তার তলপেটে আঘাত করল। ককিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল মাইক, পেট চেপে ধরে গোঙাতে লাগল। ভয় পেয়ে তার পাশে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মিজান। পুরো ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটেছে যে সে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি কি ঘটল। কাঁচের প্লেটটা মাটিতে পড়ে আছে, অবাক হয়ে সেটা হাতে তুলে নিল মিজান। তার পেছনে কেউ দ্রুত পায়ে ছুটে আসছে। পেছন ফিরে দেখল, জুলেখা! তার আলু থালু শাড়ী, খালি পা, পিঠময় ছড়ানো চুল এবং জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে কি ঘটেছে বুঝতে বাকী থাকল না মিজানের। জুলেখা নিশ্চয় উপর থেকে দেখেছে মাইক কি করতে যাচ্ছিল। সে প্লেট ছুড়ে মেরে ধরাশায়ী করেছে

মাইককে। যদি ডেকের উপর থেকে ছুড়ে থাকে, তাহলে কম করে হলেও একশ' ফুট দূর থেকে ছুড়েছে। তার মাথা ঝম ঝম করছে। অবিশ্বাষ্য ব্যাপার। এতো দূর থেকে এতো নিখুঁতভাবে এবং এতো জোরে কি করে মারল জুলেখা? মাইক পেট চেপে ধরে এখনও মাটিতে শুয়ে আছে। তাকে কোন করুণা দেখাল না জুলেখা। মিজানের পাশ কাটিয়ে মাইকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীচু হয়ে এক হাত বাড়িয়ে টি শার্টের কলার চেপে ধরে প্রায় শুন্যে তুলে ফেলল তাকে। হিসহিসিয়ে বলল, "নো! নেভার। খুন করে ফেলব। ডেভিল!"

মাইক ব্যাথার মধ্যেও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তাকে ছেড়ে দিতে ধপাস করে আবার মাটিতে পড়ল। কোঁকাতে কোঁকাতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। "মিজান, কি হচ্ছে এসব?"

মিজান কি করবে বুঝতে পারছে না। সে দ্রুত বলল, "মাইক, চলে যাও। আমি তোমাকে পরে ফোন দেব।"

মাইক অবাক চোখে জুলেখাকে দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে তার গাড়ীর দিকে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার গাড়ীর চলে যাবার শব্দ পাওয়া গেল। হরিণগুলোকে হাত নেড়ে চলে যেত বলল জুলেখা। তারা যেন তার ইঙ্গিত বুঝে ধীরে ধীরে গভীর বনের দিকে চলে গেল। এবার আগুন ঝরা দৃষ্টীতে মিজানের দিকে তাকাল জুলেখা। "কেউ যদি ওদের কোন ক্ষতি করে, তার গলা টেনে ছিড়ে ফেলব আমি।"

মিজান মিনমিনিয়ে বলল, "ও ওদেরকে মারতে চায় নি, জুলেখা। একটু খেলা করছিল।"

মিজানের দিকে কঠিন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল জুলেখা। যখন কথা বলল তখন তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর এবং কর্কশ শোনাল, সেখানে রাগ এবং ক্ষোভের পরিষ্কার চিহ্ন। "কে জুলেখা? আমি জুলেখা না। আমি চাঁদনী। আমার সাথে শয়তানী করলে জীবন নিয়ে নেব। বলে দিবি ওকে।"

ঘুরে দাঁড়াল জুলেখা। দৃপ্ত পায়ে হেঁটে বাসার ভেতরে ঢুকে গেল। মিজান হতবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে। চাঁদনী কে? কেন জুলেখা নিজেকে চাঁদনী বলে পরিচিয় দিচ্ছে? তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। জুলেখা তাকে আপনি করে সম্বোধন করে নি। বলেছে 'তুই'! এটাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বাসার ভেতরে যেতে তার এখন সত্যি সত্যিই ভয় হচ্ছে। জুলেখার কি তাহলে মাল্টিপল পার্সোনালিটি আছে? এইসব সে মুভিতে দেখেছে, গল্পে পড়েছে, কিন্তু এটা যে বাস্তবে হতে পারে সেটা সে কখনই ঠিক বিশ্বাস করে নি। একি বিপদে পড়ল সে? আড় চোখে বাসার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হল জুলেখা ওকে দেখছে না। তারপর শেডের পেছনে গিয়ে তার ঘনিষ্ট বন্ধু রহমতকে ফোন করল। ব্যবসার কাজে আমেরিকায় গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহর জন্য। নিশ্চয় ফিরে এসেছে। ফোনে তাকে পাওয়া গেল না। মেসেজ রাখল একটা। সে যেন মেসেজ পেলেই তাকে ফোন করে। খুব জরুরী। জীবন মরন ব্যাপার। যদি মিজান কোন কারণে ফোন না ধরে, তাহলে রহমত যেন মেসেজ রাখে। মিজান সুবিধা মত তাকে কল ব্যাক করবে।

সাত

ঘণ্টা খানেক পর রহমতের ফোন এলো। মিজান তখনও সাহস করে বাসার ভেতরে ঢোকে নি। সে শেডের মধ্যে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করছে। জুলেখা কিংবা চাঁদনী – মেয়েটি যেই হয়ে থাক, তার রাগ কতখানি পড়েছে কে জানে। তাছাড়া ব্যাপারটা যতক্ষন না তার নিজের মাথার মধ্যে একটু খোলাসা হচ্ছে, ততক্ষণ সে একটু একা একা থাকতে চায়। রহমতের সাথে আলাপ করতে পারলে অন্তত একটু ভালো লাগত। সে মিজানের চেয়ে অনেক চটপটে, সব ব্যাপারেই কখন কি করতে হবে জানে।

তার ফোন পেয়ে একটা অসম্ভব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মিজান। শেডের দরজাটা ভালো করে ভিড়িয়ে দিয়ে ফোনটা ধরল।

"রহমত!" এক রকম ফিসফিসিয়ে উঠল সে।

রহমত অবাক কণ্ঠে বলল, "ঘটনা কি রে? এমন সিরিয়াস মেসেজ রেখেছিস কেন? এখন আবার এমন ফিসফিস করে কথা বলছিস। সব ঠিক আছে তো?"

মিজান অকারণেই দরজার দিকে তাকাল। "শোন, তোর সাথে আমার দেখা করা দরকার। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।"

"একটু খুলে বল না। কি ব্যাপার? সমস্যাটা কি?"

"সমস্যাটা জুলেখাকে নিয়ে," মিজান গলা নামিয়ে বলল। "সব খুলে বলতে পারছি না এখন। তুই যদি ফ্রি থাকিস, তাহলে তোর বাসায় চলে আসি?"

"এখন?" রহমত এবার সত্যিই অবাক হয়েছে। "সাংঘাতিক কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। তোকে তো হাত পা ধরেও আনা যায় না।"

মিজান বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "তুই কি বাসায়? আমি আসছি তাহলে।"

"আয়। আমার তো কোন অসুবিধা নেই। দুপুরে খেয়েছিস? আমার সাথে খাস।"

"তোর রান্না আমার মুখে রোচে না। তাছাড়া ক্ষিধে নেই। আসছি। সব খুলে বললে বুঝবি কি অসুবিধায় পড়েছি। মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

ফোন রেখে দিয়ে চুপি চুপি শেড থেকে বের হল মিজান। আড়চোখে উপরটা একবার দেখে নিল। জোহরাকে দেখা গেল না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সে তাকে লক্ষ্য করছে না। উপরের তলায় হাজার গন্ডা জানালা। কোথায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? যতখানি সম্ভব নিঃস্পৃহ মুখ করে ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা মার্সিডিজ সিডানটার দিকে এগিয়ে গেল। একটু বয়েস হয়েছে গাড়ীটার কিন্তু তারপরও দেখতে শুনতে এখনও চমৎকার আছে। নায়লা বেঁচে থাকতে একটা বি-এম-ডব্লিউ চালাত। সে মারা যাবার পর সেটা বিক্রি করে এই গাড়ীটা কিনেছে। সব কিছু নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিল। তার প্ল্যান মনে হচ্ছে মাথা থুবড়ে পড়তে চলেছে। তার মনে হচ্ছে সে একটা ভয়াবহ ভুল করেছে। ভালো করে না জেনে শুনে একটা মেয়েকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনাটা একেবারেই উচিৎ হয় নি।

খুব নীরবে গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মিজান। দরজাটা যতখানি নিঃশব্দে বন্ধ করা যায়, করল। চাবি বের করে গাড়ী স্টার্ট দিল। ড্রাইভ করে বেরিয়ে আসার সময় নিজের অজান্তেই তার দৃষ্টি রিয়ার ভিউ মিররে চলে গেল। মনে হল উপর তলার একটা জানালার পর্দা চকিতে সরে গেল। জুলেখা কি তাকে দেখেছে? মনের ভুলও হতে পারে। কে জানে?

রহমতের বাড়ী কাছেই। যেতে বড়জোর মিনিট দশ-পনের লাগে। বেশ পুরানো বাড়ী কিন্তু বড় সড়। অনেক গাছপালা। চারদিকে ঝোপ ঝাড় আর হাজার রকমের বুনো ফুলে এক রকম জঙ্গল হয়ে আছে। মিজানের মত রহমতের জীবনেও একটা বড়সড় ট্রাজেডি আছে। তার স্ত্রীর সাথে বছর পাঁচেক আগে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। রহমতের দোষের মধ্যে ছিল অতিরিক্ত মদ্যপান। বউ তাকে অনেক শোধরানোর চেষ্টা করেছিল। যখন কিছুতে কিছু হয় নি তখন ডিভোর্স দিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে। সেখানে তাদের বিরাট বাড়ী ঘর, সহায় সম্পত্তি আছে। তাদের বাচ্চা কাচ্চা না থাকায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বউ চলে যাবার পর রহমত খুব ভেঙে পড়ে এবং মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তার সময় এখন প্রধানত ব্যাবসার কাজে ঘুরে ঘুরে কাটে। আবার বিয়ে করবার কোন আগ্রহ তার কখনই ছিল না। সে নাকি একাই ভালো আছে। মিজানের মনে হয় সেও রহমতের মত একই ব্রত নিলেই ভালো করত।
মিজানের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মুখ দেখে বেশ অবাক হল রহমত। বন্ধুকে সে এতো ঘাবড়ে যেতে ইদানিং কালে দেখেনি। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর থেকে বেশ ফুরফুরে মন নিয়েই ছিল সে। রহমত ধরেই নিয়েছিল বউ নিয়ে আসার পর তার জীবন অসম্ভব আনন্দের মধ্যে কাটবে। সুন্দরী, তরুণী স্ত্রী – বন্ধুর মন্দ থাকার তো কারণ নেই।
"ঘটনা কি?" সরাসরি প্রশ্ন করে রহমত। "তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর সর্বস্ব গেছে।"
মিজান লিভিংরুমে রহমতের মুখোমুখি একটা সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে বসেছে। তার মাথায় ঝড়ের মত চিন্তা চলছে। কিভাবে গুছিয়ে বললে রহমত ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে ভাবছে সে। শেষে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সকালের পুরো ঘটনাটা খুলে বলল মিজান। অসম্ভব ভারী গাছ এবং মেহগনী কাঠের বিশাল ড্রেসিং টেবিলটা সরানোর কথাটাও উল্লেখ করল। রহমত গম্ভীর মুখে সব শুনল। "আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না, বন্ধু। বিশ্বাস করতে পারছি না। ভাবীকে দেখে তো মনেই হয় না সে একটা ভারী চেয়ার সরাতে পারবে। তুই নিশ্চিত ভাবীই এগুলো করেছে?"
"আজ সকালের ঘটনাতো আমার চোখের সামনেই হল।"
চিন্তিত মুখে মাথা দোলাল রহমত। মিজান যে তার কাছে এসেছে শুধু বন্ধুত্বের অধিকার নিয়ে, তা নয়। এই বিয়েতে রহমত বলা চলে একরকম ঘটক হিসাবে কাজ করেছিল।

সে নিজে অবশ্য জুলেখাকে চিনত না। কথাচ্ছলে এক সমাবেশে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিজানের একাকীত্বের কথা উল্লেখ করার পর, তার পরিচিত এক ভদ্রলোক জুলেখার খবর তাকে দেন। নাম ঠিকানা জানার পর রহমতই ফোনে জুলেখার নানীর সাথে যোগাযোগ করে। বিয়েতে রহমত যেতে পারে নি। তার একটা জরুরী কাজ পড়ে

যায়। মিজান একাই গিয়েছিল। কোন সমস্যা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে, ভালো করে খোঁজ খবর করা দরকার ছিল। সেই ভদ্রলোকের মুখের কথায় বিশ্বাস করে এতো বড় একটা কাজ করা ঠিক হয় নি। জুলেখার নানীর সাথে কথা বলে অবশ্য ভালোই লেগেছিল। কে জানত মেয়েটার এতো বড় একটা সমস্যা আছে? সবাই মিলে কৌশলে চেপে গেছে।

"সেই ভদ্রলোকের নামটা যেন কি ছিল?" মিজান শেষ পর্যন্ত নিজেই জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্ন যে উঠবে রহমত জানত। ওঠাই স্বাভাবিক।

"দৌলত মিয়া। আমার ফিফটি প্লাস ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ওনার দুঃসম্পর্কের ভাগ্নী হয় জুলেখা ভাবী।"

"তোর সাথে ইদানিং দেখা হয়েছে তার?" মিজান জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল রহমত। "তাকে অনেক দিন দেখিনি। তোর আর জুলেখা ভাবীর বিয়ের পরও ক্লাবে দু একবার দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে। কিন্তু গত ছয় মাসে দেখা হয় নি।"

"তার ঠিকানা, ফোন নাম্বার কিছু আছে তোর কাছে?"

"আছে। তার বাসায় আমরা দু'জনে মিলে একবার গিয়েছিলাম, মনে আছে? নানীর সাথে প্রথম যে দিন মোবাইলে কথা বললাম।"

মনে পড়ল মিজানের। প্রায় বছর দেড়েক আগের ঘটনা। মিসিসাগায় তার ভাড়া এপার্টমেন্টে গিয়েছিল ওরা দুই বন্ধু। দৌলত মিয়া ফোনে জুলেখার নানীর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং বিয়ের কথা তোলে। মিজান তার সেল ফোন বের করে এড্রেস বুক ঘাঁটল। ভেবেছিল ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা হয়ত তোলা আছে। খুঁজে পেল না। রহমত তার সেল ফোনে নাম্বারটা খুঁজে পেল। সে তখনই একটা রিং দিল। ফোন বেজেই চলেছে। কেউ ধরল না। ভয়েস মেইলেও গেল না। কেটে দিল রহমত। "কেউ তো ধরছে না।"

"নাম্বারটা ঠিক তো?"

"নিঃসন্দেহে। তার সাথে আমার মোটামুটি ভালোই বন্ধুত্ব ছিল। তোর বিয়ের ব্যাপার ছাড়াও মাঝে মাঝে এটা সেটা নিয়ে আলাপ হত ফোনে।"

"আজকাল ভয়েস মেইল থাকে না কার?" বিরক্ত কণ্ঠে বলল মিজান।

"যতদুর মনে পড়ে তার তো ভয়েস মেইল ছিল। হয়ত সার্ভিস চেঞ্জ করেছে।"

"এখন কি করা যায়, একটা বুদ্ধি দে।"

মাথা চুলকাল রহমত। "জুলেখা সম্বন্ধে জানে এমন তো আর কাউকে চিনি না। আরেকটা উপায় হচ্ছে গ্রামে গিয়ে মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করা। নানী তো আর বেঁচে নেই। বিয়ের সময় আর কে কে ছিল অনুষ্ঠানে?"

"হাতে গোনা কয়েকজন ছিল। নানী, এক দুঃসম্পর্কের মামা, নামটা ভুলে গেছি, কয়েক জন বৃদ্ধা, মনে হয় নানীর বান্ধবী বা প্রতিবেশী হবে। আর এক মৌলভি। মনে হয় স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়ায়।"

রহমত একটু চিন্তা করে বলল, "কেউ না কেউ নিশ্চয় কিছু জানে। তুই যা বলছিস সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপার তো খুবই রহস্যময়। সারা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে এতো বড় একটা ব্যাপার গোপন করা সম্ভব না। "
হতাশ ভঙ্গীতে শ্রাগ করল মিজান। "এখন কি জামালপুর গিয়ে খবর নেয়া সম্ভব! আমার কাজ কর্ম আছে না? তাছাড়া জুলেখাকেই বা কি বলব? ওকে একা রেখে যাওয়াও তো সম্ভব হবে না। আর নিয়ে যাবারতো প্রশ্নই ওঠে না। কি বিপদে পড়লাম বলত? আমার এখন ওর আশেপাশে যেতেও ভয় করছে। মাইকের পেটে প্লেটটা যে জোরে মেরেছে, তুই যদি দেখতিস...মাইকতো ছোটখাট মানুষ না। একেবারে ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়েছে। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম দম বন্ধ হয়ে মারা যায় কিনা। খুনের কেসে পড়ে যেতাম। বেচারী আর ফিরবে কিনা সন্দেহ আছে।"
রহমত হেসে ফেলল। "মাইককে নিয়ে তোর এখন না ভাবলেও চলবে। তোর বউয়ের কি করবি তাই বল।"
"সেই বুদ্ধি নেবার জন্যই তো তোর কাছে এলাম। তুই তো এখন পর্যন্ত কোন কিছুই করতে পারলি না। তোর বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারলেও তো কিছু না কিছু জানা যেত। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা কর না।"
"আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। ক্লাবের কেউ না কেউ খোঁজ দিতে পারবে। তুই বেশী ভাবিস না। জুলেখা ভাবী তো আর তোর উপর ক্ষেপে নি। মাইকের উপর ক্ষেপেছে। যথার্থ কারণও ছিল। বেচারী হরিণটার পেছনে লাগার কি দরকার ছিল ওর? একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল, কাম কাজের কোন ঠিক নেই। মেয়ে মানুষের হাতে পিটান খেয়ে একটু বুদ্ধি সুদ্ধি খুলতে পারে।"
"মাইকের কথা বাদ দে তো। ওকে নিয়ে কে ভাবছে? ওকে আমার কাজে লাগবে, কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যাবস্থা করা যাবে। ওকে সহজে কেউ কাজ দিতে চায় না। টাকার গন্ধ পেলেই ছুটে আসবে। তুই বরং বল, আমার কি করা উচিৎ?"
রহমত একটু ভেবে বলল, "আমার কি মনে হয় জানিস, তুই কিচ্ছু করিস না। এমন ভাব কর যেন কিছুই হয় নি। ইতিমধ্যে আমি দৌলত মিয়াকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। পাওয়া যাবে। পেলে তখন ব্যাটাকে ভালো করে ঝেড়ে দেখতে হবে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।"
মিজান চিন্তিত মুখে বলল, "তোর কি মনে হয় ওর কোন মানসিক সমস্যা আছে? আমার কাছে মনে হচ্ছে মাল্টিপল পারসোনালিটি। গায়ের জোরের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তবে পারসোনালিটি পরিবর্তন হবার সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তন হয়ত হওয়া সম্ভব। তুই কি বলিস?"
শ্রাগ করল রহমত। "আমি তো আর সাইকিয়াট্রিস্ট না। আমি কি বলব? কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আলাপ করে দেখতে পারিস।"
মাথা চুলকাল মিজান। "সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে, ওকে নিয়ে যেতে হবে। শুধু আমি গিয়ে কি করব? আজকে যে ব্যবহার দেখেছি, সাহস করে বলতে পারবো না। আমি একরকম দিশেহারা হয়ে গেছি। এই রকম কিছু একটা হতে পারে আমি চিন্তাই করিনি..."

"বললাম তো, স্বাভাবিক থাক। দৌলত মিয়াকে খুঁজে বের করি। সমাধান একটা হবে।" দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল মিজান। "তুই তো বলেই খালাস। বাস তো ঐ বাড়ীতে আমাকে করতে হবে।"

বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হল। বাসার ভেতরে ঢুকে দেখল জুলেখা রান্নাঘরে খুব মনযোগ দিয়ে রান্না করছে। সারা বাড়ীর সব আলো নেভানো, শুধুমাত্র রান্নাঘরের আলোটা জ্বলছে। মিজান লক্ষ্য করেছে জুলেখা খুব উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে না। এতোদিন এটা নিয়ে সে খুব একটা চিন্তা করে নি। আজ চেষ্টা করেও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। চুপি চুপি উপরে চলে যাবার চেষ্টা করছিল, জুলেখা ডাকল।
"শুনছেন?"
নিজেকে যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক রেখে রান্নাঘরে চলে এলো মিজান। "রান্না করছ? চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে। কি রাঁধছ?"
"অনেক কিছু। আপনি হাত মুখ ধয়ে আসেন। গরম গরম খেয়ে নেবেন।"
জুলেখার হাসি মুখ দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল মিজান। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে। আপাতত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা একটা করে দিন কোন সমস্যা ছাড়া যাপন করা। ভদ্র ছেলের মত মাথা দোলাল মিজান। "দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। একটু গোছল করতে হবে। ঠিক আছে?"
"দেরী করবেন না।" জুলেখা সহজ গলায় বলল।
দ্রুত উপরে এসে গোছল করল মিজান। নীচে আসতে আসতে আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেল। জুলেখা ডাইনিং টেবিলে সুন্দর করে খাবার পরিবেশন করেছে। ঘরের সব আলো গুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। চমৎকার লাগছে। মনটা ভালো হয়ে গেল মিজানের। এখন মনে হচ্ছে সকালে যা ঘটেছে সেটা হয়ত স্রেফ কল্পনা।
নিজ হাতে খাবার বেড়ে দিল জুলেখা। এটাই প্রথম। কতদিন মনে মনে এটাই চেয়েছে মিজান। আজ এভাবে কপাল খুলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল? মুখোমুখি বসেছে জুলেখা। সুন্দর একটা সুতির শাড়ী পরেছে। মুখে আলতো করে পাওডার দিয়েছে মনে হয়। সে এমনিতেই সুন্দর। আজ অপূর্ব লাগছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাচ্ছে মিজান। সরাসরি তাকাতে তার যেন একটু লজ্জাই লাগছে।
"কোথায় গিয়েছিলেন?" জুলেখা হঠাৎ জানতে চাইল।
"আমার এক বন্ধু ফোন দিয়েছিল," থতমত খেয়ে বলল মিজান। "ব্যাবসার কাজে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। ক' দিন আগে ফিরেছে, তাই দেখা করতে চাইল।"
"রহমত ভাই?"
"হ্যাঁ। তুমি চেন তাকে?" অবাক হবার পালা মিজানের।
"নামে চিনি। নানী বু'র সাথে কয়েকবার আলাপ করেছিলেন। বিয়ের আগে। নানী বু আমাকে বলেছে।" জুলেখা খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল।
মনে মনে প্রমাদ গুনল মিজান। জুলেখা কি কোন কিছুর ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করছে? হঠাৎ আজকেই কেন রহমতের সাথে দেখা করতে গেল মিজান? সে হয়ত কিছু একটা আন্দাজ করেছে।

"মাইক ঠিক আছে?" জুলেখা নীচু গলায় প্রশ্ন করল।
"মনে হয়। আমার সাথে কথা হয় নি।"
"লোকটাকে আমার পছন্দ না। মাতাল একটা! জীবজন্তুর প্রতি কোন মায়া নেই। কেমন পোষাক আষাক পরে। মনে হয় নেশা ভাংও করে। বদ লোক! ওকে ডাকবেন না।"
খুক খুক করে কাশল মিজান। মাইককে ঝট করে দেখে কারোরই পছন্দ হবে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে খারাপ নয়। জুলেখাকে না ক্ষেপিয়ে সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাই হল প্রশ্ন। এই মুহূর্তে চেপে গিয়ে পরে প্রসঙ্গটা তুললেই হবে। কিন্তু জুলেখা ব্যাপারটা চাঁপা পড়তে দিল না। "ঠিক আছে তো? ওকে আর ডাকবেন না।"
মিজান কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে তার কণ্ঠে কিঞ্চিত অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল। "কিছু বলছেন না কেন?"
মিজান খুক খুক করে কেশে বলল, "ওকে দেখে যা মনে হয় ও তত খারাপ নয়। বিশ্বাস কর আমাকে। একটু মাতাল, স্বীকার করছি। কিন্তু কাজ কর্ম পারে ভাল। অনেক সস্তা। অর্ধেক দামে কাজ করে দেয়। অর্ধেকেরও কম। ক' দিন বাদে ছাদের কাজ করাতে হবে। ছাদটা পুরানো হয়ে গেছে। অনেক টাকার ব্যাপার।"

থমথমে মুখে ওর দিকে তাকাল জুলেখা। "টাকাটাই বড়?"

ভুলটা বুঝতে দেরী হল না মিজানের। সে তরী সামলানোর চেষ্টা করল। "অবশ্যই না। তুমি ভেব না। অন্য কাউকে ডাকব। রান্না খুব মজা হয়েছে। তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না?"
মুখ নীচু করে কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে থাকল জুলেখা। তারপর ঝট করে উঠে, হাত ধুয়ে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে শোবার ঘরে চলে গেল। নিজের উপরেই বিরক্ত হল মিজান। ব্যাপারটা ঠিকমত সামলাতে পারল না। এতো কষ্ট করে রান্না বান্না করেছিল, পুরোটাই ভেস্তে গেল। নরম গলায় কয়েকবার 'জুলেখা' 'জুলেখা' বলে ডাকল। কোন উত্তর দিল না জুলেখা। খাবার আগ্রহ চলে গেছে মিজানের। সে একাকী ডাইনিং টেবিলে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষন। শেষে উঠে হাত ধুয়ে দুই কাপ চা বানিয়ে উপরে এলো। খুব দেরী হবার আগেই সন্ধি করে জুলেখার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই ভালো।
শোবার ঘরে ঢুকে ওর অবাক হবার পালা। জুলেখা সেখানে নেই। তার বালিশ এবং লেপ উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে করিডোরে বেরিয়ে এসে অন্যান্য ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করল সে। নায়লার পাশের ঘরটা গেস্ট রুম হিসাবে সবসময় সাজানো থাকে। দরজায় আলতো করে চাপ দিতে বুঝল, ভেতর থেকে বন্ধ। জুলেখা সেখানে রাতের জন্য আস্তানা গেড়েছে। এটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিজান। ভয়ে ভয়ে দু' বার নক করল।
"জুলেখা! জুলেখা!"
কোন উত্তর এলো না। আবার নক করতে গিয়েও থেমে গেল মিজান। তাকে উত্যক্ত করাটা ঠিক হবে না। চলে আসার আগে নীচু গলায় বলল, "তুমি না চাইলে আমি মাইককে ডাকব না। সত্যি বলছি।"
এবারেও কোন প্রত্যুত্তর এলো না। মিজান চুপি চুপি নিজের ঘরে ফিরে এল। রহমতই ঠিক বলেছে। মিজানের এখন উচিৎ হচ্ছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করা। জুলেখাকে আরোও ভালো করে না জানা পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভালো।

রাতে বিশাল কিং সাইজের বিছানায় একাকী শুয়ে নিজেকে অসম্ভব অসহায় মনে হয় মিজানের। যদিও জুলেখার সাথে তার এখন পর্যন্ত শারীরিক কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তারপরও একই বিছানায় শুতে তার ভালোই লাগছিল। একটু দূর থেকে হলেও জুলেখার গন্ধ পাওয়া যেত, তার নড়া চড়া শোনা যেত, ঘুমের মধ্যে সে শিশুসুলভ বিড়বিড় করে, শুনতে ভালো লাগত। মাত্র দু'ঘর ওপাশে জুলেখা একাকী রাত্রি যাপন করছে, ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। মাইককে নিয়ে এতো সমস্যার সৃষ্টি হবে সেটা সে ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করে নি। ডাইনিং টেবিলে জুলেখার কথা মেনে নিলেই হত। মাইককে ছাড়া তার চলবে না কথাটা ঠিক নয়। পয়সা ঢাললে প্রচুর মানুষ পাওয়া যাবে। কিছু টাকা বাচানো বড় না জুলেখা বড়? নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। যদিও পরে সে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। জুলেখার রাগ কতক্ষনে ভাঙবে কে জানে? ইতিমধ্যে রাগ করে সে কোন অযাচিত কিছু না করলেই হয়। যে টুকু সে দেখেছে, তাতে মনে হয় না তেমনটা হবার কোন সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই মেয়েটিকে তার এখন এত অপরিচিত মনে হচ্ছে যে নিশ্চিত করে কোন কিছুই ভাবতে পারছে না।

নাইট লাইটটা পরিবর্তন করতে ভুলে গেছে মিজান। আর আছে কিনা সে নিশ্চিত নয়। নতুন একটা কিনতে হবে। বাইরে আজ অন্ধকার। ঘরের মধ্যেও অন্ধকার। অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় লেপের ভেতরে ঢুকে ঘুমানোর চেষ্টা করল মিজান। আলো অন্ধকার নিয়ে সে সাধারণত রাতে মাথা ঘামায় না, যেহেতু বিছানায় যাওয়া মাত্রই তার ঘুম চলে আসে। আজ কিছুতেই এলো না। এপাশ ওপাশ করতে করতে আর্ধেক রাত পার করে দিয়ে কোন এক সময় দু'চোখের পাতা বোধহয় বুজে এসেছিল, হঠাৎ খস খস শব্দে সজাগ হয়ে গেল। কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে, নড়ল না। নিঃসাড়ে শুয়ে থেকে কান খাড়া করে চারদিকের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কাঠের বাড়ীতে রাতে স্বাভাবিকভাবেই নানান ধরণের সংকোচন প্রসারনের শব্দ হয়। অস্বাভাবিক কিছু কানে এলো না। ধীরে ধীরে দু'চোখের পাতা খুলল মিজান, অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতে দৃষ্টি কিছুটা পরিষ্কার হল। চোখের কোণ দিয়ে বিছানার পাশে কিছু একটা দেখল সে। কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে? জুলেখা? তাকাবে? জুলেখা যদি লুকিয়ে লুকিয়ে এসে থাকে তাহলে তাকানোটা কি ঠিক হবে? বুকের মধ্যে হৃতপিন্ডটা ঢুকুর ঢুকুর করছে। লেপের নীচে ঘেমে গেছে সে। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সাহস হল না। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে, ছায়ার মত তার চোখের কোণ থেকে অন্ধকার অবয়বটা নিঃশব্দে দরজার দিকে সরে গেল। কান খাড়া করে মনযোগ দিয়ে পদশব্দ শোনার চেষ্টা করল মিজান, খুব ম্লান পাতা ওল্টানোর মত একটা শব্দ শুনতে পেল। কয়েকটা দীর্ঘ মুহুর্তের পর আবার সব চুপচাপ হয়ে এলো। খুব ধীরে ধীরে দরজার দিকে ঘাড় ঘোরাল ও। ভয় হচ্ছিল হয়ত তাকাতেই দেখবে জুলেখা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার ধারনা মিথ্যে প্রমাণিত হল। কোথাও কেউ নেই, শুধু দলা বাঁধা অন্ধকার।

আট

পরদিন ভোরে ফযরের নামাজ পড়তে উঠল মিজান। সে আশা করেছিল জুলেখার সাথে দেখা হবে। সে যে কামরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেটার সাথে লাগোয়া কোন বাথরুম নেই। যার অর্থ অজু করতে হলে জুলেখাকে ঘর থেকে বের হতেই হবে। নামাজ পড়ে কিছুক্ষন উপরের করিডোরে হাঁটাহাঁটি করল মিজান। জুলেখার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টাল। হয়ত শরীরটা ভালো নেই। ঘুমাচ্ছে। আরোও পরে ডাকলে হবে। সব ঠিক ঠাক আছে কিনা জানাটা তার কর্তব্য। সে নীচে রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা খেল। তার মনের অস্থিরতা ক্রমাগত বাড়ছে। মাত্র দু' দিনের ব্যবধানে জুলেখাকে নিয়ে এতোখানি উদ্বেগের সৃষ্টি হবে এটা সে ঘুমাক্ষরেও ভাবেনি। একবার ভাবল রহমতকে ফোন করে আলাপ করে। কিন্তু রহমত ব্যাটা ঘুমাতে যায় ভোরের দিকে, ওঠে কখন কে জানে? কাজকর্ম না থাকলে হয়ত সারাদিন বিছানাতেই কাটিয়ে দেয়। বউ চলে যাবার পর তার আর কোন রুটিন-ফুটিন নেই। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় খুব সুখে আছে। ঘুরছে, ফিরছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, বাসার মধ্যে এবং বাইরে জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মিজান জানে রহমত নিঃসঙ্গতায় ভোগে। ব্যবসার কাজে যতক্ষন ব্যাস্ত থাকে ততক্ষন ভালো থাকে। বউ থাকতে সে যেরকম রুটিন করে রাজ্যের পার্টি আর অনুষ্ঠানে যেত, এখন তার একাংশও করে না। যেন স্ত্রী থাকতে তাকে উত্যক্ত করবার জন্যই সে যাবতীয় উল্টো-পাল্টা কাজগুলো করত। সে চলে যাবার পর তার আর কোন আগ্রহ নেই। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে মিজান। রহমতের অবস্থা দেখেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আবার বিয়ে করার। এখন তাকে সেই জন্য মাসুল দিতে হবে।
নয়টার দিকে রহমত নিজেই ফোন করল। "খবর আছে।"
মিজান অবাক হয়েছে। ছুটির দিনে রহমত এতো সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে এটা স্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে। উপরে জুলেখা এখনও তার কামরা থেকে বের হয়নি। কান খাড়া করেও সেই কামরা থেকে কোন শব্দ-টব্দ আসতে শুনছে না সে। এতো দেরী করে কখন ওঠে না জুলেখা। নিশ্চিত হবার জন্য উঁকি দিয়ে দেখল জুলেখার ঘরের দরজা বন্ধ আছে কিনা। তারপর নীচে লিভিংরুমের পাশে তার ছোট্ট রিডিং রুমে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। রহমতের সাথে তার আলাপ জুলেখার কানে গেলে প্রতিক্রিয়া কি হবে বোঝা দুষ্কর, কিন্তু খুব প্রীতিকর হবার কথা নয়।
একটা চেয়ারে বসে গলা নামিয়ে বলল, "বল। জুলেখা এখনও ঘুমাচ্ছে।"
"ব্যাটা দৌলতের খবর পাওয়া গেছে," রহমতের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ দম্ভ। "আমি কাউকে খুঁজে পাবো না এটা কখন হতে পারে? কাল রাতেই খবর পেয়ে গেছিলাম। তুই আবার সকাল সকাল শুয়ে পড়িস দেখে রিং দেই নি।"
"ভদ্রলোক কোথায় এখন?"
"লন্ডন, ওন্টারিও। ঠিকানা পেয়েছি। ফোন নাম্বারে কল দিয়েছিলাম, ভয়েস মেইলে চলে যাচ্ছে। বার তিনেক চেষ্টা করেছি সকাল থেকে। ধরে না।"
"হয়ত ঘুমাচ্ছে এখন। মাত্র তো নয়টা বাজে।"

"শোন, দৌলত মিয়া ভোর পাঁচটায় উঠে যোগ ব্যায়াম করে। আমি তাকে খুব ভালো মত চিনি। ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না। হলফ করে বলতে পারি তোকে।"
"ফোন না ধরার কি কারণ থাকতে পারে?" মিজান চিন্তিত ভাবে বলল।
"আমি কি করে বলব? কিন্তু হতে পারে জুলেখা ভাবী সম্বন্ধে সে হয়ত সত্যি সত্যিই কিছু জানে। আমি ফোন করছি বোঝা মাত্র কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছে।"
মিজান একটু ভেবে বলল, "আমি একবার চেষ্টা করব?"
"লাভ হবে না। এই ব্যাটা মনে হচ্ছে পিছলা। আমি কি বলি জানিস, আজ তো তোর অফিস নেই। চল, একেবারে লন্ডনে তার বাড়ীতে গিয়ে ঠেলে উঠি। মাত্র তো ঘন্টা দুই-আড়াইয়ের ড্রাইভ। সুযোগ দিলে হয়ত আর পরে ধরা যাবে না। এখন তোর সিদ্ধান্ত। আমি ফ্রি আছি।"
"তোর কি মনে হয় সে সাহায্য করতে পারবে?" মিজান দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে বলল।
"সাহায্য করতে পারুক না পারুক কিছু যে জানে সেই ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই," জোর দিয়ে বলল রহমত। "প্রথমত, এই এলাকা থেকে ভেগেছে। তারপর ফোন করছি, ধরছে না। আলামত ভালো না। খামাখা সময় নষ্ট না করে চল এখুনিই বেরিয়ে পড়ি। তুই তৈরি হ, আমি তোকে বিশ মিনিটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি।"
মাথা নাড়ল মিজান। "না, না। জুলেখা কিছু একটা সন্দেহ করে বসতে পারে। আমিই তোর ওখানে আসছি। তুই রেডী হয়ে থাক।"
"কাল রাত থেকে রেডী হয়ে আছি। তাড়াতাড়ি আয়। একটু রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ লাগছে।"
"তুই একটা পাগল!"
হা হা করে হাসল রহমত। "যলদি আয়।"

তারা লন্ডনে যখন পৌঁছাল তখন প্রায় মাঝ দুপুর। দৌলত মিয়ার মাঝারী সাইজের এক তলা বাড়ীটা শহরের পশ্চিম দিকে, একটু খোলামেলা জায়গায়। খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হল না। বাড়ির সামনে গাড়ী রাখল। কলিং বেল বাজাল। ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ড্রাইভওয়েতে একটা মিনিভ্যান পার্ক করা। বাসার চারদিক দেখে মনে হচ্ছে সেখানে মানুষজন বাস করছে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে বেল টেপার পরও যখন দরজা খুলল না তখন বিরক্ত হয়ে পাশের বাসায় গিয়ে বেল বাজাল রহমত। একজন শ্বেতাঙ্গ, বয়েসী মহিলা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, দৌলত মিয়াকে সে আগের দিন সন্ধ্যাতেই দেখেছে। গাড়ীটা তারই। তাদের অন্য কোন গাড়ী আছে বলে তার জানা নেই। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। তাদের একটি ছেলে আছে। ইউনিভার্সিটি যায়। সে বোধহয় অন্য কোথাও থাকে কারণ মহিলা তাকে বেশ কিছুদিন দেখে নি।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার দৌলত মিয়ার দরজার সামনে ফিরে এল ওরা। কলিং বেল না বাজিয়ে এবার ফোন করল রহমত। ভয়েস মেইলে গেল। "দৌলত সাহেব, আপনার সাথে দেখা না করে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। আর মিনিট পাচেকের মধ্যে

যদি দরজা না খোলেন তাহলে আমি পুলিশে খবর দেব। কে জানে আপনারা হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জরুরী চিকিৎসা দরকার। তারা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে..."
তার মেসেজ রাখা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে গেল। দৌলত মিয়ার স্ত্রী হবে। মাঝ বয়েসী মহিলা, সুতীর শাড়ী পরনে, ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢাকা। "ও তো বাসায় নাই। আমেরিকা গেছে অফিসের কাজে।"
রহমত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মিজান তাকে থামিয়ে নরম গলায় বলল, "ভাবী, আমার নাম মোহাম্মদ মিজান। দৌলত ভাই আমার একটা বিরাট উপকার করেছিলেন। আমার স্ত্রী ক্যান্সারে মারা যাবার পর আমি ভয়ানক একাকীত্বে ভুগছিলাম। একজন সঙ্গীনির খোঁজ করছিলাম। দৌলত ভাই একটি মেয়ের খোঁজ এনেছিলেন। আমি তাকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে এসেছি। আমি আপনাদেরকে আমার গরীবখানায় একটু আমন্ত্রণ জানাতে চাই।"
ভদ্রমহিলা অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার শেষ কথাটা আদৌ বিশ্বাস করে নি। "ও তো নেই এখানে। আপনারা না হয় পরে ফোন করেন। দুই তিন সপ্তাহর মধ্যে চলে আসবে।"
রহমত এই পর্যায়ে একটা অভিনব কাজ করে বসল। সে মাথা চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল, "উফ, মাথাটা হঠাৎ করে কেমন দুলে উঠল। আমার ডায়াবেটিস আছে। একটু বসতে হবে ভাবী। একটু জায়গা দেন..."
সে ভদ্রমহিলাকে একরকম সরিয়ে দিয়ে টলমল পায়ে ভেতরে ঢুকে লিভিংরুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "কোথায় যাচ্ছেন আপনি? একি? দৌলত! দৌলত!"
প্রায় তৎক্ষণাৎ কাঁচাপাকা দাড়িধারী একজন মাঝারী উচ্চতার লোক বাড়ীর অন্য পাশ থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। তার পরনে লুঙ্গী, গায়ে পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। রহমত তাকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠল, "আরে দৌলত সাহেব! কত দিন পর দেখা হল। কেমন আছেন? সব ভালো তো?"
দৌলত থেমে গম্ভীর মুখে তার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে মিজানের দিকে ফিরল। "আরিফা, ওনাকে ঢুকতে দাও। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আপনারা আসুন আমার সাথে। লিভিংরুমে গিয়ে বসি।"
লিভিংরুমটা বেশ বড়সড়, একাধিক সোফা দিয়ে সাজানো। মুখোমুখি সোফায় বসল দৌলত মিয়া। আরিফা দরজা বন্ধ করে লিভিংরুমের মুখে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, দৌলত তাকে নীরবে সরে যেতে বলল। আরিফা কয়েক পা সরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। রহমত এক গাল হাসি নিয়ে বলল, "দৌলত সাহেব, এটা কি ধরণের ব্যবহার হল বলেন তো? আমার তো ধারনা ছিল আমরা বন্ধু মানুষ। হঠাৎ এই রকমের বৈরী আচরণ কেন বলেন তো? ফোন করছি ধরছেন না, বাসায় এসে বেল টিপছি দরজা খুলছেন না। আপনি তো এই ধরণের মানুষ না ভাই।"
দৌলত একটা চাঁপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বলেন, কি সমস্যা হয়েছে?"
রহমতকে থামিয়ে দিয়ে এবার মিজান বলল, "আপনি জানতেন সমস্যা হবে, ঠিক বলেছি কিনা?"

দৌলত চাঁপা স্বরে বলল, "আমি আপনাদেরকে মেয়েটার খবর দিয়েছিলাম। বিয়ে করার আগে ভালো করে খোঁজ খবর নেয়াটা আপনার দায়িত্ব ছিল। এখন কোন সমস্যা হলে সেটা তো আমার দোষ না।"
মিজানের বুক ধুক পুক করছে। এই লোক নির্ঘাত কিছু জানে। ঠিক জায়গাতেই এসেছে তারা। সে লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, "ভাই, আপনাকে দোষারোপ করার জন্য আসি নি। বিপদে পড়েছি। আপনার সাহায্য চাইছি। মেয়েটি ভালো কিন্তু দু' একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। দুই তিনজন পুরুষ মানুষের চেয়েও বেশী। এতো রোগা একটা মেয়ের শরীরে এতো শক্তি কি করে হয়? শুধু শক্তি নয়, তাছাড়াও কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে, স্বাভাবিক মনে হয় না। একসময় খুব ভালো, আরেক সময় অসম্ভব ক্ষ্যাপা। আমি তো ভাই কিছুই বুঝতে পারছি না।"
দৌলত মিয়া চশমা খুলে চোখ মুছছে। তাকে নীরব থাকতে দেখেই হয়ত আবার লিভিংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল আরিফা। "ওকে আমরাও ভয় পাই। সবাই ভয় পায়। তখনই দৌলতকে বলেছিলাম এর মধ্যে না জড়াতে। *না, আমি মামা হই। ওর নানী মারা গেলে তখন কম বয়েসী মেয়েটা কোথায় যাবে? একটা দায়িত্ব আছে না?* এবার, দায়িত্ব পালন করছ?"
রহমত বলল, "ভাবী, আপনিও এসে বসেন না, প্লিজ! আপনি যা জানেন, আমাদেরকে বলেন। আমরা তো পুরো অন্ধকারে।"
আরিফা বসল না। বরং এক পা পিছিয়ে গিয়ে দৃষ্টি থেকে আধাআধি সরে গেল। দৌলত চশমাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "আপনারা গ্রামে গিয়ে কারো সাথে একটু কথা বললেই জানতে পারতেন, জুলেখার জ্বীনের দোষ আছে।"
"জ্বী!" মিজান দৌলতের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে গেল।
"জ্বীন!" রহমত অবিশ্বাস নিয়ে বলল।
দেয়ালের ওপাশ থেকে আরিফা বলল, "ওর কাছে জ্বীন আছে। ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে। রেগে গেলে ও কি করবে তার কোন ঠিক নেই।"
মাথা নাড়ল দৌলত। "আমার মনে হয় না ও কারো ক্ষতি করবে। কিন্তু জ্বীনকে দিয়ে অনেক কিছু করানো সম্ভব। আমি জানি, শুনতে অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু যাদের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, তারা আপনাকে বলবে খুব সাবধান থাকতে।"
আরিফা দেয়ালের ওপাশ থেকে চাঁপা স্বরে বলল, "এসবের মধ্যে আমরা জড়াতে চাই না। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যদি সমস্যা বেশী হয়, দেশে রেখে আসেন। আমাদেরকে বিরক্ত করবেন না। আমার একটা ছেলে আছে, তার কোন ক্ষতি হোক আমি চাই না।"
মিজান এবং রহমত কৌতূহলী হয়ে দৌলতের দিকে তাকাল। চশমাটাকে চোখে বসালো সে। "শোনেন, অনেকেই আছে যারা আমার কথা শুনে আমাকে পাগল ভাববে। বিজ্ঞানের যুগে কে কি বিশ্বাস করবে না করবে সেটা তাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার। আমি এবং আমার স্ত্রী ধর্মে বিশ্বাসী। জ্বীনের অস্তিত্বে আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাদের ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করি। তারা ভালো কাজ করতে পারে, খারাপ কাজও করতে পারে। কিছু কিছু মানুষের শরীরে তারা বাস করে। ঐ মানুষগুলো অস্বাভাবিক ব্যাবহার করে। সব

সময় না, মাঝে মাঝে। আমাদের ধারনা জুলেখার শরীরে একটা জ্বীন বাস করে। সে জন্যেই তার শরীরে এমন অসম্ভব শক্তি। অনেক ছোটবেলা থেকেই এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাকে নিয়ে কোন সমস্যা কখন হয় নি। কিন্তু যেহেতু সবাই জানত তার উপর জ্বীনের আছর আছে, তাকে বিয়ে দেয়াটা কঠিন ব্যাপার হয়ে ওঠে। মিজান সাহেব, আপনার বন্ধু যখন প্রথম আমাকে বলে যে আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী, তখন জুলেখার কথা আমার মনে হয়। আগেই বলেছি, সে কখন কারো ক্ষতি করেছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং জেনে শুনে আপনার কোন ক্ষতি হোক এটা আমি চাই নি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন।"

মিজান কি বলবে ঠিক বুঝতে পারে না। জ্বীনের কথা সে পড়েছে। গ্রামে তার আদি বাস, সুতরাং জ্বীনের আছর হওয়া মানুষ সে দেখেছে। বিশ্বাস করা না করা নিয়ে কখন ভাবে নি। দৌলত ঠিকই বলেছে। ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই সব তার কাছে খানিকটা গল্পের মত শোনায়। এটা কি সত্যি হতে পারে?

রহমত বলল, "আমাদের তাহলে এখন কি করা উচিৎ?"

দৌলত অসহায় ভঙ্গীতে হাত নাড়ল। "আমি বলতে পারব না। কিন্তু, যাই করেন, সাবধানে করবেন। আমার জানা মতে তাকে নিয়ে কখন কোন মারাত্বক সমস্যা হয় নি। সুতরাং চেষ্টা করলে মিজান সাহেব হয়ত মানিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না। আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, জুলেখা চাইলে যে কারো ক্ষতি করতে পারে। দূরত্ব তার কাছে ব্যাপার নয়। আমাদের একটি ছেলে আছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তার জীবনের কোন ঝুঁকি আমরা নিতে চাই না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মিজান সাহেবের ভয় পাবার কোন কারণ আছে।"

রহমত বাঁকা হেসে বলল, "আপনি একদিকে বলছেন আপনারা তাকে ভয় পান, আবার আরেক দিকে বলছেন আমার বন্ধুর তাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কোনটা ঠিক?"

দৌলত কিছু বলল না। আরিফা বলল, "ভাই, আপনারা এবার আসেন। যা জানতে চেয়েছিলেন, জেনেছেন। আমাদের আর কিছু বলার নেই।"

মিজান এবং রহমত চোখাচোখি করল। শ্রাগ করল রহমত। মিজান উঠে দাঁড়াল। "আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাবী। এই তথ্যটুকুর মূল্য অনেক। আপনাদেরকে আপাতত আর বিরক্ত করব না। চল, রহমত। আসি, দৌলত ভাই।"

চুপচাপ গাড়ীতে চলে এলো দু'জন। নিঃশব্দে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাল রহমত। তারপর বলল, "হুম! এই সম্ভাবনার কথা তো ঘুনাক্ষরেও ভাবি নি।"

মিজানকে দেখে মনে হল সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছু বলল না।

নয়

মিজান গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো জুলেখা। দ্রুত হেঁটে সামনের জানালায় চলে এলো, বাইরে তাকিয়ে মিজানের গাড়ীটাকে যতক্ষন দেখা গেল তাকিয়ে থাকল। সামনের বাঁক ঘুরতেই গাছ পালার আড়ালে হারিয়ে গেল মার্সিডিজটা। থমথমে মুখে কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। নীচে নেমে এলো। সময় নিয়ে এক কাপ চা খেল। কিছুক্ষন বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাগরকে তার দুই বাচ্চা সহ কোথাও দেখা গেল না। কি করবে ভাবছে জুলেখা। হাঁটতে হাঁটতে ওয়াল নাট গাছটার কাছে যাবে? পিচচীর সাথে দেখা হবে? পাগলাটা কোথায় কোথায় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে কে জানে? মাটি এখনও অনেক ভেজা। এই মুহূর্তে কাদা মাটিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে না। সে আবার উপরে উঠে এলো। নায়লার ঘরের দরজায় সে আর তালা দেয় নি। দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা। মিজান দেখেছে, কিছু বলে নি। আস্তে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আলতো পায়ে ভেতরে ঢুকল সে। এক কোনে রাখা বিশাল একটা কাঁচের আলমারীতে তার চোখ আটকে গেল। সামনে গিয়ে পাল্লা খুলতে গিয়ে দেখল তালা লাগানো। দ্রুত গিয়ে চাবির গোছা নিয়ে এলো। আলমারী খোলা গেল। অনেক এলবাম। কম করে হলেও বিশটা। নিশ্চয় নায়লা সযত্নে তার সংসারের তাবৎ কিছুর ছবি সাজিয়ে রেখেছে। অনেক দিনের সংসার ছিল বেচারীর। নায়লার জন্য তার খারাপই লাগছে। কাঁচের বাইরে থেকে এলবামগুলো দেখার পর থেকেই ভেতরের ছবি দেখতে ইচ্ছে করছিল জুলেখার। মিজানের সাথে বসে দেখলে মন্দ হত না, কিন্তু মিজান হয়ত খুব একটা স্বস্তি বোধ করবে না।
এলবামগুলো নিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল জুলেখা। রঙ্গীন কালি দিয়ে বড় বড় করে বছর লেখা। কোনটাতে এক বছর, কোনটাতে একাধিক। সবচেয়ে পুরানোটা দিয়েই শুরু করল। বিয়ের ছবি। নায়লা তখন অনেক অল্প বয়স্ক। বিশ – বাইশের বেশী নিশ্চয় হবে না। দেখাচ্ছে আরও কম। মিজানকেও খুব বয়স্ক মনে হচ্ছে না। সেই সময়ে সে বেশ সুদর্শনই ছিল। এখন চুল টুল অনেক পাতলা হয়ে গেছে, শরীরটাও ভারী হয়ে গেছে। বয়েসের ছাপ তার প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, আচার আচরণে। পুরো এলবামটাই নায়লা আর মিজানের ছবি। বিয়ের অনুষ্ঠানের। বিয়ের পর আত্মীয় স্বজন্দের সাথে। অধিকাংশ ছবিই রঙচটা। সময়ের চিহ্ন স্পষ্ট। একটার পর একটা এলবাম দেখতে থাকে জুলেখা। তৃতীয়টাতে গিয়ে পেল নায়লার প্রথম প্রেগনেন্সির ছবি। এই বাড়ীতে আসা অবধি মিজান তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোন কথা বলে নি। কোথাও সে তাদের কোন ছবিও দেখেনি। কিন্তু বিয়ের আগে তার নানীবু'র কাছে সে শুনেছিল মিজানের দুটি সন্তান আছে। নানীবু কোথা থেকে খবর পেয়েছিল কে জানে। মিজান বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার আগের সংসার নিয়ে কোন কথাই নিজ থেকে বলে নি। নায়লার প্রথম সন্তান একটি ছেলে। তার শত শত ছবি - প্রথম হামাগুড়ি, হাঁটা, দৌড়ান, স্কুলে যাওয়া, ফুটবল

খেলা ... বছর পাঁচ – ছয় পর্যন্ত তার বাবা মায়ের জীবনে বোধহয় আর কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। খুব ঠান্ডা দর্শন নিরীহ প্রকৃতির একটি ছেলে, খুব সম্ভবত একটু লাজুক, কারণ অধিকাংশ সময়েই ছবি তুলতে সে আগ্রহী না - একবার মায়ের পেছনে গিয়ে লুকাচ্ছে, নয়ত সোফার পেছনে মুখ গুজে পড়ে আছে। তাকে জোর করে করে ক্যামেরার সামনে আনতে হয়েছে।
তারপর আবার প্রেগনেন্ট নায়লা। এবার একটি মেয়ে। পরবর্তি অনেকগুলো এলবাম শুধু এই মেয়েটির ছবিতেই ভর্তি। দেখলেই বোঝা যায় সে সপ্রতিভ। তার চোখে মুখে একটা সংকল্পের ছাপ, যেন সে যা করতে চায় তা না করে ছাড়ে না। ছোটবেলা থেকেই একটু টমবয়ের মত। মাঠে-জংগলে ছুটাছুটি করছে, ভাইকে টেনে টেনে তার সাথে নিয়ে যাচ্ছে, গাছে উঠছে, লেকে সাঁতার কাটছে। ছবি তুলতে পছন্দ করে। ভাই ছাড়া কিছু বোঝে না। জোর করে করে তার ভাইকে সব কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাইটির আচার আচরণ দেখে মনে হয় সে তার বোনকে অসম্ভব ভালো বাসে। বোনের কোন অনুরোধ ফেলতে পারে না। মায়ের সাথেও তাদের দু'জনার অনেক ছবি। মিজান একরকম অদৃশ্য – খুব সম্ভবত সেই ছিল ক্যামেরা ম্যান।

শেষের এলবামটাতে দু'জনার পরিণত বয়েসের ছবি। ছেলেটা গ্রাজুয়েট হয়েছে। বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বোন ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মা কাঁদছে। ছেলেটা ভারী চশমা চোখে, সুদর্শন, গোবেচারা দর্শন। সে বোধহয় চাকরী পেয়েছে দূরে কোথাও। ছেলেটা চলে যাবার পর পরই বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়ে নায়লা। কারণ ছবির সংখ্যা হাতে গোনা। নায়লার শুষ্ক মুখের কয়েকটি ছবি আছে, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই সে অসুস্থ নাকি স্রেফ মন খারাপ। মেয়েটির গ্রাজুয়েশনের কোন ছবি নেই। যার অর্থ সে হয়ত এখনও পড়াশুনা করছে কিংবা তার মায়ের অসুস্থতার কারণে তার গ্রাজুয়েশনে কেউ যায়নি। তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হল, এই ভাই-বোন তাদের বাবার জীবন থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কেন? সে এলবামগুলোকে জায়গা মত গুছিয়ে রেখে নায়লার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিজানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হতে পারে তাকে বিয়ে করায় রেগে গিয়ে বাবার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তারা। তেমনটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে দোষারোপ করতে পারবে না জুলেখা। মধ্য বয়স্ক বাবা এক জন অল্প বয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করলে তার নিজেরও মেজাজ খারাপ হত। কিন্তু যাই হয়ে থাক, বাবা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিল সে করাবে। মনে মনে সংকল্প করল। কাজটা অবশ্য সহজ হবে না। বিশেষ করে মিজানের সাথে গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, তার পর কথা বার্তাই বন্ধ হয়ে গেছে। দোষটা তার নয়। মাইকের মত একটা পাঁড় মাতালের জন্য লোকটার এতো মায়া কেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কিন্তু এই জাতীয় মাতাল এবং ভবঘুরে মানুষ তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে যাদের অন্য প্রাণীর প্রতি কোন মায়া মহব্বত নেই। তার হাতে ঐ লোকটির কখন কোন বিপদ হলে সে নিজেকে কোন দোষারোপ করবে না।

ফিরতি পথে রহমতের সাথে খুব একটা কথাবার্তা হল না মিজানের। দু'জনাই যে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকল। এই সমস্যাটার অভিনবত্ব তাদের দু'জনকেই বেশ খানিকটা

নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ঠিক কিভাবে এগুনো উচিৎ বোঝা যাচ্ছে না। রহমতের বাসায় পৌঁছে দু'কাপ চা নিয়ে লিভিংরুমে বসল ওরা।
"কি করবি এখন?" রহমত প্রশ্নটা করলেও সে নিজেও জানে এই প্রশ্নের উত্তর মিজানের জানা নেই।
শ্রাগ করল মিজান। "কি করব? যাদের কাছে গিয়েছিলাম সাহায্য পাবো আশা করে, তারাই তো ভয়ে অস্থির! দৌলত মিয়াই ছিল আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। জুলেখার নানী তো মারা গেছেন। আর কার সাথে আলাপ করব?"
"নানী মারা যাবার পর, তুই না যাওয়া অবধি, জুলেখা ভাবী কার সাথে ছিল?"
"কেন?"
"বোঝার চেষ্টা করছি ওখানে ওর অন্য কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। ঐ গ্রামে ওদের এতো দিনের বাস, নিশ্চয় ওর চাচা-মামা-খালা-ফুপু কেউ না কেউ তো থাকেই।"
মাথা নাড়ল মিজান। "থাকলে তারা তো বিয়ের সময় আসত? কেউ ছিল না। নানী মারা যাবার পর জুলেখা ঐ বাড়িতেই একজন কাজের মহিলাকে নিয়ে থাকত। জুলেখাকে নিয়ে চলে আসার সময় তার হাতেই বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মাটির দোচালা ঘর। কিন্তু ওর বাবার বিশাল বাড়ী ছিল, সেটা আবার বহুদিন ধরেই পরিত্যাক্ত। আমি ভেতরে যাই নি, বাইরে থেকে দেখেছি। কিছু ঠিক ঠাক করাতে হবে আবাসযোগ্য করবার জন্য, কিন্তু এমন কোন খারাপ অবস্থা নয়। কেন কেউ থাকে না, আমার মাথায় ঢোকে নি।"
"তার বাবা-মা কবে মারা গেছেন? আমার মনে আছে বিয়ের আগে দৌলত মিয়া কিছু একটা বলেছিল।" রহমত মনে করবার চেষ্টা করল, মনে এলো না।
মিজানের মনে আছে। "ওর বাবা-মা আত্মহত্যা করেছিলেন। বিষ খেয়ে। তাদের একমাত্র সন্তান ছিল জুলেখা। তারা মারা যাবার পর জুলেখা তার নানীর কাছে চলে যায়। তাদের বাড়ীটা খালিই পড়ে থাকে। আস্তে আস্তে সেখানে সবাই যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এখন ওভাবেই পড়ে আছে।"
রহমত হতাশ হয়ে বলল, "এমন আর কেউ নেই যার সাথে আমরা আলাপ করতে পারি?"
মিজান শ্রাগ করল। "গ্রামে গেলে নিশ্চয় কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাতে কি লাভ? ও আমার স্ত্রী। ওকে আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।"
রহমত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "আরে পরিত্যাগ করবার কথা কে বলছে রে? আমি ভাবছি আরোও কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। তাহলে বোঝা যেত, আমরা কিভাবে এগুবো।"
মিজানকে খুব একটা উৎসাহী মনে হল না। মাথা নাড়ল সে। "এখন কাজ কর্ম ফেলে কোথাও যাওয়াটা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমি হঠাৎ করে গ্রামে যেতে চাইলে জুলেখা সন্দেহ করবে না? ওকে এখানে একা রেখেও তো আমি যেতে পারব না। আমার এমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যে তাদের কাছে ওকে রেখে কয়েকদিনের জন্য যাব। আমি নিরুপায়।"

রহমত ভর্তসনা করে বলল, "কি বলছিস তুই? তোর ছেলেমেয়েরা আছে না? তোর ভাবসাব দেখে মনে হয় তুই যেন নিঃসন্তান!"
"নিঃসন্তান হবার মতই তো। আমি বিয়ে করব শুনে কি করল দেখিস নি? ছেলেটা তো চুপচাপ, মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু মেয়েটা? পারলে আমাকে মারে! আশ্চর্য! বুড়ো বাবার কোন খবর রাখে না আবার সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে।"
"শোন, ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তোর রক্তের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয় না। তোর এই দরকারের সময় তাদের সাথে তোর যোগাযোগ করা উচিৎ। তাদের সাথে জুলেখা ভাবীর অন্তত পরিচয় করিয়ে দে। তারা বয়েসে ভাবীর কাছাকাছি - জিনিয়া বছর দুই তিনের ছোট হবে, মালেক কয়েক বছরের বড়। তাদের মধ্যে মিল মহব্বত হয়ে যেতে পারে। পারে না?"
জোরে জোরে মাথা নাড়ল মিজান। "মালেককে নিয়ে আমি ভয় পাই না। কিন্তু সে চলে ছোট বোনের ইশারায়। আর জিনিয়াকে তো চিনিস, কাউকে ছাড়ে না। ওর মা মারা যাবার পর এমনিতেই খুব ভেঙে পড়েছিল। তারপর আমি বিয়ে করছি শুনে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। আমাকে গুলী করে মারার হুমকী পর্যন্ত দিয়েছে!"
হা হা করে হাসল রহমত। "তোর মেয়েটা যে একটু পাগলী পাগলী সেতো আমরা সবাই জানি। আমাকে তো সেই ছোটবেলা থেকে সমানে পিটাচ্ছে। যেন আমি ওর বালির বস্তা! কিন্তু ওর মনটা হচ্ছে সোনায় গড়া। দেখিস না, মানুষের প্রয়োজনে কিভাবে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে। রাজ্যের নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত। ওদিকে আবার পড়াশুনা করছে, কাজ করছে। দরকারের সময় দেখিস, ঐ তোর পাশে এসে দাঁড়াবে।"
"ওকে আমার ভয় করে। অতিরিক্ত মারকুটে। আমি আর নায়লা দু'জনাই ঠান্ডা মানুষ, মেয়েটা এমন ডানপিটে হল কি করে কে জানে। যাই হোক, আপাতত ওকে ডাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি ভাবছি কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাব কিনা। শুধু ডাক্তার বললেই হবে। জুলেখা কি করে বুঝবে কিসের ডাক্তার।"
রহমত চিন্তিত মুখে বলল, "বন্ধু, আমার তো মনে হয় না সাইকিট্রিস্ট দিয়ে কোন কাজ হবে। জ্বীন-ভুতের ব্যাপার, অন্য ধরণের ডাক্তার লাগবে।"
মিজান অবাক হয়ে বলল, "কি বলছিস তুই? খোলাসা করে বল।"
"শোন, জ্বীন-পরী ধরলে সাধারণ ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন কাজ হয় না। এই জন্য বিশেষ ধরণের দক্ষতা লাগে। ওদেরকে বলে জ্বীনের ওঝা। গ্রামে থাকতে দেখিস নি? শুনেছি একমাত্র ওদের চিকিৎসাতেই নাকি কাজ হয়।"
মিজান বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। "এই সব আবোল তাবোল কথা বলিস নাতো। ওঝাদের অনেক ভুতুড়ে কান্ডকারখানার কথা শুনেছি। পিটিয়ে বেচারী রোগীকে মেরে পর্যন্ত ফেলেছে। ওসবের মধ্যে আমি যাচ্ছি না।"
সে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। রহমত বলল, "আরে, সব ওঝা কি এক নাকি? সব কিছুতে যেমন ভেজাল আছে, ওদের মধ্যেও ভেজাল আছে। আমরা খাঁটি একজনকে খুঁজে বের করব। তুই ভাবিস না। এই দায়িত্ব আমার। শুধু এক কাজ কর। মালেক আর জিনিয়াকে ফোন কর। বলবি তোর নতুন বউয়ের মন খারাপ। খুব

একাকিত্বে ভুগছে। ওদের সাথে পরিচিত হয়ে চায়। তুই চাস ওরা এসে তোর এখানে ক'দিন থাকুক। জ্বীনের কথা বলিস না। এরা আধুনিক ছেলেমেয়ে। ওসবে হয়ত বিশ্বাস নেই। তোকেই পাগল মনে করবে। কিন্তু আমার ধারনা - আসবে। ওরা তোর এখানে এসে কয়েকটা দিন থাক। সপ্তাহ দুই তিন সময় পেলেই আমি এই জ্বীন তাড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলব।"

নিরুত্তরে সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠল মিজান। রহমতের বুদ্ধিটা খারাপ না। ছেলেমেয়ে দুইটা কাছে থাকলে সে মনে জোর পাবে। কিন্তু সত্য কথা হল, নিজের মেয়েটাকে সে জুলেখার চেয়েও বেশী ভয় পায়। এক ঘন্টা দুরত্বের মধ্যে থেকেও বছর খানেকের উপর ছেলেমেয়েদের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। চিন্তা করা যায়? এতো ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে!

ফিরতি পথে মাইকের বাসায় একটু থামল মিজান। বেচারা পেটে যেভাবে আঘাত পেয়েছে, কোন খারাপ কিছু হল কিনা কে জানে? মাইকের বাসা বলতে একটা পুরানো বাড়ির বেসমেন্টের একটা ছোট্ট কামরা, কোন জানালা পর্যন্ত নেই। এটার জন্যই সে মাসে তিন শ ডলার করে গোনে। মেঝেতে একটা তেল চটচটে গদী। আসবাবপত্র বলতে আর কিছুই নেই। বেশ কিছু খালি সস্তা মদের বোতল চারদিকে গড়াগড়ি করছে। অনেক চেষ্টা করেছে মিজান কিন্তু তার মদ খাওয়া ছাড়াতে পারে নি। তার নাকি এটা ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই।
মিজানকে দেখে এক গাল হাসল মাইক। "কেন যেন মন বলছিল তুমি আমাকে দেখতে আসবে।"
মিজান আসার সময় তার জন্য ম্যাকডোনাল্ডস থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল, সেটা দেখে তার দাঁত সবগুলো বেরিয়ে গেল। "খুব ক্ষিধা লেগেছিল। থ্যাংক ইয়ু ম্যান!"
সে গপাগপ বার্গার এবং ফ্রাইস সাঁটতে শুরু করল। "তোমার পেটের কি অবস্থা?" জানতে চাইল মিজান।
"ব্যাথা আছে। তোমার এই বৌটার গায়ে অনেক জোর। প্লেটটা যখন আমার পেটে এসে লাগল, মনে হল যেন একটা কামানের গোলা এসে লাগল। তবে এখন ভালো আছি। টাইলানল খেয়েছি। দু' একদিনের মধ্যে ব্যাথা চলে যাবে।"
"কবে আসছ আবার?" মিজান সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল। মাইক আদৌ আর আসবে কিনা সেটা নিয়ে তার সন্দেহ আছে। "আমার ছাদে কিছু কাজ আছে। আবহাওয়াটা এখন তো ভালো হচ্ছে..."
মাইক মাথা দোলাল। কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। শব্দ করে গ্লাস থেকে কোক খেল। "আসবখনে দু' তিন দিনের মধ্যে। তোমার বউকে বল আমি মানুষ খারাপ না। একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভালো হয়েছে সে আমাকে থামিয়েছে। ঐ হরিণগুলো তো আমার কিছু করে নি। খামাখা আমি ওদেরকে কেন ব্যাথা দিতে যাচ্ছিলাম? আমিও ওর কাছে মাফ চেয়ে নেব। আমি থাকি জন্তর মত, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও মনুষত্ব্য আছে।"

"ওর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি নিজেও ওকে ঠিক মত বুঝি না। তুমি আসার আগে আমাকে ফোন দিও। আমি বাসায় থাকব।"
মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাসায় ফিরল মিজান, তখন শেষ বিকেল। ড্রাইভওয়েতে গাড়ী রেখে চারদিকে দ্রুত চোখ বোলাল মিজান। জুলেখাকে কোথাও দেখা গেল না। চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না।

সূর্যের শেষ আলোতে ভেতরে আলো আধারীর খেলা। পেছন ফিরে দরজা লাগাচ্ছিল মিজান, নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়াল জুলেখা। এতো দ্রুত সে কোথা থেকে এসে হাজির হল ঠাহর করতে পারে না মিজান। তার শরীর ছমছম করে ওঠে। জুলেখার মুখ গম্ভীর, চোখে ঔৎসুক্য। "মাইককে দেখতে গিয়েছিলেন?" শীতল গলায় জানতে চায় জুলেখা।
থতমত খেয়ে যায় মিজান। কি বলবে বুঝতে পারে না। সত্য বলাটা কি ঠিক হবে?
"মিথ্যে বলবেন না," জুলেখা নরম গলায় বলে।
মাথা দোলায় মিজান। "খারাপ কিছু হয়ে গেলে পুলিশী কেস হতে পারে। এখানে পুলিশ খুব তৎপর।"

"ভালো করেছেন। ওকে মুখে মানা করলেই হত। আমার ভুল হয়েছে। ভালো আছে লোকটা?" জুলেখার কণ্ঠে অকৃত্রিম দরদ।

মনে মনে অবাক হলেও মিজান সেটা প্রকাশ করে না। "ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।"
"ছাদের কাজ করতে আসবে?"
আবার মাথা দোলাল মিজান। হ্যাঁ। ঘুরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জুলেখা। "কাপড় বদলে আসেন। আমি চা বানাচ্ছি।"
মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল মিজান। এতো সহজে ছাড়া পাবে সে ভাবে নি। উপরে ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছাতে রান্নাঘর থেকে জুলেখার কণ্ঠ ভেসে এলো।
"আপনার ছেলেমেয়েদেরকে আসতে বলবেন। অনেক ছবি দেখছি ওদের, দেখতে ইচ্ছে করছে "
"আচ্ছা!" মৃদু কণ্ঠে বলে উপরে উঠে এল মিজান। বুঝল নায়লার সাজিয়ে রাখা এলবামগুলো দেখেছে জুলেখা। ছেলেমেয়েদেরকে এখানে ডাকলে পরিস্থিতি যে কোন দিকে গড়াবে কে জানে।

দশ

কয়েকটা দিন বেশ চুপচাপ, ঘটানাবিহীন কাটল। জুলেখা রাতে পৃথক বেডরুমে শোয়, কিন্তু মিজানের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিকই আছে। অন্ততপক্ষে বাইরে থেকে দেখে সবাই তাই ভাববে। মিজান কাজে কর্মে ব্যাস্ত থাকার চেষ্টা করে। আগে অফিস থেকে কখন বের হবে তাই নিয়ে ব্যাতিব্যাস্ত থাকত, এখন যত দেরীতে বাসায় ফিরতে পারে ততই ভাল। জুলেখার যে তাতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে তা নয়। সে নিজের ইচ্ছে মত বাসা সাজাচ্ছে, যখন ইচ্ছা জঙ্গলে হাঁটতে চলে যায়, বাগানে প্রচুর সময় কাটায়। বাসার ভেতরে এবং বাইরে দেখে মিজানের ইদানিং মনে হয় যেন নায়লা আবার ফিরে এসেছে। তার লুকিয়ে রাখা আসবাবপত্র সব বেরিয়ে এসেছে, পেছনের বাগানে তার প্রিয় ফুলগুলো সব ফুটতে শুরু করেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, জুলেখা ইচ্ছে করেই মিজানের মনে নায়লার স্মৃতি জাগ্রত রাখতে চায়। কারণটা বুঝতে সমস্যা হয় না। মিজানের সাথে কোন হৃদয়ের সম্পর্ক সে স্থাপন করতে চায় না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না সে। তাকে কেনইবা বিয়ে করতে গেল জুলেখা, আর কেনইবা ইচ্ছে করে এমন দূরত্ব রাখছে?

জিনিয়া এবং মালেকের সাথে সে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। মেয়েটা বেশী ত্যাঁদড়। ইচ্ছে করে ফোন ধরেনি। সে একটা লম্বা মেসেজ রেখেছে। মালেককে ফোন করতে সে ফোন ধরেছিল কিন্তু কথা বেশী দূর গড়ায় নি। সে বরাবরই মুখচোরা। তার হয়ে অধিকাংশ কথাবার্তা ত্যাঁদড় মেয়েটাই বলত। মালেককে আসতে বলায় সে বিড়বিড়িয়ে বলল, জিনিয়া যদি আসে তাহলে সেও আসবে। পুত্রকে খুব ভালোভাবেই চেনে মিজান। তার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট না করে মেয়েকে ধরার চেষ্টা করেছিল। তিন দিন পেরিয়ে গেল, কোন খবর নেই। অফিস থেকে আবার ফোন করেছিল সে। এবারও ধরেনি। আবারও লম্বা একটা মেসেজ রেখেছে। মেয়েটার মায়া অনেক। রাগ একটু পড়লে নিশ্চয় ফোন দেবে। কিন্তু বেশী দেরী না করলেই হয়। এই বিপদের সময়েই তাকে মিজানের প্রয়োজন।

মাইকের আসবার কথা ছিল, সেও আসে নি। বোধহয় সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি। মিজান তাকেও একটা ফোন দিল। পাওয়া গেল না। মেসেজ রাখল। ছাদটা একবার চেক করা উচিৎ। কতখানি কাজ করাতে হবে বোঝা দরকার। নীচ থেকে দেখে সঠিক ধারণা করা যায় না। মাইককে উইকএন্ডে আসতে বলল। সে বাসায় থাকবে। গাছটাও পুরোপুরি কাটা হয় নি। সেটাও শেষ করতে হবে।

শুক্রবার এলে ক'দিন আগেও মনটা ভালো হয়ে যেত মিজানের। দু'দিন অফিসে যেতে হবে না। জুলেখার সাথে অনেক খানি সময় কাটানো যাবে। কিন্তু গত শনিবারের পর থেকে পরিস্থিতি বেশ পালটে গেছে। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে একটু চিন্তাতেই পড়ে যায় মিজান। পরদিন আবার মাইক আসছে। ব্যাটা যত যাই বলুক, পেটে মালপানি পড়লে তার মস্তিষ্কের কোন ঠিক থাকে না। কি বলতে কি বলবে, আর কি করতে কি

করবে – আগে থেকে বলার কোন উপায় নেই। ফোনে পই পই করে বলেছে মিজান, মাইক যেন মদ টদ খেয়ে না আসে। জুলেখা আবার কোন কারণে ক্ষেপে গেলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে।

বাসায় ফিরে জুলেখাকে কোথাও দেখল না। পেছনের ডেক-এর দরজাটা খোলা। বাইরে উঁকি দিয়েও তাকে কোথাও দেখা গেল না। নিশ্চয় আবার জঙ্গলে গেছে। একা একা এভাবে বন-জংগলের মধ্যে কিভাবে হাঁটাহাঁটি করে, ভেবে পায় না মিজান। কোন স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে কি সেটা সম্ভব হত? মনে হয় না। সত্যিই কি জুলেখার সাথে জ্বীন আছে? সেই জ্বীনই কি তাকে এমন সাহসী আর শক্তিশালী করেছে? বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারে না মিজান। রহমতের কথা মত কোন ওঝা-টোঝাকে দেখানোর আগে সে জুলেখাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবে। তার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন। তার সাথে যোগাযোগ করে দেখতে হবে।

উপরে মাস্টার বেডরুমে এসে জামা কাপড় পাল্টাল মিজান। একবার ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে জুলেখাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু একটু পরেই সাহস হারিয়ে ফেলল। জুলেখা না চাঁদনী - ঐ জঙ্গলের মধ্যে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি করে জানবে সে। মালটিপল পারসোনালিটি সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরে বেশ কিছু পড়াশুনা করেছে। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী হয়েছে। কেউ বলছে তারা এমনটা হরদম দেখে, আবার কেউ বলছে পুরোটাই সাইকিট্রিস্টদের কারসাজী। কাকে বিশ্বাস করবে সে বুঝতে পারে না। তবে জুলেখার কান্ডকারখানা যতটুকু দেখেছে, তাতে তার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু সত্যতা নিশ্চয় আছে। জুলেখা এমনিতে খুবই নরম সরম, লাজুক ধরণের মেয়ে। কিন্তু যখন সে চাঁদনীতে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন সে শক্তিশালী, রাগী, নির্ভিক। এই রুপান্তরটা কিভাবে ঘটছে সে জানে না। যদি জুলেখাকে কোনভাবে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেয়া যায়, তাহলে হয়ত অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, জুলেখা যেন সন্দেহভাজন না হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, জুলেখা এখনও ফেরেনি। মিজানের একটু চিন্তাই হচ্ছে। ভাবল আরও মিনিট পনের দেখবে, তারপর যাবে খুঁজতে। হয়ত বেশী দূরে চলে গেছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিংবা অন্য কোন বিপদেও পড়তে পারে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল অনেক কিছু রান্না করেছে। ভাত, মাছ, গোশত, তরকারী। খামখেয়ালী। আজ কোন কারণে রাঁধতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হল না নিজে কিছু খেয়েছে। হয়ত ভেবেছে মিজান ফিরে এলে দু'জন একসাথে খাবে। অস্থির বোধ করছে মিজান। শেষে খুঁজতে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল। কিচেন কেবিনেট থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটা বের করল। আলো দ্রুত কমে আসছে। বড় জোর আর আধা ঘন্টা, তার পরই চারদিকে ঘন করে অন্ধকার নেমে আসবে। আজ চাঁদ উঠবে, কিন্তু কখন উঠবে সে সঠিক জানে না। কোট ক্লোজেটে একটা বেসবল ব্যাট রাখে, যদি কখন কোন কারণে দরকার পড়ে, সেটাকে বের করে হাতে নিল। প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভালো। কিসের সম্মুখীন হবে আগে থেকে বলার তো কোন উপায় নেই।

সে মাত্র দরজা খুলে বাইরে পা রাখছিল, দূরে জুলেখাকে দ্রুত পায়ে বাসার দিকে হেঁটে আসতে দেখল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই বয়েসে এতো ঝুট ঝামেলা কি সহ্য হয়? তার হৃতপিন্ড সেই তখন থেকে জোরে জোরে ধুক-পুক করছিল। জুলেখাকে দেখে ধীরে ধীরে কমে এল। সে কুসংস্কারছন্ন নয়, কিন্তু রাতের বেলা বনে জঙ্গলে যাবার মত সাহস তার নেই। আর কিছু না হোক জীব জন্তু তো থাকতে পারে। মানুষের ভয়ওতো আছে। জুলেখা বাসায় ঢোকার আগেই ফ্ল্যাশলাইট এবং বেসবল ব্যাট লুকিয়ে ফেলল মিজান। জুলেখা দেখলে কি ভাববে কে জানে।

ভেতরে ঢুকেই লজ্জিত মুখে হাসল জুলেখা। "অনেক দেরী করে ফেললাম। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম। কখন এসেছেন আপনি?"

মিজান কোমল গলায় বলল, "খুব বেশীক্ষন না। অফিসে কাজের চাপ অনেক। আমি তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম।"

মৃদু হাসল জুলেখা। "আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমার কিচ্ছু হবে না। নিশ্চয় ক্ষিধা লেগেছে। খাবার দেব?"

"তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি দিচ্ছি।"

"না, না। আমি দিচ্ছি। আপনি লিভিংরুমে গিয়ে বসুন। আমি টেবিল সাজিয়ে ডাকছি।"

মিজান আপত্তি করল না। সে বাধ্য ছেলের মত লিভিংরুমে গিয়ে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। জুলেখার ইচ্ছায় বাঁধ না সাধাই ভালো। চাঁদনীকে সে দেখতে চায় না। যতক্ষন জুলেখা আছে ততক্ষণই ভালো।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব একরকম নীরবেই চুকল। জুলেখা নিজের থেকে সাধারণত কথা বার্তা শুরু করে না। ক'দিন আগেও কথাবার্তা বলা নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না মিজানের। কিন্তু এখন সে কি নিয়ে কথা বলবে বুঝতে পারে না। ভয়ও হয়, কি থেকে কি প্রসঙ্গ উঠে আসে।

ডিনারের পর থালাবাসন ধুতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে জুলেখা। তাকে দেখে মনেই হয় না তার মধ্যে কোনরকম অস্বাভাবিকতা আছে। একটা সবুজ ডোরা কাটা সুতির শাড়ি আলুথালু করে পরা, কোমর সমান চুল খোপা করে বাঁধা, আপন মনে গুনগুন করে একটা গানও গাইছে। প্রেমের গান। মিজানের প্রতি তার কোন মনযোগ নেই। কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় মিজান। থাক, ওকে বিরক্ত করবার কোন দরকার নেই। সে ডেক-এ গিয়ে একা একা কিছুক্ষন হাঁটল। আধখানা চাঁদ উঠেছে, চমৎকার রুপালী আলোয় চারদিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। গাছপালার উপর প্রতিফলিত হয়ে সেই আলো একটা অদ্ভুত দৃশ্যের তৈরি করেছে। মিজান কখনই খুব একটা রোমান্টিক ছিল না। নায়লা ছিল। সে-ই তাকে জোর করে করে নানা জায়গায় নিয়ে যেত, জ্যোৎস্নায় বাইরে বের করে হাত ধরে হাঁটত, গান গাইতে পারত না কিন্তু রাজ্যের সব রোমান্টিক গান শুনত – বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মাঝে মাঝে ইংরেজীও। গজল খুব পছন্দ করত। জুলেখাকে বিয়ে করার পর থেকে নায়লাকে নিয়ে চিন্তা করতে তার দ্বিধা হত, নিজেকে অপরাধী মনে হত। আজ তার কেন যেন নায়লাকেই শুধু মনে পড়ছে। তার মনে হচ্ছে তার প্রেম হারিয়ে গেছে কোন অজানায়। সে ভেবেছিল আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে সে খুঁজে নেবে, কিন্তু যা ভেবেছিল তার কিছুই হয় নি।

রাত নয়টার দিকে বিছানায় চলে গেল মিজান। জুলেখা নীচের ফ্যামিলিরুমে সোফায় আয়েস করে বসে টেলিভিশন দেখছে। বাংলাদেশী টিভি চ্যানেল। নাটক দেখাচ্ছে। চুপি চুপি উপরে বেডরুমে চলে আসে মিজান। জুলেখা এখন আর এই ঘরে একেবারেই শোয় না। রাগ করে যে ঘরে সে ক্ষনস্থায়ী আবাস গেড়েছিল, সেটাই এখন তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেছে। মিজান এই প্রসঙ্গ একেবারেই তোলে না। জুলেখার যেখানে ইচ্ছা থাকুক। মিজানের কোন ক্ষতি না করলেই হয়। কেনই বা করবে? সে তো তার ভালো বই মন্দ কিছু করে নি।

চোখের পাতা মাত্র লেগে আসছিল, হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে এলো জুলেখা।

"শুনছেন?"

চমকে বিছানায় উঠে বসে মিজান। নাইট লাইটের ক্ষীণ আলোয় জুলেখাকে রহস্যময়ী মনে হয়। চুল ছেড়ে দিয়েছে সে। পিঠময় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। শাড়ীটাও মনে হল সুন্দর করে পরেছে। মনে হল পারফিউমের গন্ধও নাকে এলো। তার প্রিয় পারফিউম। ঘুম ছুটে গেল মিজানের। জুলেখার এই রুপের সাথে সে একেবারেই পরিচিত নয়। অভাবনীয়।

"কি জুলেখা? কিছু হয়েছে?" ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মিজান।

"বাইরে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চলেন, পেছনের মাঠে গিয়ে হাঁটব।" জুলেখার কথা নির্দেষের মত শোনায়।

ঘড়ি দেখল মিজান। রাত দশটা। খুব একটা রাত নয়। কিন্তু এই এলাকায় সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই চারদিকে এতো নীরব হয়ে পড়ে যে মনে হয় রাত অনেক গভীর হয়েছে। স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে গেঞ্জীর উপর একটা শার্ট পরে নিল মিজান। "চল।"

জুলেখাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। ডেক-এ যাবার স্লাইডিং ডোরটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল জুলেখা। হাতের ইশারায় তাকে আসতে বলল। কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি পাড়িয়ে ঘাসের উপর নামল ওরা। উষ্ণ রাত, ভেজা ঘাস, চমৎকার বাতাসের চলাচল। আধখানা চাঁদ আকাশ আলোকিত করে ভেসে আছে, যেন ছলকে ছলকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আনন্দময় দীপ্তি। জুলেখা পায়ের স্যান্ডেল খুলে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হিম সিম খেতে হচ্ছে মিজানকে। মাঠের কোথাও কোথাও কর্দমাক্ত, জলাময়, গোড়ালী পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। সেদিকে কোন খেয়াল নেই জুলেখার। সে যেন কোন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। মিজান কি করবে বুঝতে পারছে না। কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা? ডাকলে কি রেগে যাবে? বাড়ী থেকে প্রায় শ' দুই গজ চলে এসেছে ওরা। আরেকটু গেলেই জঙ্গল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে মিজানের। কোথায় নিয়ে চলেছে জুলেখা? এভাবে তাকে অনুসরণ করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি।

খানিকটা কাদা মাটি পাড়িয়ে একটা ছোট্ট ঢিবির উপর উঠল জুলেখা। তার পেছনে থামল মিজান। আলতো হেসে তার দিকে ফিরল জুলেখা দুই হাত দু দিকে ছড়িয়ে নিজের চারদিকে একপাক ঘুরল। "কি সুন্দর লাগছে দেখেছেন? চাঁদ রাতে আমার যে কি ভালো

লাগে? ইচ্ছা হয় যতক্ষণ আকাশে চাঁদ থাকবে ততক্ষণ শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। আপনার জ্যোৎস্না ভালো লাগে?"

জোৎস্না নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না মিজান। সে বরং একটু দুশ্চিন্তার মধ্যেই আছে। এই মেয়েটার সঙ্গ সে উপভোগ করবে নাকি আতঙ্কিত হয়ে থাকবে ঠিক বুঝতে পারছে না। চাঁদের ম্লান আলোয় জুলেখাকে সুন্দর লাগলেও সেই সৌন্দর্য সাধারণ মানবীয় মনে হয় না তার কাছে। কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা সেখানে আছে। তার এই পর্যায়ে একটু ভয় ভয় করছে। তার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জুলেখা। তার কণ্ঠস্বর চড়ল। "কি জিজ্ঞেস করছি শুনতে পাচ্ছেন?"

বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল মিজান। "উত্তর দিচ্ছেন না কেন?" ধমকে ওঠে জুলেখা। "আমার সঙ্গ ভালো লাগছে না?"

"খুব ভালো লাগছে," দ্রুত বলে মিজান। জুলেখার কণ্ঠে উষ্মা। লক্ষন ভালো নয়।

"লাগছে না। দেখেই বুঝতে পারছি। ভয় করছে? এতো ভয় কিসের? বিয়ে করার সময় তো ভয় লাগে নি?" হিস হিসিয়ে উঠল জুলেখা।

মিজান কণ্ঠস্বরে যতখানি সম্ভব আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলল, "জুলেখা, আমার সত্যিই ভালো লাগছে। এসো, একটু বসি। এখানটাতে শুকনা আছে।" হাত বাড়িয়ে জুলেখার একটা হাত আলতো করে ধরল সে। পরবর্তি ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটল, মিজান কিছু বুঝে উঠবার আগেই। হাতটা ঝটকা মেরে ছুটিয়ে নিয়ে চকিতে তার দিকে ঘুরল জুলেখা, বিদ্যুত বেগে একটা থাপ্পড় বসাল মিজানের মুখে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল মিজান, তার মাথা বন বন করে ঘুরছে। দর্পিত পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো জুলেখা। ফোঁস করে উঠল, "হাত ধরলি কেন? বলেছি হাত ধরতে?"

মিজান হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে দু'জনার মাঝখানে দূরত্বটা বাড়ানোর চেষ্টা করল। কাদায় জামাকাপড় মাখামাখি হয়ে গেছে। দূর্বল পায়ে উঠে দাঁড়াল, জুলেখার উপর চোখ। আবার কিছু করে বসবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে সে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। মিজানের দিকে আরেক পা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "চাঁদনী খারাপ মেয়ে না, বুঝেছিস?"

তাকে এগিয়ে আসতে দেখে সাহসের বাঁধ ভেঙে গেল মিজানের, বাড়ী লক্ষ্য করে ছুট দিল। ভয় হচ্ছিল চাঁদনী হয়ত তার পিছু নেবে, ধরে ফেলে বেধড়ক পেটাবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। পেছন থেকে মেয়েটার তীক্ষ্ণ, উদাত্ত হাসির শব্দ রাতের স্বাভাবিক নীরবতায় ঝন ঝন করে উঠল। মিজানের সমস্ত শরীর ছম ছম করে উঠল। দৌড়ের গতি বাড়ল। বাসার ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে হাপরের মত হাপাল কিছুক্ষন। দম ফিরতে বাইরে তাকিয়ে দেখল জুলেখা সেই ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে মুখ উঁচিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। একাধারে মনরম এবং ভয়ংকর একটা দৃশ্য। ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে মিজান। কি করবে? রহমতকে ফোন লাগাবে একটা? সেই বা কি করবে? তবে কি পুলিশে ফোন দেবে? তারাই বা কি করবে?

শেষ পর্যন্ত কিছু না করারই সিদ্ধান্ত নিল। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। সে যদি সত্যিই মিজানের ক্ষতি করতে চাইত, তাহলে ইতিমধ্যেই করত। তবুও সাবধানের মার

নেই। বেসবল ব্যাটটা সাথে নিয়ে লিভিংরুমে একটা সোফায় গুটিসুটি মেরে শুল। তার শরীরটা খুব ভালো লাগছে না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া যেত। কিন্তু ঠিক করল জুলেখা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।

সকালে ঘুম ভাঙতে সময় দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল। নয়টা! চারদিকে তাকিয়ে অবাক হবার পালা। নিজের বিছানাতেই সারারাত ঘুমিয়েছে সে। যার অর্থ, জুলেখা তাকে সোফা থেকে উপরে এনে শুইয়ে দিয়েছে। দৃশ্যটা ভাবতেই তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। করিডোরে এসে দেখল জুলেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোনটা বাজছে। ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরল। মাইক। জানতে চাইছে সে কখন আসবে? বাসায় সব ঠিক আছে কিনা? মিজান তাকে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আসতে বলে বাথরুম সারতে গেল। প্রতিটা দিন তার কাছ একটা সংগ্রামের মত মনে হচ্ছে। এভাবে কত দিন চলবে?

এগারো

মাইক পরদিন সকাল ঠিক দশটায় এসে হাজির হল। আজ পরিপাটি হয়ে এসেছে, তার পক্ষে যতটুকু পরিপাটি হওয়া সম্ভব। দেখেই বোঝা গেল গত রাতে তার পেটে খুব বেশী মদ পড়ে নি। শরীর থেকে তার ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখে মনে মনে একটু মজাই পেল মিজান। ব্যাটাকে এতোকাল ধরে বলছে একটু ঠিকঠাক হতে, পাত্তাই দেয় না। জুলেখার হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে একেবারে সিধা হয়ে গেছে। তার ভীতচকিত চাহনি দেখে মনের মধ্যে হাসি কুলকুলিয়ে উঠল। সে একাই যে শুধু জুলেখার ভয়ে জড়সড় হয়ে নেই, এটা দেখে ভালো লাগল। মাইক তার চেয়ে বেশ মোটাসোটা, বলশালী। এক প্লেটের বাড়ি খেয়ে তারই এমন করুন অবস্থা! অন্যদিন কাজ শুরু করবার আগে কিছুক্ষন গলা চড়িয়ে মিজানের সাথে নানা বিষয় নিয়ে গল্প-সল্প করে মাইক, আজ তার ধার দিয়েও গেল না। সোজা চেইন স' বের করে আগের দিনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে লেগে গেল। কম করে হলেও ঘন্টা তিন চারের কাজ বাকী আছে। মিজান তাকে একনিষ্ট মন কাজ করতে দেখে বাসার ভেতরে চলে এলো। জুলেখা সকালে নাস্তা বানিয়েছিল। তার মনও আজকে মনে হচ্ছে ফুরফুরে হয়ে আছে। আগের রাতের ঘটনা সে তোলে নি। মিজানও না। জুলেখার ভেতরে কি রহস্যময় খেলা চলছে কে জানে। তার ভেতরের দুটি স্বত্তার কোনটি কখন কি করছে, বোঝার কোন উপায় মিজানের নেই। সে ধারনা করে নিয়েছে জুলেখা বিনীত এবং ভদ্র; চাঁদনী উচ্ছল, তেজী, রাগী।

নিজের ঘরে এসে ল্যাপটপ খুলে বসল মিজান। ইমেইল চেক করল। রাজ্যের হাবিজাবি ইমেইল। আশা করেছিল মালেক কিংবা জিনিয়ার কাছ থেকে কিছু একটা আসবে।

জিনিয়ার রাগ হলে সে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে ইমেইল করে। আবার একটা ফোন দেবে? আগের মেসেজগুলো তো নিশ্চয় পেয়েছে। ইচ্ছে করে উত্তর দেয় নি। খুব তেজ দেখান হচ্ছে। জিনিয়াকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠাল। 'দেখা করবি না?'

তাকে অবাক করে দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই জবাব এল, 'আজ সন্ধ্যায়। এপলবিসে। মালেকও আসবে।'
'সন্ধ্যায় কখন?'
'সাতটা। এজাক্সের এপলবিসে। দেরী কর না। আমার অন্য কাজ আছে।'
'আমার ফোন ধরিস নি কেন?'
'আমার ইচ্ছা।'

চেপে গেল মিজান। ক্ষেপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আবার মত পালটে ফেলবে। কেমন খেয়ালী মেয়ে! আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে রাতে দেখা করবে। মিজানকে কিছু জানায় নি। শেষ মুহূর্তে বলত। জানে মিজান সব কাজ কর্ম ফেলে দৌড় দেবে। বাবাকে হাড়ে হাড়ে চেনে মেয়েটা।
রহমতকে একটা ফোন দিতে পারলে ভালো হত কিন্তু জুলেখার উপস্থিতিতে সাহস হল না। সে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। কোথাও নিরাপদ নয়। রহমতকে একটা টেক্সট করল। সন্ধ্যা সাতটায় এপলবিসে থাকতে বলল। জানে, দুনিয়ার তাবৎ কাজ থাকলেও আসবে রহমত। মালেক এবং জিনিয়াকে নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখে সে। তাছাড়া মাথার মধ্যে কিছু একটা ঢুকলে, সেটার শেষ না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

দুপুরে মাইকের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করল জুলেখা। মুর্গীর রোস্ট করেছিল। সাথে ভাত এবং আলু। সে নিজেই গিয়ে মাইককে ডেকে নিয়ে এসেছে। মিজান নীচে নেমে দেখল ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজান। মাইক ভদ্রছেলের মত বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। অভাবনীয় দৃশ্য। মুখোমুখি বসল দু'জন। জুলেখা তাদের সাথে বসল না। সে দুপুরে নাকি কিছু খায় না। দু'জনে নীরবে খেল ওরা। কথাবার্তা বলতে গিয়ে আবার কোন সমস্যায় পড়বে।
খাওয়া শেষ হতে মাইককে এক কাপ কফি বানিয়ে দিল জুলেখা। কফি নিয়ে আবার কাজে ফিরে গেল সে। মিজান তার পিছু নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাছটার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছে মাইক। আর হয়ত ঘন্টা খানেক লাগবে। "ছাদটা আজকে একটু দেখবে নাকি?" জানতে চাইল মিজান।
"দেখা যায়। তোমার লম্বা মইটা এখনও আছে তো?" মাইক কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল।
"আছে। মন হয় বেসমেন্টে নিয়ে রেখেছিলাম। তোমার শরীর এখন ভালো তো? পেটের কি অবস্থা?"
"ভালো," বিড়বিড়িয়ে বলল মাইক। "ঐ কথা তুলো না। তোমার বউ মানুষ ভালো। আমাকে কেউ লাঞ্চ খাওয়ায় না। কফিটাও খুব মজা হয়েছে।"
মানুষের কি দোষ? একটা মাতাল, ভবঘুরেকে কে পাত্তা দেবে? নায়লাও তাকে খুব একটা পছন্দ করত না। বলত, 'শরীর থেকে সারাক্ষন ভুরভুর করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। অসহ্য!' চা কফি সে কখন দেয় নি তা নয়, কিন্তু নিজের হাতে নয়। মিজানকে দিতে

হয়েছে। পারতপক্ষে সে মাইকের সাথে কথাবার্তা প্রায় বলতই না। তার নাকি ভয় করত।
ছাদটা টিলার মত। মাঝখানে উঁচু, কিনারে নীচু। তুষার যেন স্বাচ্ছন্দ্যে গলে নীচে পড়তে পারে সেই জন্য এভাবে তৈরী করা হয়। কিনারেই কম করে হলেও ত্রিশ ফুট উঁচু।
গাছটার ব্যাবস্থা করে বেসমেন্ট থেকে মইটা নিয়ে এল মাইক। একটা যুতসই জায়গা দেখে ছাদের সাথে ঠেস দিয়ে বসাল। তার নাকি রাতে একটা পার্টি আছে। সেই জন্য সে তাড়াহুড়া করছে। আজ শুধু দেখে যাবে। যদি এখুনিই মেরামত করাটা দরকারী হয়ে থাকে, তাহলে সে জিনিষপত্র কিনে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আসবে। মিজান নীচে দাঁড়িয়ে মইটাকে শক্ত করে ধরে আছে। মাইক নির্ভয়ে তর তর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। ছোট বেলা থেকেই এই জাতীয় কাজ করে আসছে, তার খুব একটা ভয় টয় নেই। কিন্তু মিজানের সব সময় ভয় হয় এই বুঝি লোকটা হুড়মুড় করে মাটিতে এসে পড়ে। এতো উপর থেকে পড়লে মানুষ মারা পর্যন্ত যেতে পারে। ছাদ মিস্ত্রীরা নিরাপত্তার জন্য হার্নেস ব্যবহার করে। মাইককে অনেকবার বলেছে মিজান হার্নেস ব্যবহার করতে। সে কখনই কান দেয় না। এসব নাকি তার কাছে দুধ ভাত।
হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে দেখছে মাইক। নীচে দাঁড়িয়ে মিজানের বুক ধুক পুক করছে। যেমন হেলায় ফেলায় নড়াচড়া করছে ব্যাটা, হঠাৎ পা পিছলে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। তার বাড়ীতে কাজ করতে এসে মাইকের কোন ক্ষতি হলে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।
"কেমন দেখছ?" নীচ থেকে গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল মিজান।
"যত খারাপ ভেবেছিলে তত খারাপ না," উপর থেকে চেঁচিয়ে বলল মাইক। "আরোও বছর তিন চার চলবে। দুই তিন জায়গায় একটু জোড়াতালি দিতে হবে। কয়েক ঘন্টার কাজ। এখন না করলেও অসুবিধা নেই। আগামী বছরও করতে পারো।"
"এই বছরই করে দাও। শীতকালে আবার পানি চুইয়ে পড়লে বিশাল সমস্যা হবে।"
জুলেখা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি মিজান। "ও পড়ে যাবে না?" তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পেছনে তাকাল মিজান। মাথা নাড়ল। "পড়বে না। সবসময় করে। যদিও আমার ভয় হয়।"
"পড়ে গেলে কি মরে যাবে?" জুলেখা কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইল।
উত্তর দেবার আগে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে পরখ করল মিজান। "বেকায়দায় পড়লে খুব খারাপ অবস্থা হতে পারে।"
"ফেলে দেব? মরবে না।" জুলেখার দু' চোখে দুষ্টুমি।
প্রমাদ গুনল মিজান। কি বলছে জুলেখা? তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?
খিল খিল করে হাসছে জুলেখা। "আমি ওকে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ফেলব না। আপনাকে একটু ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলাম। এতো ভয় কেন আপনার?"
মিজান কোন উত্তর দেয় না, ভয়ে ভয়ে উপরে ছাদের দিকে তাকায়। মাইককে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে চড়ার মত করে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উপরে উঠছে। "মাইক, যথেষ্ট হয়েছে। নীচে নেমে এসো।"
"ওপাশটা দেখা হয় নি এখনও," মাইক চীৎকার করে বলল।

"লাগবে না। নেমে এসো।" মিজানের কণ্ঠে আর্তি। জুলেখার আচরণ তার কাছে ভালো লাগছে না। তার বাড়ীতে মাইকের কোন ক্ষতি সে হতে দেবে না।
"কেন?" মাইক থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাঁকিয়ে জানতে চাইল। তার কণ্ঠে বিস্ময়। মিজান উত্তর দেবার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ করেই পা পিছলে যেতে শুরু করল মাইকের। দ্রুত নীচু হয়ে দুই হাতে ছাদের উপর নিজের শরীরের ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করল সে কিন্তু খুব একটা লাভ হল না। তার ভারী শরীর পিছলে নীচে নেমে আসছে। বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পেরে মাইক এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতের কাছে যা পাচ্ছে চেপে ধরে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে, গতি সামান্য কমলেও বন্ধ হল না। মিজানের শরীর হীম হয়ে এলো। আর বড়জোর ফুট পনের, তারপরই সোজা নীচের মাটিতে আছড়ে পড়বে মাইক, কম করে হলেও পঁচিশ ফুট। যদি বেঁচেও যায় মারাত্বকভাবে আহত হতে পারে। সে চীৎকার করে উঠল, "মাইক!"
মাইক গোঙ্গানীর মত একটা শব্দ করল। একই গতিতে পিছলে পড়ছে সে, নিজেকে থামাতে পারছে না। মিজান মইটাকে সরিয়ে তার পতনের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল, এতো অল্প সময়ে এই বিশাল মই সরান অসম্ভব। মই ছেড়ে দিয়ে সে দৌড়ে মাইকের নীচে চলে এলো। তাকে অনুসরণ করে তার পেছনে চলে এলো জুলেখা। এক হাতে তার বাহু চেপে ধরে টান দিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলল।
"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? ও আপনার উপরে পড়লে আপনি বাঁচবেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভর্তসনা করল।
মিজান উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মাইক তখনও পড়ছে, একেবারে কিনারে চলে এসেছে সে, বড়জোর ফুট পাঁচেক। হঠাৎ করেই তার পতন বন্ধ হয়ে গেল। উপুড় হয়ে ঢালু ছাদের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে মাইক। নড়তেও ভয় পাচ্ছে। ঠিক কেন থেমে গেছে বোধহয় নিজেও বুঝতে পারছে না।
মিজানের দিকে ফিরল জুলেখা, "মইটা এনে দেন। একটু খেলা করছিলাম। কিচ্ছু বোঝেন না।"
লাফিয়ে মাটি থেকে উঠল মিজান। "মাইক, ঠিক আছো?"
মাইক চাঁপা স্বরে বলল, "হ্যাঁ। পা পিছলে গিয়েছিল।"
"ওখানেই থাক। আমি মইটা আনছি।"
সে মইটা না নিয়ে আসা পর্যন্ত সেখানে থাকল জুলেখা, যদিও হাত লাগাল না। মাইক মই বেয়ে নীচে নেমে আসছে দেখার পর সে ভেতরে চলে গেল। তার মুখের মুচকি হাসিটা নজর এড়ালো না মিজানের। এটা কি সম্ভব?
মাইক দ্রুত নীচে নেমে এলো। তার মুখ লাল হয়ে আছে। বোঝা গেল সে খানিকটা হলেও ভয় পেয়েছে। ঘাসের উপর চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। "জীবনে এই রকম কখন হয় নি আমার। বয়েস হয়ে যাচ্ছে।"
"তোমাকে কতদিন বলেছি হার্নেস ব্যাবহার করতে!" মিজান রাগ দেখাল।
জুলেখার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাইক নীচু গলায় বলল, "তোমার বউ আমাকে বাঁচিয়েছে, তাই না? ওর মধ্যে বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে। সে না থাকলে আজকে আমি নির্ঘাত ওপারে চলে যেতাম। সে মনে হয় ফেরেশতা জাতীয় কিছু।"

মিজান গলা নামিয়ে বলল, "মাইক, তুমি কিন্তু কাউকে এসব নিয়ে কিছু বল না। ঠিক আছে?"
এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মাইক। "আমার জীবন বাঁচিয়েছে তোমার বউ। তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হবে না। আমার হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিও। আমার কথা তো সে কিছুই বোঝে না।"
তার পাশে মাটিতে বসে পড়ে মিজান। তার নিজেরও অনেক ক্লান্ত লাগছে। বুকের মধ্যে এখনও হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে। মাইকের অনুরোধে নীরবে মাথা দোলাল, কিছু বলল না।

বারো

এজাক্সে এপলবিস রেটুরেন্টটা কিংস্টন রোডের ঠিক পাশেই। একটু দোকানে যাচ্ছে বলে বাসা থেকে বেরিয়েছে মিজান। সাড়ে ছয়টার দিকে এপলবিসে চলে এলো। রহমতকে বলেছিল তাড়তাড়ি আসতে। মালেক এবং জিনিয়া আসার আগে। তারা আধুনিক যুগের ছেলেমেয়ে, তাদের কাছে আধি ভৌতিক বিষয়ে কথা বার্তা বলার আগে একটু চিন্তাভাবনা করা ভালো, নইলে শুনেই হয়ত নাক সিটকাবে, ভাববে কুসংস্কারছন্ন।
ভেতরে ঢুকে রহমতকে চার জনের একটা টেবিল বাগিয়ে বসে থাকতে দেখে আদৌ অবাক হল না মিজান। এই ব্যাটা এই রকমই। তাকে যুতসই একটা সমস্যা দিলে সে যতক্ষন না সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ সেটা নিয়েই বুদ হয়ে থাকতে পারে। মিজানকে দেখে সে দুই হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষন করল। মুখোমুখি বসল ওরা। কফির অর্ডার দিল। রহমতের চোখে মুখে পরিষ্কার উত্তেজনার চিহ্ন।
"প্ল্যান কি বল?" জানতে চাইল সে।
"ওদেরকে বলব আমার সাথে এসে থাকতে," মিজান বলল। "তুই ঠিকই বলেছিলি। ওরা একই জেনারেশনের। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে।"
"তাতে তোর কি লাভ? ওরাতো তোর সাথে সারা জীবন থাকবে না। জুলেখা ভাবীকে সারিয়ে তুলতে হবে"।
"কিন্তু এটা যে একটা অসুখ সেটাই বা ভাবছিস কেন? যদি সত্যি সত্যিই জ্বীনের আছর হয়ে থাকে, তাহলে কি করে সারাব?"
রহমত গলা নামিয়ে বলল, "শোন, আমি প্রথম থেকেই জ্বীন-ভুত করছি, মানছি। কিন্তু এটা অন্য কিছুও হতে পারে। সেই জন্য কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখানোটা জরুরী। মালেক আর জিনিয়া যদি তোর সাথে কয়েক দিন থাকে, তাহলে তুই হাতে একটু সময় পাবি। ওরা বাসায় থাকলে তোর ভয়টাও একটু কমবে। ভাবীও হয়ত একটু সমঝে চলবে। সেই সময় সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে একটা এপয়েন্টমেন্ট নে। "
"আচ্ছা, নেব। এখন বল, আমার দুই ছেলেমেয়েকে কি বলব? জুলেখা সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলাটা ঠিক হবে না। তাহলে ওরা আমাকে দোষারোপ করার একটা সুযোগ পাবে। বিশেষ করে জিনিয়া। আমি আবার বিয়ে করি, একেবারেই চায় নি ও।"

রহমত মাথা নাড়ল। "মাল্টিপল পার্সোনালিটি সম্বন্ধে কিছুই বলিস না। জ্বীন – ভুতের ব্যাপার তো তুলবিই না। বলতে পারিস, একটু আধটু মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। তুই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাস। সেই জন্য ওদের সাহায্যের তোর দরকার।"
মিজান চিন্তিত ভাবে বলল, "যা যা ঘটেছে ওগুলো বলব না?"

মাথা নাড়ল রহমত। "একেবারেই না। তুই কি ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাস? আগে থেকেই একটা আতংকের মধ্যে থাকলে কখন বন্ধুত্ব হবে? হয়ত দেখা করতেই চাইবে না।"
কফি চলে এসেছে। দু'জনে নীরবে কফিতে চুমুক দিল।
রহমত বলল, "ওরা আসার আগে আরেকটা আলাপ সেরে নেই। গতকাল দৌলত

মিয়াকে আবার ফোন দিয়েছিলাম, মোবাইলে। এইবার ধরল। ভদ্রলোক স্ত্রীকে অনেক

ভয় পায়। আমি পরিস্থিতি তাকে জানিয়ে খুব কাকুতি মিনতি করলাম। কেন যেন মনে

হচ্ছিল, আমাদেরকে সব খুলে বলে নি। ভদ্রলোক আমাদের সাথে দেখা করতে রাজী হয়েছে। "
চমকে ওঠে মিজান। "বলিস কি? সেদিন তো কথাই বলতে চাচ্ছিল না!"
"আরে, মানুষ চরিয়ে খাই। কাকে কিভাবে পটানো যায় ঠিকই ধরে ফেলি। বললাম, জুলেখা ভাবীকে রক্ষা করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। উল্টো পাল্টা কিছু করলে, পুলিশি

সমস্যা হতে পারে। তাকে সারা জীবন জেলের ঘানি টানতে হবে। কাজ হয়ে গেল।

হাজার হোক আত্মীয় তো!"
"কোথায় দেখা করবে? কখন?" মিজান ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজে গেছে। ছেলেমেয়েরা এসে পড়বে। এদেশে বড় হয়েছে। তাদের সময় জ্ঞান আবার খুব টনটনে।
"আজকে তাদের টরন্টো আসার কথা - তবলিগে। এক আত্মীয়ের বাসায় উঠবে। আজ রাতেই এশার নামাজের পর দেখা করবে বলেছে। ড্যানফোর্থের আবুবকর মসজিদে।"
"একটা কাজের কাজ করেছিস। আমারও মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক ঝেড়ে কাশছে না।"
রেস্টুরেন্টের সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল মালেক এবং জিনিয়া। চারদিকে তাকিয়ে মিজানকে খুঁজছে। একজন হোস্টেস ওদেরকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে গেল।
"দশটার মধ্যে মসজিদে থাকতে হবে আমাদের," রহমত বলল। "এখান থেকে যেতে কম করে হলেও আধা ঘন্টা লাগবে। সুতরাং সাড়ে নয়টার মধ্যেই এখানকার পর্ব সারতে হবে।"
হোস্টেস মেয়েটি মালেক এবং জিনিয়াকে মিজানদের টেবিলে নিয়ে এল। মালেক সব সময় পরিপাটি করে থাকতে পছন্দ করে, সেই ছোটবেলা থকেই। সে কোট প্যান্ট পরে এসেছে। সুদর্শন, সাধারণের চেয়ে লম্বা। অফিস কাট চুল। পরিষ্কার করে শেভ করা। প্রথমে রহমতের সাথে হাত মেলালো সে, পরে মিজানের সাথে কোলাকুলি করল। একটা চেয়ারে বসল। তাকে দেখে মনে হল না বাবার প্রতি তার তেমন কোন রাগ টাগ আছে। ছেলেটা নায়লার মত, মনে মনে ভাবল মিজান। ভদ্র, নম্র, স্বল্পবাক। প্রায় ত্রিশের মত বয়েস হতে গেল, এখনও কেন সে একলা ভেবে পায় না মিজান। নায়লা বেঁচে থাকতে

ছেলেকে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রাজী করাতে পারে নি। সে মিষ্টি হেসে বাবা-মাকে বলেছে, তার মনের মানুষের সাথে যখন দেখা হবে তখনই সে বিয়ে করবে। বোঝাই যাচ্ছে সেই দেখা আজও হয়নি, কখন হবে কিনা সন্দেহ আছে।
জিনিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সে একটা স্কার্ট এবং ঢিলা টি শার্ট পরে এসেছে, মাথার চুল একটা রিবন দিয়ে আটকিয়ে পেছনে ঝোলান। পায়ে খাট হিলের জুতা। সে মাঝারী গড়নের, লাবণ্যময়ী, কালো চোখ, লালচে চুল, ছটফটে। রহমতকে দেখেই তার পেট বরাবর একটা ঘুষি চালিয়ে দিল। তার হাতে জোর আছে। রহমত ব্যাথায় ককিয়ে উঠল।
"এতো জোরে মারলি?"
"এটা জোর হল?" জিনিয়া চোখ কুঁচকে বলল। "ঠিক আছো তো? দম নিতে পারছ?"
রহমত ধপাস করে বসে পড়ল। "বয়েস হয়েছে রে। আগের মত তো আর নই।"
বাবার দিকে তাকিয়ে একটা বিরক্ত চাহনী দিল জিনিয়া। হাত মেলানো কিংবা কোলাকুলি করবার কোন চেষ্টা করল না। সশব্দে চেয়ারে বসল। "তখনই বলেছিলাম, এইসব ছুড়ী টুড়ী বিয়ে কর না। এখন হল? ঝামেলা হচ্ছে, ঠিক কিনা?"
মিজান মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। "আমার উপর এতো রাগ কেন তোর? জানিস তো তোর মাকে আমি কত ভালবাসতাম। সে চলে যাবার পর তোরা সব চলে গেলি, আমার সময় কাটে কিভাবে?"
কনুই দিয়ে রহমতকে একটা গুতা দিল জিনিয়া। "এই বুড়ার সময় কাটে কিভাবে?"
মিজান শ্রাগ করল। "ও তো বরাবরই ঐরকম। আমি সংসারী মানুষ। আমার মত বয়েস হোক, তখন বুঝবি।"
জিনিয়া মুখ বাঁকাল। "বললেই হয়, কচি মেয়ে দেখে লোভ সামলাতে পারনি। কত টালবাহানা! যাক গিয়ে, খাবারের অর্ডার দেয়া যাক। ক্ষিধায় আমার নাড়ীভুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।"
হাত উঁচিয়ে একজন ওয়েট্রসকে ডাকল সে। অর্ডার দেয়া হল। রহমতের দিকে ফিরল জিনিয়া। "আঙ্কেল, তুমি এখনও বাবার পেছন পেছনই ঘুরছ? তোমার নিজের কোন জীবন নেই? লজ্জা হওয়া উচিৎ তোমার।"
রহমত ওর কথা শুনে হাসতে লাগল। মেয়েটাকে এই জন্য তার এতো ভালো লাগে। যা মুখে আসে তাই বলে, কোন রাখ ঢাক করে না।
মিজান বলল, "এভাবে বলছিস কেন? মানুষকে সম্মান করে কথা বলতে হয়।"
জিনিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "থাক, আমাকে ভদ্রতা শেখাতে হবে না। নিজের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতো বড় একটা কাজ করলে, তখন তোমার ভদ্রতা কোথায় ছিল? আমরা যে মনে কষ্ট পেতে পারি, সেটা ভুলে গিয়েছিলে? আর আমার কাছে একলা থাকার কথা বলবে না। আমি তো তোমার সাথেই থাকতাম। তোমার বিয়ের কথা শোনার পরই বাসা ছেড়েছি।"
মিজান নিচু গলায় বলল, "তুই কি আমার সাথে সারা জীবন থাকতিস? তোর নিজের জীবন নেই? একদিন তো যেতিসই। তখন তো আমি আবার একা হয়ে পড়তাম।"

জিনিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মালেক তাকে থামাল। "এইসব কথা বলে কোন লাভ নেই। বাবা, আমাদেরকে কেন ডেকেছ বল।"
একটা লম্বা শ্বাস নিল মিজান। ব্যাপারটাকে সুন্দর করে উপাস্থাপন করার উপর নির্ভর করছে তার সফলতা। জিনিয়াকে রাজী করাতে না পারলে মালেক কোন অবস্থাতেই রাজী হবে না। কিন্তু সে একটু চেষ্টা করলে বোনকে রাজী করাতে পারে। সুতরাং মালেককে দলে টানতে পারাটাও জরুরী।
পরবর্তি ঘন্টা খানেক সময় নিয়ে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে জুলেখার মানসিক সমস্যার কথা অল্প বিস্তর ব্যাখ্যা করল মিজান, কিন্তু খুলে কিছুই বলল না। মাল্টিপল পার্সোনালিটির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু চাঁদনী যে ইতিমধ্যেই কিছু অভাবনীয় কান্ড ঘটিয়েছে, সেগুলোর কোন উল্লেখ করে না। পরিশেষে যোগ করল, জুলেখাও ওদেরকে দেখতে চেয়েছে।
সব শোনার পর জিনিয়া সোজা সাপটা বলল, "তোমাকে আমরা কেন সাহায্য করব? বিয়ে করতে যখন মানা করেছিলাম তখন আমাদের কথা শুনেছিলে?"
মিজান করুণ গলায় বলল, "ভুল তো করে ফেলেছি। এবার বাঁচা।"
মালেক বোনের দিকে তাকাল। "সপ্তাহ খানেক এসে না হয় থাকলাম। মায়ের কত স্মৃতি আছে সেখানে। ভালোই লাগবে।"
ভাইকে শাঁসাল জিনিয়া, "তুমি এতো সহজে গলে যাও কেন, ভাইয়া? এখন কোন কথা দেবার দরকার নেই। আমরা পরে আলাপ করে ঠিক করব। বাবার যা ইচ্ছা হবে তাই করবে নাকি? একবার বিয়ে করছে, যখন সামলাতে পারছে না তখন আমাদেরকে এসে তাকে উদ্ধার করতে বলছে – এটা কি ফাজলামী নাকি? ভুগুক কিছুদিন। আমাদের কি?"
মালেক কখনই সরাসরি বোনের বিরোধিতা করে না। সে মৃদু হেসে বলল, "বাবা, আমরা তোমাকে পরে জানাব। বেশি চিন্তা কর না। এখানে নানা ধরণের চিকিৎসার সুযোগ আছে। জুলেখার যদি কোন সমস্যা থেকেও থাকে, ঠিক হয়ে যাবে।"
জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "আরে, তুমি কি বাবার নতুন বউকে নাম ধরে ডাকবে নাকি?"
মালেক শ্রাগ করল। "সে তো আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। ডাকলে কি অসুবিধা?"
"তাহলে আমিও নাম ধরে ডাকব," জিনিয়া ঘোষনা দিল। মিজানের দিকে তাকাল। "তোমার কোন আপত্তি নেই তো?"
মিজান বলল, "তোদের যা ইচ্ছা ডাকিস। জুলেখার আপত্তি না থাকলেই হল।"
মুখ বাঁকাল জিনিয়া। যেন বোঝাতে চাইল, জুলেখার আপত্তি থাকা না থাকা নিয়ে মাথা ঘামাতে তার বয়েই গেছে।
বিদায় নেবার আগে মিজানের সাথে আবার কোলাকুলি করল মালেক। জিনিয়া রহমতের পায়ে একটা লাথি দিল এবং মিজানকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় মাটিতে ফেলে দেবার উপক্রম করে ভাইয়ের পিছু নিয়ে চলে গেল।
রহমত হাসতে হাসতে বলল, "পাগলীটার কোন পরিবর্তন হয় নি। জুলেখা ভাবীর সাথে একই বাসায় গিয়ে উঠলে, দুই জনের মধ্যে মারপিট না শুরু হয়ে যায়।"
হেসে ফেলল মিজান। "রাজী হবে মনে হয়?"

শ্রাগ করল রহমত। "মালেক রাজী মনে হল। জিনিয়া তো খামখেয়ালি। কি সিদ্ধান্ত নেবে কে জানে। কাল রাতে জিনিয়াকে আরেকটা ফোন দিবি। মনে হচ্ছে রাগ পড়ে আসছে। চল, এবার যাওয়া দরকার। দেরী হলে দৌলত মিয়া আবার সটকে পড়তে পারে।"
মিজান জুলেখাকে একটা ফোন করল। তার যে ফিরতে দেরী হবে জানানো দরকার। দুশ্চিন্তা করতে পারে। সন্দেহ করতে পারে। জুলেখা ফোন ধরল না। এতো তাড়াতাড়ি সে কখন ঘুমায় না। হয়ত বাথরুমে। একটা ভয়েস মেইল রাখল মিজান। *ড্যানফর্থে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে। ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।*

তের

মসজিদে পৌঁছাতে যা ভেবেছিল তার চেয়ে কিছু বেশী সময় লাগল। স্কারবোরতে মাঝে মাঝেই রাস্তায় ভীড় লেগে যায়। মসজিদ ঢুকে দেখল এশার নামাজের জামাত শেষ হয়ে গেছে। অনেকেই সুন্নত এবং ওয়াজেব পড়ছে। চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মত নামাজী রয়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দৌলত মিয়াকে কোথাও দেখা গেল না। মন খারাপ করে মসজিদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জন, রহমতের সেল ফোন বেজে উঠল। দৌলত মিয়া। "রহমত ভাই, আপনারা কোথায়?"

"আমরা তো ভাই মসজিদের বাইরে। আপনাকে তো কোথাও দেখছি না।"
"আমি ভাই একটু আটকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসছি। পাঁচ মিনিট।"
পাঁচ নয়, মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল দৌলত। তাকে দেখে বেশ সন্ত্রস্থ মনে হচ্ছে। দ্রুতপায়ে মসজিদের ভেতরে ঢুকে মিজান এবং রহমতকে নিয়ে এক কোনে গিয়ে বসল সে। অনেকেরই নামাজ পড়া হয়ে গেছে। তারা চলে যাচ্ছে। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন তাদের নামাজ শেষ করছে কিংবা জপ করছে। দৌলত নীচু গলায় বলল, "ভাই, কাল রাত থেকে হঠাৎ ফুড পয়জনিং। সবাই যা খেয়েছে, আমিও তাই খেয়েছি। মনটা দূর্বল হয়ে আছে। আমার স্ত্রীকে বলিনি যে আপনাদের সাথে দেখা করব। জানলে সে কিছুতেই আসতে দিত না। জুলেখার সাথে যে মেয়ে জ্বীনটা থাকে, চাঁদনী, তার অনেক ক্ষমতা। সবার সেটাই বিশ্বাস।"
রহমত বলল, "মসজিদের মধ্যে কি সে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে?"
শ্রাগ করল দৌলত। "মনে হয় না। জানেন নিশ্চয়, জ্বীনদের মধ্যেও মুসলিম আছে। তাদের নিশ্চয় মসজিদে প্রবেশ করতে কোন নিষেধ নেই। চাঁদনীর কি ক্ষমতা আছে কিংবা নেই, স্পষ্ট করে কিছুই জানি না আমি। কিন্তু তারপরও সাহস করে এলাম কারণ

তাকে থামানো দরকার। এতো শান্ত, শিষ্ট একটা মেয়ে জুলেখা, এই শয়তানীটার হাতে পড়ে তার সমস্ত জীবনটা ছারখার হয়ে গেছে।"
রহমত বলল, "দৌলত ভাই, আপনি যা জানেন সব আমাদেরকে বলেন। কথা দিচ্ছি, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সব কিছু আমরা করব জুলেখা ভাবীর জন্য।"
দৌলত গলা আরোও নামিয়ে ফেলল। "জুলেখার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। জামালপুরের কাছাকাছি আরেকটা গ্রাম আছে, আমিরগঞ্জ। সেই গ্রামের এক অবস্থাপন্ন পরিবারে ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা মা। ছেলেটা শিক্ষিত, ভদ্র ছিল। কলেজে পড়ায়। তার নাম আসলাম আলী। বাবার নাম জলিল মাতবর। জলিলকে ওদিকে সবাই কম বেশী চেনে। সে ঐ এলাকায় এক সময় চেয়ারম্যান ছিল, অনেক জমি জিরেত আছে। কিন্তু মানুষ ভালো। বিশ্বাস করবেন না, মাত্র এক সপ্তাহ পর আসলাম জুলেখাকে তালাক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কি হয়েছিল কেউ জানে না। কারণ তারা কাউকে কিছু বলে নি।"
মিজান বলল, "এটা কত বছর আগের ঘটনা?"
"তিন চার বছর হবে। এর কয়েক মাস পরেই ওর বাবা মা আত্মহত্যা করে। মনে হয় এই অপমান তারা সহ্য করতে পারে নি। তারাও দশ গ্রামে পরিচিত ছিল, সবাই সম্মান করত। তাদের একমাত্র মেয়েকে কেউ এভাবে তালাক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে, চিন্তা করা যায়!"
রহমত মিজানের দিকে ফিরল। চোখাচোখি হল দু জনার। বন্ধুর চিন্তা ধারা ধরতে অসুবিধা হল না রহমতের।
"দৌলত ভাই, আপনি আমাদের কি করতে বলেন? আসলাম আলীর সাথে দেখা করলে কি কোন লাভ হবে মনে হয়?"
দৌলত ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার মনে হয় শুধু আসলাম না, আপনাদের উচিৎ গ্রামে গিয়ে জুলেখার আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলা। আমি তত কাছের আত্মীয় নই। অনেক কিছুই আমি জানি না। কিন্তু আমার ধারনা, কেউ না কেউ গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে। সেই তথ্য না জানলে ঐ ডাকিনীর হাত থেকে জুলেখাকে মুক্ত করা যাবে না।"
মিজান হতাশ কণ্ঠে বলল, "আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব হবে না। জুলেখাকে একা রেখে কি করে যাব?"

"আমি যাব," রহমত বলল। "বাংলাদেশে আমার কিছু ব্যবসা আছে। সেগুলো একটু দেখে এলাম, এই কাজটাও সেরে এলাম। কি বলিস?"
মিজান অবাক হয়ে বলল, "সত্যিই তুই যাবি?"
"হ্যাঁ। তুই তো আমাকে চিনিস। কোন রহস্য মাথায় নিয়ে আমি রাতে ভালো ঘুমাতে পারি না। যাবো আর আসব। সপ্তাহ খানেকের বেশী লাগার কথা নয়। ভাবিস না। যা জানার সব না জেনে ফিরব না।"
দৌলত সাবধানী কণ্ঠে বলল, "ভাই, যাবেন ভালো কথা, কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। জ্বীনদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের ধারনা তত পরিষ্কার নয়। কিন্তু চাঁদনী যদি কোনভাবে টের পায় আপনি সেখানে গেছেন ওর সম্বন্ধে খবর নিতে, তাহলে সে কিন্তু ভয়ানক ক্ষেপে যেতে পারে।"

মিজান সতর্ক কণ্ঠে বলল, "কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে জ্বীনরা?"

শ্রাগ করল দৌলত। "মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু দুষ্ট জ্বীনদের অনেক ক্ষমতা থাকে, এটা সবাই জানে।"
রহমত খুব একটা গায়ে মাখল না। "আমি অনেক শক্ত মনের মানুষ। আমার ক্ষতি করা অত সোজা নয়।"
দৌলতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন ফিরতি পথ ধরল তখন রাত এগারোটা। মিজান গাড়ী চালাতে চালাতে রহমতের দিকে ফিরল। "সত্যিই যাবি?"
রহমত বলল, "বন্ধু, এখন তো যেতেই হবে, রহস্য ঘনীভুত হচ্ছে। দেখি যদি টিকিট পাই তাহলে কালই রওনা দেব। "
বন্ধুকে ভালো ভাবেই চেনে মিজান। একবার মনস্থির করে ফেললে সেটা সে করেই ছাড়বে। রহমত গাড়িতে বসেই তার পরিচিত এক এজেন্টকে ফোন করল। বিশ মিনিটের মধ্যেই টিকিট কাটা হয়ে গেল। টরন্টো থেকে ঢাকা, সেখান থেকে গাড়ী ভাড়া করে জামালপুর চলে যাবে। পর দিনই ফ্লাইট।

রাতে বাসায় ফিরে দেখল জুলেখা ঘুমাতে চলে গেছে। আজও অন্য ঘরেই শুয়েছে। দরজা রোজকার মতই বন্ধ। মিজান নিজেও জামা কাপড় পালটে, দাঁত মেজে, বিছানায় চলে গেল। ক্লান্ত লাগছে। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। আগের মত আর শক্তি পায় না যেন। মনে মনে একটু আফসোসই হয় এখন। এই দ্বিতীয় বিবাহের ঝামেলায় তার যাওয়াটাই উচিৎ হয় নি। জিনিয়াই ঠিক। রহমত যদি থাকতে পারে, তাহলে সেও পারত। বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে গেল সে।
শেষ রাতে ঘুম ভাঙল। ফযরের নামাজের সময় এখনও হয় নি। বাইরে এখনও অন্ধকার। ঘুম ভাঙার কারণটা পরিষ্কার হল না। কয়েক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনল। মনে হচ্ছে কেউ করিডোরে হাঁটাচলা করছে। নিশ্চয় জুলেখা। কিন্তু এই সময়ে কি করছে সে? নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ল মিজান। রাতে সে দরজাটা ভিড়িয়ে রাখে, কখন বন্ধ করে না। দরজার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। করিডোরে আলো জ্বলছে। জুলেখার ঘরের বিপরীত দিকে পাশাপাশি দু'টা কামরা। বিছনা পত্র সব আছে।

একসময় মালেক এবং জিনিয়ার ঘর ছিল। মালেক চাকরী পাবার পর বাড়ী ছেড়েছিল। নায়লা অনেক বলেছিল থাকতে, থাকে নি। মাকে বুঝিয়েছে, বাবা মায়ের সাথে থাকে শুনলে এই জীবনে কোন মেয়ের সাথে খাতির হবে না। তারা ধরেই নেবে সে একটা অপগন্ড। ছেলে চলে যাবার পরও ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত নায়লা। মাঝে মাঝেই উইকএন্ডে চলে আসত মালেক। মাকে খুব ভালবাসত। মায়ের অনুরোধ সহজে ফেলতে পারত না। জিনিয়া মায়ের মৃত্যুর পরও এ বাড়ীতেই থাকত। মিজান বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করবার পর সে রাগ করে স্কারবোরতে একটা কামরা ভাড়া নিয়ে চলে যায়। তার ঘরটা সে যেভাবে রেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে। মিজান ঘর দুটা তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। চাবি তার ড্রয়ারে রাখা থাকত। ওরা আবার কবে আসবে কে জানে? জুলেখা কামরা দুটো খুলে পরিষ্কার করছে। অবাক হবার পালা মিজানের।

গলা খাঁকারি দিয়ে দরজা খুলে বাইরে করিডোরে বেরিয়ে এলো সে। তাকে দেখে ফিরে তাকাল জুলেখা, চমকাল না। "ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম আপনার?"
"না, না। এমনিই ভেঙে গেল। তুমি কি করছ?"
"মালেক এবং জিনিয়ার ঘর ঠিক ঠাক করে রাখছি। আমার মন বলছে ওরা আসবে।"
জুলেখা সহজ কণ্ঠে বলল। "বিছানার চাদরগুলো কবে শেষ বদলানো হয়েছে কে জানে। ঝাড়ু টাড়ুও দেয়া হয় না। চারদিকে বালুর আস্তর পড়ে আছে। আপনি ঘুমাতে যান। ফযরের নামাজের সময় হতে এখনও ঘন্টা খানেকের উপর বাকী।"
মিজান সাহস করে বলল, "আমি তোমার সাথে হাত লাগাব?"
মাথা নাড়ল জুলেখা। "লাগবে না। সামান্য কাজ। তাছাড়া আমার ঘুম আসছে না, ব্যাস্ত থাকতে ভালো লাগছে। আপনি ঘুমাতে যান।"
কথা বাড়ালো না মিজান। বিছানায় ফিরে এলো। জুলেখা কি কিছু আন্দাজ করেছে? জ্বীনের মাধ্যমে খবর পাওয়া কি সম্ভব? জ্বীন কি আদৌ মানুষের উপর আছর করতে পারে? অনেকে তো জ্বীন-ভুতের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলে। জুলেখা গুনগুন করে একটা গান গাইছে। খুব মায়া ভরা একটা গান। শুনতে শুনতে আবার চোখ লেগে এলো মিজানের।

চৌদ্দ

রহমত ঢাকা পৌছে প্রথমে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। ঢাকায় তার একটা প্রেস আছে। তার ছোট ভাই আলামত চালায়। বউ বাচ্চা নিয়ে ছোট্ট একটা বাসায় থাকে। সেখানে গিয়ে ঠেলে উঠে বিরক্ত করতে চায় না রহমত। খবরও দেয় নি। আলামত ব্যাস্ত হয়ে পড়বে।
ভোরবেলা এসে পৌঁছেছে। হোটেল রুমে কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নিল রহমত। দুপুরের দিকে একটা গাড়ী ভাড়া করল এক সপ্তাহর জন্য। এই জামালপুর ঢাকা থেকে প্রায় দু শ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিন পশ্চিমে, খুলনার দিকে। এদিকে রাস্তা ঘাটের এবং ট্রাফিকের যে অবস্থা তাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। সেখানে থাকার জায়গার কি ব্যবস্থা হবে সে এখনও জানে না। গিয়ে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পথে একটা দোকানে থেমে সে মোবাইল ফোনের জন্য সিম কার্ড কিনে নিল। অচেনা জায়গা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে কোন একটা ঝুট ঝামেলা হওয়া অসম্ভব নয়। সে মিজানকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিল। - জামালপুর যাচ্ছি।

যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগল জামালপুর পৌঁছাতে। পথে ফেরী পার হতে হয়েছে। সে ঢাকার মানুষ। এই এলাকা একেবারেই চেনে না। রাস্তায় অসম্ভব

ভীড়ও ছিল। রাত নয়টার দিকে মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছাল, চারদিকে নজর বুলিয়েই বিপদ টের পেল সে। এখানে পাকা রাস্তা একটা আছে ঠিকই কিন্তু আর তেমন কোন উন্নয়নের কাজ হয়েছে বলে মনে হল না। কোথাও মোটেল বা হোটেল জাতীয় কিছুই চোখে পড়ল না। বাজারে গিয়ে কিছুক্ষন ঘোরাঘুরি করে কোন লাভ হল না। দোকান পাট যা আছে সব অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার। এই এলাকায় মানুষেরা বোধহয় সন্ধ্যা হলেই শুতে চলে যায়। আসার পথে একটা ছোট খাট শহর চোখে পড়েছিল। নামটা খেয়াল করে নি। প্রায় দশ কিলোমিটার পেছনে যেতে হবে। কি আর করা? ঘুরল। রাস্তার অবস্থা বেশী সুবিধার না। খাবলা খাবলা পিচ উঠে গেছে। গাড়ী লাফাতে লাফাতে চলছে। আধা ঘন্টা লাগল পৌঁছাতে। কিন্তু কপাল ভালো, সেখানে থাকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। দোতলা, আদ্যিকালের দালান, বাইরে থেকে যেমন রঙ চটা, ভেতরেও তেমনি খারাপ অবস্থা। কিন্তু তারপরও রাতে মাথা গোজার যে একটা জায়গা পাওয়া গেছে তাতেই ও খুশী। হোটেলের নাম 'হোটেল রাজা-রাণী'। মালিক নীচ তলাতেই এক দিকে কয়েকটা কামরা নিয়ে থাকে। মাঝবয়েসী, রহমতের চেয়ে কিছু ছোটই হবে। মাথায় চুল বলতে অল্প কয়েক গাছি। কিন্তু সেটাই বার বার হাত দিয়ে আঁচড়ায়। কামরা ভাড়া নেবার সময় রহমত জানতে চাইল, "গাড়ীটা চুরি হয়ে যাবে নাতো ভাই? বিপদে পড়ে যাব।"

হে হে করে হাসল লোকটা। "কিচ্ছু ভাব্বেন না। আমাদের এখানে দারোয়ান আছে। ক'মাস ধরে খুব চুরি চামারী হচ্ছে। আমরা কয় ব্যবসায়ী মিলে রাতে একজন দারোয়ান রেখেছি। সে সারারাত এই রাস্তায় হাঁটা চলা করে। তাকে বলে দিচ্ছি। গাড়িতে কেউ হাত দেবে না। সে খুব ষণ্ডা পান্ডা লোক। পুলিশের সাথেও লাইন ঘাট আছে। সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি তার হাতে একশ' টা টাকা গুজে দিন। স্মরণ শক্তিটা ভালো হবে।" আরেক পশলা হাসি।

দারোয়ানকে ডাকা হল। তার নাম দিদার। তার হাতে দুইশ' টাকা ধরিয়ে দিল রহমত। "দিদার, আমি এখানে তিন চার দিন থাকব। যাবার আগে ভালো বখশিশ পাবে।"

দিদার গাট্টা গোট্টা মানুষ, পচিশ ত্রিশের বেশী হবে না বয়েস। এক গাল হাসি দিল। "স্যার, কোন চিন্তা করবেন না।"

রহমত তাকে তার মোবাইলের নাম্বার দিল। "কোন রকম সমস্যা হলে আমার মোবাইলে একটা কল দেবে। গাড়ির কিছু হলে অনেক ফ্যাকড়া হবে।"

সে নিজেও দিদারের মোবাইল নাম্বার নিল। হোটেল মালিকের নামটাও জানা গেল। অবিনেশ মুখার্জি। দিদারকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে অবিনেশকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই জামালপুরের নাম তো নিশ্চয় শুনেছেন?"

অবিনেশ হাসল। "কেন শুনব না। এই তো দশ বারো কিলোমিটার হবে এখান থেকে। আমার অবশ্য খুব একটা যাওয়া হয় না। জামালপুরের কথা কেন জিজ্ঞস করছেন বলেন তো?"

"জলিল মাতবরের ছেলে আসলাম আলীর সাথে একটু দেখা করার দরকার। ওদেরকে চেনেন?"
"কেন চিনব না? কিন্তু জলিল মাতবরের বাড়ী তো আমিরগঞ্জে, জামালপুরের দু গ্রাম পরেই। তারা তো ওদিকের বিরাট বড় জমিদার। জলিল ভাই অবশ্য অনেক দিন ধরেই অসুস্থ, চলা ফেরা করতে পারেন না। আসলামই সব দেখাশোনা করে এখন। ভালো মানুষ। তার সাথে কি দরকার আপনার?"
"একটু পারিবারিক ব্যাপার। কাল সকালে উঠেই রওনা দেব। আমাকে একটু পথটা ভালো করে বলে দিলে সুবিধা হত।"
সশব্দে হাসল অবিনেশ। "পথ নিয়ে ভাববেন না। জামালপুর বাজারে গিয়ে যে কাউকে জিজ্ঞস করলেই বলে দেবে। জলিল মাতবরকে চেনে না এমন কেউ নেই ওদিকে। তা, কাল আবার ফিরবেন তো, নাকি?"
রহমত তাকে আশ্বস্ত করল। "আপনার হোটেলের কামরা আমি পুরো চারদিনের জন্য নিচ্ছি। ওখানে থাকার কোন ইচ্ছা নেই।"
"ফিরতে দিলে হয়। তারা যে অতিথিপরায়ণ! তা, চারদিনের ভাড়াটা আগাম দিলে ভালো হয়। বোঝেনই তো?"
রহমত তাকে পুরো চারদিনের ভাড়া মিটিয়ে দিল। "আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি। জামালপুরের মতি আলীকে চিনতেন?"
একটু ভাবল অবিনেশ। "মাছের ব্যবসা করত এক মতি আলী। তার কথাই বলছেন কিনা...? কিন্তু সে এবং তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল। শুনেছি বিষ খেয়ে। ওদিকে গিয়ে এসব কথা না তুললেই ভালো। সবাই ভালো ভাবে নেয় না। মনে করে অলুক্ষনে। গ্রামের মানুষজন তো। অল্প বেশী কুসংস্কারতো আছেই।"

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলায় নিজের কামরায় চলে এল রহমত। ছোট্ট কামরা, কোন রকমে একটা ডাবল বেড এবং একটা ডেস্ক ঢোকানো গেছে। কাপড় পালটে বিছানায় যাবার আগে মিজানকে একটা টেক্সট পাঠাল। - *কাল সকালে আসলাম আলীর সাথে দেখা করতে যাব। আমিরগঞ্জে। ভয় ভয় লাগছে।*

মিজান বন্ধুর টেক্সট পেল অফিসে। বেচারা এতো কষ্ট করে এতো দূর গেছে, কিন্তু কোন লাভ হবে কিনা সন্দেহ। বন্ধুর নিরাপত্তা নিয়েই বরং সে বেশী উদবিগ্ন। সে পালটা টেক্সট করল, 'সাবধানে থাকিস। নতুন কিছু জানলে ফোন দিস'।
গত তিন দিনে তার বাসায় সৌভাগ্যবশতঃ কোন অনভিপ্রেত কিছু ঘটে নি। জুলেখা মালেক এবং জিনিয়ার আগমন উপলক্ষ্যে বাসা সাজিয়ে চলেছে, কি খাওয়াবে তার পরিকল্পনা চলছে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোন খবর আসে নি। কিন্তু জুলেখাকে কিছু বলে নি সে।

মিজান ইতিমধ্যে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সন্ধান পেয়েছে। ডক্টর এলান স্মিথ জুনিয়র তার অফিসের খুব ঘনিষ্ট এক সহকর্মীর বড় ভাই। ভারতীয় খৃষ্টান। ভালো হিন্দী বলে,

কিছু বাংলাও বলে। ছোটবেলায় নাকি কলকাতায় কয়েক বছর ছিল। তার বেশ নাম ডাক। এক সন্ধ্যায় সে তার সহকর্মীকে নিয়ে এলানের বাসায় তার সাথে দেখা করতে গেল। সহকর্মীকে নিজের স্ত্রীর কথা সব খুলে বলে নি মিজান। বলেছে সে ডিপ্রেসড। একজন সাইকিট্রিস্টের সাথে দেখা করলে হয়ত উপকার হবে।
রিচমন্ড হিলে এলানের বিশাল বাড়ী। দামী গাড়ী। বোঝাই যায় ভদ্রলোকের প্রাকটিস ভালই চলছে। ছোট ভাইকে বিয়ার ধরিয়ে দিয়ে মিজানকে নিয়ে তার স্টাডিতে চলে এলো এলান। মিজানকে আশ্বস্ত করল, তাদের মধ্যে যা আলাপ হবে সব গোপনীয় থাকবে। মিজান অকপটে সব বলতে পারে। চিন্তার কোন কারণ নেই। মিজান তাকে জুলেখার কর্মকান্ডের কথা খুলে বলল কিন্তু জ্বীন সংক্রান্ত কিছু বলল না। এলান হয়ত তাকে পাগল ভেবে বসবে। তাকে সমস্যাটা জানানো হয়েছে, সমাধান সেই বের করুক। বিস্তারিত শোনার পর এলানকে বিশেষ রকম কৌতূহলী মনে হল। "তোমার স্ত্রীর সাথে আমার দেখা করা দরকার। তাকে আমার অফিসে কবে আনতে পারবে?"
মিজান জুলেখাকে ডাক্তারের অফিসে নিয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করল। জুলেখা যদি কোন ভাবে বুঝতে পারে তাকে মাথার ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছে, তার কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে জানাটা দুঃসাধ্য। কিন্তু মিজান কোন ঝুঁকি নিতে চায় না।

এলানকে তার আশংকার কথা জানাতে সে একটু ভেবে বলল, "এক কাজ করা যাক। তোমরা দু' জনে কাল সন্ধ্যায় আমার বাসায় চলে এসো। তোমাদের নেমন্তন্ন। আমার স্ত্রী তার কম্পানীর কাজে ব্রাজিল গেছে। সুতরাং হোস্ট আমি একাই। ডিনারের পর কোন একটা অজুহাতে তুমি ঘন্টা খানেকের জন্য বাইরে চলে যেও। আমি তোমার স্ত্রীর সাথে এই সুযোগে আলাপ শুরু করব। সে কিছুই বুঝতে পারবে না।"

মোক্ষম প্ল্যান। মিজান রাজী হয়ে গেল। বিদায় নেবার আগে সে বিশেষ করে জানতে চাইল, "তুমি নিশ্চিত কোন সমস্যা হবে না? চাঁদনীর কিন্তু অসম্ভব রাগ!"
এলান লম্বা চওড়া মানুষ, পঞ্চাশের মত বয়েস হলেও সে খুব ফিট। সে দৃঢ়তার সাথে মাথা নাড়ল। "ভেব না। আমার সাজেশন একবার কাজ শুরু করলে, চাঁদনী ঠান্ডা হয়ে যাবে।"
"আর যদি কাজ না করে?"
"আমার চিকিৎসা আজ পর্যন্ত ব্যার্থ হয় নি।" তাকে নিশ্চিত করেছে এলান।

পরদিন এক বন্ধুর বাসায় তাদের নিমন্ত্রণ আছে শুনে কয়েক মুহূর্ত নীরবে মিজানের দিকে তাকিয়ে থাকল জুলেখা। "নিশ্চয় যাব। আপনার কেমন বন্ধু?"
"আমার সহকর্মী," মিথ্যে বলারই সিদ্ধান্ত নিল মিজান। "ভারতীয়। চমৎকার মানুষ। ওর স্ত্রী থাকবে না কিন্তু সে দারুণ রান্না করে। স্ত্রী এক অফিসের বড় কর্মকর্তা। ট্রিপে গেছে।"
তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল জুলেখা। কিছু বলল না। নিজের কাজে চলে গেল। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও বাইরে সেটা বুঝতে দিল না মিজান। কে জানে, হয়ত এলানই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

পরদিন জামালপুর বাজারে যখন পৌঁছাল রহমত তখন সকাল দশটা বাজে। বাজারে ভীড় তেমন নয়। একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে আসলাম আলীর কথা বলতেই তার বাড়ী যাবার পথ দেখিয়ে দিল তরুণ দোকানী। আসলাম আলী নাকি তার দোকানে মাত্র কয়েক দিন আগেই এসেছিল। পাঞ্জাবী কিনতে। ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার নির্দেশনা অনুযায়ী মাটির রাস্তায় গাড়ী নামাল রহমত। রাস্তা মাটির হলেও মোটামুটি সমতল। চলতে হচ্ছে অবশ্য খুব আস্তে। এদিকে আজকাল কিছু ধণী জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের নিজস্ব গাড়ী আছে, ফলে এই রাস্তায় গাড়ী চলা দেখতে সবাই অভ্যস্ত মনে হল। কেউ দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল না। তবে গ্রামের মানুষ এমনিতেই একটু কৌতূহলী। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে না তা নয়। হয়ত বোঝার চেষ্টা করছে, কোন বাড়ীতে যাচ্ছে। বাজার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার যাবার পর দোকানীর কথা মত রাস্তার নিকটেই লাল ইটের একটা বড়সড় দালান দেখা গেল, উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গাড়ী নিয়ে গেটের সামনে চলে এলো রহমত। দারোয়ান আছে। আসলাম আলীর সাথে দেখা করতে এসেছে শুনে দহলিজ ঘরে বসতে বলে আসলামকে ডাকতে গেল সে। গাড়ীওয়ালা অতিথি নিশ্চয় খুব সচারাচর আসে না, কারণ আসলাম দারোয়ানের সাথেই চলে এলো। রহমতকে দেখে অবাক হল। 'আপনাকে তো চিনলাম না!"
বিনয়ের অবতার বনে গেল রহমত। এই লোকটির মুখ থেকে কথা বের করাটা খুব জরুরী। সে সালাম দিয়ে হাত মেলাল। আসলাম বয়েসে পয়ত্রিশের বেশী হবে না। শিক্ষিত, রুচিশীল। কলেজের লেকচারার, কথাবার্তায় সংযত ভাব আছে। "ভাইয়া, আমার নাম রহমত। অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। সুদূর কানাডা থেকে। আপনার সাথে একটু নিভৃতে আলাপ করতে চাই।"
কানাডা শুনেই একটু কৌতূহলী মনে হল আসলামকে। "কি নিয়ে বলেন তো?"
রহমত তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "জুলেখা।"
লোকটা খুব আশ্চর্য হয়েছে মনে হল না। তাকে নিয়ে দোতলা বাড়ির নীচতলার একটা ছোটখাট কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। একটা টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কাঁচের পাল্লা লাগানো কাঠের আলমারির মধ্যে অনেক বই পত্র। বোঝা গেল এখানে মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রী পড়ায় আসলাম। রহমতকে বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসল সে। "আমি শুনেছি জোহরা বিয়ে করে কানাডা গেছে। টরন্টোতে। আপনিই কি তার স্বামী?"

"না। না। আমার বন্ধু মিজান তার স্বামী। আমি তার হয়ে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।"
"বলেন। শুনছি।"
রহমত বুঝল আসলাম জুলেখার ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী কিন্তু নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চায় না। তাকে যথাযথ প্রশ্ন করে তথ্য বের করতে হবে।
"আমরা জেনেছি আপনার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়েটা ভেঙে যায়। বলতে পারেন, সেই ব্যাপারেই একটু বিস্তারিত জানতে এসেছি।

কারণটাও একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। জুলেখা ভাবীকে মাস খানেক হল কানাডায় নিয়ে গেছে আমার বন্ধু । কয়েক দিনের মধ্যেই সে লক্ষ্য করেছে ভাবীর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। সে এই ব্যাপারে অসম্ভব দুশ্চিন্তায় ভুগছে। আমরা ভাবীর যথাযথ চিকিৎসা করাতে চাই, কিন্তু সব তথ্য জানা না থাকলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আপনার সাহায্যের আমাদের খুব প্রয়োজন।"

আসলাম মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল। "আমার খবর আপনাদেরকে কে দিল?"

"দৌলত মিয়া। উনি জুলেখা ভাবীর দুঃসম্পর্কের আত্মীয় হন"।

"আচ্ছা, দৌলত চাচার সাথে আপনাদের আলাপ হয়েছে? ওনারা তো দীর্ঘদিন ধরে কানাডা আছেন। আমার আর জুলেখার বিয়ের সময় ওনার সাথে দেখা হয়েছিল। উনি ঘটনাচক্রে সেই সময় দেশে এসেছিলেন।" খানিকটা আপন মনে কথা বলছে আসলাম। রহমত কোন বিঘ্ন ঘটাতে চায় না। সে নীরবে মাথা দোলাল।

আসলাম ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে বাইরে গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

"জুলেখাকে আমি এখনও অনেক ভালোবাসি। ওকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, সেই দিনই বাসায় ফিরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। ওদিকে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ওকে। রুপবতী মেয়ে তো অনেক আছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত আকর্ষণ কারো প্রতি কখন অনুভব করি নি। মনে হয়েছিল এই মেয়েটির সাথে আমি জন্ম জন্মান্তর কাটাতে পারব।

"বিয়েটা ধুমধাম করেই হয়েছিল। জুলেখার বাবা মা প্রস্তাব পাবার সাথে সাথেই রাজী হয়েছিলেন। আমরা মেয়ের সাথে কথা বলবার কোন কারণ দেখি নি। আমি তখন সপ্তম আসমানে। আমার মনের মানসীকে পেয়েছি। কত কি পরিকল্পনা ছিল। বউকে নিয়ে হানিমুন করতে সিঙ্গাপুর যাব। তাজমহল দেখতে যাব। আরও কত কি! এতো উত্তেজনায় জুলেখা সম্বন্ধে কোন কিছু জানার চেষ্টা করি নি। কেউ কিছু বলেও নি।

"বিয়ের পর বাসর রাতেই প্রথম বুঝলাম কতবড় ভুল করেছি। বিছানা ভর্তি ফুলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিল। ঘোমটায় মুখ ঢাকা। দরজা লাগিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। নাম ধরে ডাকলাম। মাথা তুলল না। ভাবলাম লজ্জা পাচ্ছে। আদর করে ঘোমটা সরিয়ে দিলাম। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল জুলেখা।"

চোখ বন্ধ করে সেই দৃশ্যটা যেন মানশ্চক্ষে দেখার চেষ্টা করল আসলাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। "এমন ঠান্ডা, কঠিন মুখ আমি আর কখন দেখি নি। তার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল, '*ছুবি না আমাকে। জানে মেরে দেব*'। ছিটকে পেছনে সরে গেলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি এমন কিছু হতে পারে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখলাম। বললাম, 'কি হয়েছে জুলেখা? খারাপ লাগছে?' সে ভ্যাংচাল আমাকে। '*জুলেখা? আমি জুলেখা না। আমি চাঁদনী। কি ভেবেছিস, আমি তোর বৌ হব? তোর বাড়ী, ধানের গোলা সব পুড়িয়ে দেব। তোর ফসলের মাঠে বিষ দেব। তোর গুষ্টির সবাইকে শেষ করব*'।

"আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে যাই। কি ভেবেছিলাম আর কি হল। কিন্তু বাইরে আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনেরা। বিয়ের বাড়ীতে কেউ কি আর ঝট

করে ঘুমাতে যায়? এইসব জানাজানি হলে কি আর দশ গ্রামে মুখ দেখান যাবে? আমি জুলেখাকে বললাম, 'তোমার বাবা মা যদি তোমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমিও এই বিয়ে মানব না। কিন্তু কয়েকটা দিন একটু মানিয়ে চলতে হবে। বাসার অতিথিরা সবাই চলে গেলে আমরা শান্তিতে একটা সমাধান করে ফেলব'। যে কারনেই হোক জুলেখা আমার কথা মেনে নিল। চাঁদনীর ব্যাপারটা আমার মাথায় তখনও ঠিক ঢোকে নি। কেন সে নিজেকে চাঁদনী বলবে আমি বুঝি নি। ধরে নিয়েছিলাম হয়ত সেটা জুলেখার ডাক নাম হবে। অনেকেরই থাকে"।

রহমত নিবিষ্ট মনে শুনছিল। আসলাম ক্ষনিকে জন্য থামতেই সে কৌতূহলী কণ্ঠে বলল, "তারপর কি হল?"

"দুই দিন সে ঘর থেকে বের হল না। কারো সামনে গেল না। আমি সবাইকে বললাম, তার মনটা ভালো নেই। চিন্তার কোন কারণ নেই। কুটুমদের সবাইকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। বাড়ী ফাঁকা হতে বাবা-মাকে বললাম, জুলেখার এই বিয়েতে মত ছিল না। তারা আগের দিনের মানুষ। গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু আমার পক্ষে একটা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে সংসার করা সম্ভব নয়। আমি জুলেখার বাবা-মাকে ডেকে পাঠালাম। তারা এলেন না। বললেন, জুলেখার কথায় কান না দিতে। সে একটু খামখেয়ালি। বিয়ে নাকি তার মত নিয়েই হয়েছে। তাদের কথা বিশ্বাস না করার আমার কোন কারণ ছিল না। এবং সেটাই ভুল হয়েছিল।"

রহমত ফিসফিসিয়ে বলল, "কি করল জুলেখা?"

মাথা নাড়ল আসলাম। "জুলেখা নয়। চাঁদনী। পরে সবাই আমাকে বলেছে, সে জ্বীন। ছোটবেলা থেকেই জুলেখার শরীরে সে আছর করে আছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবার ক্ষমতা জুলেখার ছিল না। চাঁদনীর কথা আপনারা জানেন?"

"জানি। সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা। তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। কোন ভয় ভীতি নেই। মনে হয় যেন মানুষের মনের কথা পড়তে পারে। মিজান জীবন হাতে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।"

"তার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি," আসলাম বলল। "তিন দিন পরে জুলেখাকে যখন জানালাম তার বাবা আমাকে কি বলেছেন, তখনই আসল সমস্যা শুরু হল। এই বাড়ীতে সে আমার সাথে আটকা পড়ে যাবে, এই সম্ভাবনায় সে ভয়ানক ক্ষেপে গেল। আমাকে বলল, তাকে তার বাবার বাড়ীতে রেখে আসতে। ওর বাবা বললেন, জুলেখার বাড়ী এখন তার শ্বশুর বাড়ী। সেখানেই সে থাকবে। আমি পড়লাম বিপদে। ওর বাবা-মা যদি না চান, তাহলে আমি কি করে সেখানে পাঠাই? চতুর্থ দিন রাতে আমাদের ঘরে দরজা বন্ধ করে তাকে সমস্যাটা খুলে বললাম। তারপর যা হল সেটা ভাবলে আমার শরীর এখনও শির শির করে ওঠে। চাঁদনী আমাকে এতো জোরে ধাক্কা দিল যে আমি ছিটকে দেয়ালে আছড়ে পড়লাম। এগিয়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে তুলে দরজার দিকে ছুড়ে দিল। হিস হিস করে বলল, '*কেন বিয়ে করেছিলি আমাকে? এবার মরবি তুই*'। আমি দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। জুলেখার বাবাকে ফোন

করে পেলাম না। তার বাড়ীতে চলে গেলাম পরদিন। তিনি স্বীকারই করলেন না যে তার মেয়ের কোন সমস্যা আছে। আশে পাশের মানুষের সাথে কথা বলতে জানলাম, ঐ জ্বীন তার শরীরে অনেক দিন ধরেই আছর করেছে। খবর নিলেই জানতে পারতাম।
"জুলেখা তার কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকল পরদিন। আমি আমার বাবা-মাকে সব খুলে বললাম। তারা সাথে সাথে ওঝা ডাকার প্রস্তাব দিলেন। জ্বীনের ওঝাদের কান্ড কারখানা আমি দেখেছি। অমানবীয়ভাবে মার ধোর করে। ভেতরে যেই থাক, শরীরটা তো জুলেখার। আমার মন সায় দিল না। ভাবলাম আরোও দু' একদিন দেখি। অনেকে বলে জ্বীন বেগতিক দেখলে অনেক সময় নিজের থেকেই চলে যায়। আশায় বুক বাঁধলাম। ওর পাশের একটা ঘরে রাত জেগে কাটাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ভয় ছিল বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় কিনা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিও না। মাঝরাতে হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি দোতলার বারান্দায় আমার মাকে দুই হাতে শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদনী। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, '*দেব নীচে ফেলে? মাকে চাস? যদি চাস তাহলে আমাকে কালই বাড়ী পাঠাবি। বল পাঠাবি!*' বাবা ছুটে এসে তার কাছ থেকে মাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। এক হাতে একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে বিশ ফুট দূরে ছুড়ে দিল। বাবা কোমরে খুব ব্যাথা পেয়ে মেঝেতে শুয়ে ককাতে লাগলেন। বাড়ীতে কাজের লোক ছিল দু' জন, দারোয়ান ছিল একজন। তারা ছুটে এল। সিঁড়ি বেয়ে উপরেও উঠতে পারে নি। তার আগেই বুক চেপে ধরে মাটিতে আছড়াতে লাগল। বুঝলাম এ সাক্ষাৎ শয়তান। পরদিন সকালেই তাকে তিন তালাক দিয়ে তার বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম।"
আসলাম থামল। রহমত বলল, "তারপর আর জুলেখা ভাবীর সাথে আপনার দেখা হয়েছে?"

মাথা নাড়ল আসলাম। "প্রশ্নই আসে না। তবে জুলেখার জন্য আমার খারাপ লাগে। একটা শয়তান জ্বীনের কারণে তার সমস্ত জীবনটা একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে। ওর জন্য আমার দূর্বলতা অনেক দিন ছিল। কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে করে আবার সংসার পাতি। ছেলেমেয়ে হয়েছে। নতুন বউ সবই জানে। এসব নিয়ে আমি একবারেই আলাপ করি না। কি দরকার?"

আসলাম দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। তার জন্য আবার মুর্গী জবাই করে, পুকুর থেকে মাছ তুলে প্রচুর রান্না বান্না করা হল। সময় নষ্ট হল কিন্তু তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল না রহমত। অতিথিপরায়ণ মানুষ এরা, বাঁধা দিলে অসম্মান করা হয়।
আসলামের বাড়ী থেকে বের হতে হতে বিকেল হল। আসলাম নিজেই তাকে বুদ্ধি দিল জুলেখার বাবার বাড়ীতে গিয়ে একবার ঢু মারতে। সেই বাড়ীতে এখন জুলেখাদের কেউ থাকে না, কিন্তু তারপরও কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। জুলেখাদের আত্মীয়স্বজনেরা এখনও অনেকেই আশে পাশেই থাকে। তারা হয়ত রহমতকে নতুন

কোন তথ্য দিতে পারে। আসলাম নিজে কৌতূহলী হলেও এসবের মধ্যে আর জড়িয়ে পড়তে চায় না। তার নতুন বৌ ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখবে না।

পনের

রহমত হিসাব করে দেখল সূর্য ডুবতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকী আছে। জামালপুরে জুলেখাদের বাড়ী যাবে কিনা ভাবছে সে। পরিত্যাক্ত বাড়ীতে গিয়ে অন্ধকারে আটকে পড়তে চায় না। পথ ঘাট চেনে না। এমনিতেই মনে মনে সে যথেষ্ট ভয়ে আছে। জ্বীন-পরীতে তার বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক, সে কোন ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয়। জুলেখার আগে সে কখন এই ধরণের কেস দেখেনি। কোন সম্ভাবনাই সে অবহেলা করতে চায় না। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গিয়েই বা কি করবে? শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক করল। অন্তত পক্ষে জায়গাটা দেখে যাবে। পরদিন আর খুঁজতে হবে না। জামালপুর বাজার থেকে উত্তরে দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা জংলী জায়গা নজরে পড়ল। বড় বড় আম গাছ এবং অন্যান্য কিছু স্থানীয় গাছে ভেতরের ইটের বাড়ীটা প্রায় নজরেই পড়ে না। একটা মাটির রাস্তা ভাঙ্গা লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে গেছে, লম্বা ঘাসে ছেয়ে গেছে চারদিক। রাস্তাটা পেরিয়ে যাবার পর লাল ইটের বাড়ীটা লক্ষ্য করল রহমত। গাড়ী ব্যাক করল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল শুধু ফসলের মাঠ। আশে পাশে অন্য কোন বাড়ী নেই। কোন মানুষ জনও দেখল না। কি সমস্যা! এমন নির্জন একটা পরিত্যাক্ত বাড়ীতে একা একা যাওয়াটা ঠিক হবে? ভৌতিক অস্তিত্ব যদি নাও থাকে, অনেক সময় এই জাতীয় স্থান অপরাধীদের আস্তানা হয়ে পড়ে। গাড়ী থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে মনে হল না কেউ সেখানে যায়। কোথাও কোন পায়ে চলার পথ দেখা গেল না। কি করবে ভাবছে রহমত। তার এখানে আসার প্রধান উদ্দ্যেশ্য ছিল মানুষ জনের সাথে আলাপ করা। বাড়ীর ভেতরে গিয়ে কি লাভ? পুরানো বাড়ী, ইট-পাথর খসে পড়ে ব্যাথা পাবারও সম্ভাবনা আছে। তারপরও এতদূর এসে একবারে কিছু না করে ফিরে যেতেও মন চাইল না। গুটি গুটি পায়ে ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ীটার সামনের চত্বরে উঠে এলো সে। বুকের মধ্যে ধুক পুক করছে। কাউকে সাথে নিয়ে এলে ভালো হত। সাহস পাওয়া যেত। সদর দরজায় আস্তে ধাক্কা দিতে শব্দ করে খুলে গেল সেটা। চমকে এক পা পিছিয়ে এসেছিল রহমত। আপনমনে হাসল। এতো ভয় পাবার কি হয়েছে? পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল। যা ভেবেছিল তার চেয়ে পরিষ্কার ভেতরে। ধুলার আস্তরণ চারদিকে কিন্তু আবর্জনা নেই। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। আরেকটা দরজা দিয়ে পেছনের আঙিনায় চলে এলো। চমৎকার দৃশ্য। সামনেই বিশাল এক দিঘী। বাঁধানো ঘাট। পুকুরের চারদিক ঘিরে সারি বেঁধে আরও অনেকগুলো আম গাছ। নানান আকারের। শেষ বেলার আলোতে পানিটা খুব সুন্দর লাগছে। ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল

রহমত, খেয়াল করল না মাত্র ফুট পঞ্চাশেক দূরে, বাড়ীটার অন্য প্রান্তের একটা লাগোয়া বারান্দায় দু' জন গ্রাম্য মহিলা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।
ঘাটের বাঁধান চত্বরে মাত্র পা রেখেছিল রহমত, পেছনে গলা খাকারীর শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দু'জন লুঙ্গী পরা লোককে তার দিকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত চেয়ে থাকতে দেখে তার প্রায় হার্ট এটাক হবার জোগাড় হল। একটু দূরে মহিলা দু'জনাও মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। চার জোড়া চোখ তার দিকে তাক করে আছে, অচেনা, অজানা মানুষ, একটা পরিত্যাক্ত ভৌতিক বাড়ীতে – রহমতের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কি করবে সে? কি বলবে? এরাই বা কারা?

"কাকে চান?" একটা লোক প্রথম কথা বলল। তার বয়েস ত্রিশের বেশী হবে না। তার সাথীর বয়েস হয়ত আরো কিছু কম হবে।
তার মানবীয় কণ্ঠ শুনে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হল রহমত। গলার কাপুনী যতখানি সম্ভব লুকিয়ে বলল, "এটা কি জুলেখাদের বাড়ী?"
লোকটা কিছু বলার আগেই পেছন থেকে মহিলাদের একজন বলল, "জুলেখা তো এইখানে থাকে না। ফাঁকা বাড়ী। জুলেখা বিয়ে করে কানাডা চলে গেছে।"
রহমতের সাহস ফিরে এসেছে। তার মাথাও কাজ করছে। প্রথমে, এদের পরিচয় জানা দরকার। তারপর দেখতে হবে তারা কোন নতুন কিছু বলতে পারে কিনা। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল তারা জুলেখার দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। বাড়িটা ভুতের বাড়ী হয়ে যাচ্ছে দেখে এখানে এসে বাস করছে। দেখে শুনে রাখে। রহমত ধারনা করল এরা নিশ্চয় গরীব। সুযোগ পেয়ে একটু ভালো জায়গায় এসে থাকছে। মনে হয় পেছনের মাঠ দিয়ে যাতায়াত করে, ফলে সামনে কোন চলাচলের চিহ্ন নেই। বোঝা গেল, পরিত্যাক্ত হলেও সেখানে তাদের এভাবে বাস করাটা যে আইনসংগত না হতে পারে, সে ব্যাপারে তারা অবহিত এবং শঙ্কিত। রহমত তাদেরকে আশ্বস্ত করল। সে কিছু খবর চায়। তার আর কোন উদ্দ্যেশ্য নেই। নিজের সত্যিকারের পরিচয় দিল সে। তারা চারজনই এক বাক্যে স্বীকার করল, জুলেখার যখন বুড়া লোকটার সাথে বিয়ে হল, তখনই তারা জানত একটা সমস্যা হবে। জেনেশুনে জ্বীনের আছর আছে এইরকম একটা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তার প্রথম বিয়ের সময়েও তারা জানত কিছু একটা ঝামেলা হবে। এক সপ্তাহও যায় নি, জুলেখাকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল। তারা অবশ্য নতুন কোন কিছু জানাতে পারল না, কিন্তু একটা উপকার করল। জুলেখার বাবার বাড়ীতে একজন বয়েসী মহিলা অনেক দিন কাজ করেছিল। বিধবা। কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। জুলেখার বাবা-মা মারা যাবার পর, জুলেখার সাথে সেও নানীর কাছে গিয়ে থাকত। সে আজও বেঁচে আছে এবং হয়ত রহমতকে নতুন কোন খবর দিতে পারবে। বুড়ীকে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে বিদায় নিল রহমত। এখানে আসাটা একেবারে ব্যার্থ হয় নি। কোথা থেকে কি তথ্য পাওয়া যাবে, কে বলতে পারে? বুড়ী হয়ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে। ইতিমধ্যেই সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। আজ আর গ্রামে ঘোরাঘুরি না করারই সিদ্ধান্ত নিল রহমত। পরদিন ফিরে এলেই হবে। বুড়ীকে খুঁজে বের করতে সমস্যা হবে কিনা সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

পরদিন সন্ধ্যায় মিজান যখন জুলেখাকে নিয়ে এলানের বাসায় পৌঁছাল, এলান তাদের জন্য ডিনার টেবিলে পরিবেশন করে প্রস্তুত হয়েই ছিল। পরিচয় পর্ব সারা হতে সে তাদেরকে সরাসরি খেতে আমন্ত্রণ জানাল। এলানকে দেখেই বোঝা গেল সে জুলেখার সাথে তার সেশন শুরু করবার জন্য অধীর হয়ে আছে। এই জাতীয় কেস খুব সম্ভবত এটাই তার প্রথম। তার কাছে ব্যাপারটা একাধারে অভিনব এবং রোমাঞ্চকর।

এলান স্যালমন ফিস বেক করেছিল, সাথে আলুর ভর্তা এবং সালাদ। মিজানের সাথে ইংরেজীতে কথা বললেও জুলেখার সাথে সে হিন্দী এবং তার ভাঙ্গা বাংলায় চালিয়ে যায়। জুলেখা মনে হল তার কথাবার্তায় বিশেষ রকম মজা পাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে তার বাংলা শুধরে পর্যন্ত দিচ্ছে। মিজান এদেশীয় খাবার পছন্দ করে। বিশেষ করে স্যালমন মাছ। সে মনে মনে দুশ্চিন্তায় থাকলেও খেতে কার্পন্য করল না। জুলেখা অবশ্য সালাদ ছাড়া কিছুই মুখে তুলল না। এলান তাকে জোরাজুরি করলেও তাতে কোন কাজ হল না। জুলেখা হাসি মুখে মাথা দোলাল। সে অন্য কিছু খাবে না।

ডিনার শেষে লিভিংরুমে ফিরে এসে বসল ওরা তিনজন। এলান নিজে মদ্যপান করলেও জেনেছে মিজান কিংবা জুলেখা করে না। সুতরাং তাদেরকে সে সোডা দিল। নিজে আধা গ্লাশ রেড ওয়াইন নিল। "স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমি খুব একটা খাই না। ডিনারের পর অল্প স্বল্প। তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?"

মিজান মাথা নাড়ল। তাদের কোন আপত্তি নেই। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে। এই পর্যায়ে কোন একটা অজুহাতে তার বাইরে যাবার কথা। নাকি আরেকটু পরে? জুলেখা কি কিছু সন্দেহ করে বসবে? এলানের দিকে তাকিয়ে একটা সংকেত পাবার অপেক্ষা করছে সে।

একটা সোফায় স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসেছে ওরা। মুখোমুখি একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসল এলান, হাতের গ্লাশটাকে একটা ছোট কাঁচের টেবিলে রাখল। "জুলেখা, একটা প্রশ্ন করি আপনাকে?"

প্রথমে মিসেস মিজান বলে শুরু করেছিল এলান, কিন্তু মিজানই তাকে অনুরোধ করেছে নাম ধরে ডাকতে। জুলেখা তাতে মাথা দুলিয়ে তার সম্মতি জানিয়েছিল।

এলানের অনুরোধে মুচকি হেসে মাথা দোলায় জুলেখা।

"কানাডার কোন জিনিষটা এখন পর্যন্ত আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে?" সহজ কণ্ঠে জানতে চায় এলান।

জুলেখাকে দেখে মনে হল এলানের বড় ভাই সুলভ সহজ আচরণ তার ভালো লাগছে। রহমতের সাথেও সে এখনো এতো সহজ হতে পারে নি। মিজানকে স্বীকার করতে হল, এলান জানে কিভাবে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে বন্ধুত্ববাতসল্য দিয়ে জয় করে ফেলা সম্ভব।

"সব কিছু," দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল জুলেখা। "আমাদের বাড়ী, পেছনের জঙ্গল, হরিণ। কাঠবিড়ালী – সব কিছু।"

হাসল এলান। "আপনার স্বামীর খুব চমৎকার একটা বাড়ী আছে। এখানে সবার বাড়ীতে এমন জঙ্গল আর হরিণ নেই। দেখেন, আমার বাড়ীর চারদিকে শুধু বাড়ী আর বাড়ী।"
"কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি অনেক বড়লোক। কি করেন আপনি?"
এলান বোধহয় এমন সরাসরি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আমতা আমতা করে বলল, "আমার একটা ওষুধের কম্পানি আছে। আচ্ছা, মিজান কি আপনাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছে? আমাদের এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। মিজান, তোমার স্ত্রীকে ব্লু মাউন্টাইনে নেয়ে গেছ?"

মিজান মাথা নাড়ল। "গরমের সময় নিয়ে যাব।"
তার দিকে তাকিয়ে হাসল এলান। একটু লম্বা সময় নিয়ে। মিজানের মনে হল, এটাই নিশ্চয় সেই সংকেত। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। "জুলেখা, খুব কাছেই আমার এক বন্ধু থাকে। আমি একটু ওর সাথে গিয়ে দেখা করে আসি। বড় জোর পনের বিশ মিনিট। তুমি ততক্ষন এলানের সাথে একটু কথা বল। ঠিক আছে?"
এলান মিজানকে অবাক করে দিয়ে বলল, "তোমার যাবার দরকার কি? তাকেই ফোন করে এখানে আসতে বল।"
মিজান কিছু বলার আগেই জুলেখা হাসি মুখে বলল, "না, না, উনি যাক। বেশী দেরী করবেন না।"
মিজান কথা দিল সে যাবে আর আসবে। মনে মনে প্রমাদ গুনল। সে ভেবেছিল জুলেখা তাকে যেতে দিতে চাইবে না। তার মনের মধ্যে কি চলছে কে জানে? সে গাড়ী নিয়ে শ' খানেক গজ গিয়ে রাস্তার পাশে পার্ক করল। প্রয়োজন হলে যেন ঝট করে ফিরে যেতে পারে। এলানের জন্য ভয় হচ্ছে। তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হয় নি সে এই সাক্ষাতের পুরো ঝুঁকিটা বুঝতে পেরেছে। এলান বিপদে পড়লে সে গিয়েও যে কি করবে জানে না মিজান, কিন্তু তার একটা বিশ্বাস আছে - জুলেখা, কিংবা চাঁদনী - তার কোন ক্ষতি করবে না।

মিজান চলে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত নীরব গেল। এলান মনে মনে ভাবছে ঠিক কিভাবে প্রসঙ্গটা তোলা যায়। তাকে খেয়াল রাখতে হবে জুলেখা যেন সন্দিহান না হয়ে ওঠে।

জুলেখা তার মুখোমুখি সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। তাকে দেখে খুব নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। এলানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এলান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার দুই ঠোঁটের ফাকে এক চিলতে হাসি।
"হাসির কিছু হয়েছে?" একটু অপ্রস্তুত হয়ে জানতে চাইল সে।
"দরজাটা কি খোলাই থাকবে?" জুলেখা সহজ গলায় বলল।
"আমাদের এখানটা বেশ নিরাপদ। চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব একটা নেই।"
"তবুও বন্ধ করে দিন।"
এই বিষয় নিয়ে অযথা বাক্য বিনিময় করতে চাইল না এলান। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে যখন ফিরে এল, জুলেখা তখন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লিভিংরুমের দেয়ালে

ঝোলান ফ্রেমে বাঁধান ছবি এবং এলানের ক্রেডিনশিয়ালগুলো মনযোগ দিয়ে দেখছে।

এলান থমকে গেল। ব্যাপারটা তার মাথায় একেবারেই আসে নি। তার পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল জুলেখা। "আপনি তাহলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট?"
লজ্জিত মুখে শ্রাগ করল এলান। "আপনার স্বামী আমার সত্যিকারের পরিচয় আপনাকে দিতে চাননি।"
"কেন?" জুলেখার দৃষ্টিতে সারল্য।
এলান একটু দ্বিধা করে বলল, "উনি আপনাকে অসম্ভব ভয় পান।"
ফিক করে হেসে ফেলল জুলেখা। "আমাকে কেন ভয় পাবেন? কি করেছি আমি?"
ধীর পায়ে হেঁটে নিজের আসনে ফিরে এল এলান। "দয়া করে একটু বসুন। মিজান চায় আমি আপনার সাথে একটু কথা বলি। লুকাবো না, ওনার ধারনা আপনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে। তার কথা শুনে মনে হয়েছে আপনি হয়ত মাল্টিপল পার্সোনালিটি রোগে ভুগছেন।"

জুলেখা এলানের অনুরোধ অবহেলা করে দাঁড়িয়েই থাকল। এলানের কথা শুনছে মনযোগ দিয়ে। এলান তাকে বসার জন্য চাপাচাপি করল না। "অনেক সময়, ছোটবেলায় কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে গেলে মানুষের ভেতরে একটা দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা আরো বেশী স্বত্তার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিকে সামলানোর জন্য। একটা সময় ছিল অনেকেই এইসবকে আজগুবী কথা বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সময় পাল্টিয়েছে। এই জাতীয় অসুখের চিকিৎসাও আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"
জুলেখা নিষ্পলক দৃষ্টিতে এলানের দিকে কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। "তাহলে আমার স্বামীর ধারনা আমি অসুস্থ?"
এলান এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে জানে, এই পর্যায়ে কথা বলার চেয়ে শোনাই ভালো। কোন এক পর্যায়ে জুলেখা নিশ্চয় নিজের থেকেই কথা বলতে শুরু করবে। অন্তত সেটাই সে আশা করছে। তাছাড়া এমন কিছু করতে বা বলতে সে চায় না যেন জুলেখা হঠাৎ করে রক্ষনাত্বক হয়ে ওঠে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করে বসে।
ধীর পায়ে হেঁটে এলানের কয়েক ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল জুলেখা। "আমার স্বামীতো নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন আমি কি করতে পারি। আপনার ভয় করছে না আমার সাথে এভাবে কথা বলতে?"
এলান শান্ত কণ্ঠে বলল, "আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে সাহায্য করা। আমি আপনার বন্ধু, শত্রু নই।"

জুলেখা মাথা দোলাল। "তাই বুঝি? কৌতুহল একটা অসম্ভব খারাপ জিনিষ। আমার স্বামী আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন?"
"আপনার অসম্ভব শক্তির কথা বলেছেন। আপনার অনেক রাগ এটাও বলেছেন। এবং ওনার ধারনা আপনি অন্যের মনের কথা পড়তে পারেন।"
"আর কিছু বলেন নি?"
"না। কিন্তু আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি শুনতে চাই। নিশ্চিত থাকুন, আমাকে যা বলবেন তার একটা শব্দও বাইরে প্রকাশ পাবে না। আমার পেশায় সেটাই নিয়ম।"

পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসল জুলেখা। "ঠিক আছে, আমি আপনার কৌতুহল কিছুটা হলেও মেটাব। এই মহাবিশ্বে কত কিই তো আছে। তার কত টুকু আমরা বুঝি? বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই আজও আমাদের জানা হয় নি। ধরে নিন, আমি তেমন একটি রহস্য। মাল্টিপল পার্সোনালিটি নয়, বলুন মাল্টিপল পার্সন। একই শরীরে দুটি অস্তিত্ব, প্রতিটি অস্তিত্বের ভিন্ন স্বত্তা। একজন জুলেখা, অন্যজন চাঁদনী।"

"চাঁদনী কে? কোথা থেকে এলো?" এলান খুব শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"জুলেখার যেমন রয়েছে মানবীয় অস্তিত্ব, চাঁদনীর তেমন রয়েছে এক ভিন্ন ধরণের অস্তিত্ব। খুব ছোটবেলায় আমাদের দু'জনের খুব ভাব হয়েছিল। আম বাগানে। জুলেখা আমাকে চেয়েছিল সার্বক্ষনিক বন্ধু হিসাবে। আমার আধি ভৌতিক শারীরিক অস্তিত্ব আমাকে কিছু অচিন্তনীয় ক্ষমতা দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষের শরীরের মাঝে আমি বাস করতে পারি।"

"আধি ভৌতিক অস্তিত্ব বলতে কি বোঝাচ্ছেন?"

"এটা বোঝানো কষ্ট। ধরে নিন আপনার মানবীয় দৃষ্টি শক্তির বাইরে এমন একটা কিছু যা আপনাদের পৃথিবীর সমান ভাগীদার।"

এলান তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মৃদু হাসল জুলেখা। "বিশ্বাস হচ্ছে না? নিদর্শন দেখতে চান?"

দ্বিধান্বিত ভঙ্গীতে মাথা দোলাল এলান। নিদর্শন বলতে জুলেখা কি বোঝাচ্ছে সে নিশ্চিত নয়।

নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুলেখা। "আমার স্বামী ভালো মানুষ। তাকে ব্যাথা দেয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি চাই না তিনি অন্যের কাছে তার স্ত্রী সম্বন্ধে খারাপ কথা বলুন। এটা কোন সংসারের জন্যই ভালো না। তাকে একটা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। আপনি একজন মাথার ডাক্তার। আপনার কৌতুহল মেটানোটাও দরকার।"

তারপরের ঘটনাটুকু এতো দ্রুত ঘটল যে এলান ঠিক ঠাহর করতে পারল না। জুলেখা বিদ্যুৎ গতিতে তার ঠিক সামনে চলে এলো। প্রচন্ড একটা থাপ্পড় পড়ল তার ডান গালে, সোফা থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল সে, দিক এবং সময় জ্ঞান লোপ পেল, মাথার মধ্যে যেন চরকী ঘুরছে, চোখে কিছুই দেখছে না। পর মুহূর্তে মনে হল তাকে যেন কেউ মাটি থেকে অবলীলায় তুলে নিল, একটা ঝাঁকি, শূন্যতা, তারপর যেন একটা ট্রাকের সাথে বাড়ি খেয়ে লটকে পটকে ছিটকে পড়ল সে। তার পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল।

জুলেখা এগিয়ে গিয়ে নিথর পড়ে থাকা দেহটার নাকের সামনে তার হাত মেলে ধরল। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। ঠোঁট টিপে হাসল। হেঁটে বাইরের দরজায় এসে তালা খুলে ড্রাইভয়েতে বেরিয়ে এল। সে যেন জানতই কোথায় মিজানকে পাওয়া যাবে। হেঁটে গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে জানালায় টোকা দিল। মিজানের খুব সম্ভবত ছোট খাট একটা হার্ট এটাক হল। হতবিহবল অবস্থায় দরজা খুলে জুলেখাকে ভেতরে ঢুকতে দিল। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে নির্বিকার কণ্ঠে বলল জুলেখা, "বাসায় চল।"

মিজান তার দিকে ভীতচকিত দৃষ্টীতে তাকিয়ে আছে দেখে যোগ করল, "চিন্তার কিছু নাই। উনি ভালো আছেন।"
একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে গাড়ী ছোটাল মিজান। জুলেখার জন্য সে খুন খারাবীর মামলায় পড়ে যায় কিনা, সেটাই তার প্রধান ভয়।

ষোল

পরদিন আবার জামালপুরে এসে হাজির হল রহমত। অবিনেশ একবার বলেছিল দিদারকে সাথে নিয়ে যেতে, সে নাকি দিনের বেলা শুয়ে বসেই কাটায়। সাথে গেলে হয়ত কোন উপকারে আসবে, রহমত তাকে কিছু টাকাপয়সা দিলে তার উপকারও হবে। রহমত একবার ভেবেছিল সাথে একজন সঙ্গী থাকলে মন্দ হয় না, বিশেষ করে এমন লম্বা - চওড়া ষণ্ডা দর্শন কেউ। কিন্তু, পরে একই কারণে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। এমন কাউকে নিয়ে যেখানেই যাবে মানুষজন সতর্ক হয়ে পড়বে। ভাববে তার কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের কাছ থেকে খোঁজ খবর পেতে চাইলে সবচেয়ে কার্যকর হচ্ছে তাদেরকে বুঝতে দেয়া যে নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। মানুষ ভয় পেলে কিংবা উদবেগে ভুগলে তারা সহজে মুখ খোলে না।
আসার পথে গাড়ীতে কানাডা থেকে মিজানের ফোন এসেছিল। যা শুনল তাতে রহমতের লোম খাড়িয়ে গেল। এলানের শরীরে বেশ কিছু হাড্ডি ভেঙেছে। এমার্জেন্সীতে ডাক্তাররা নাকি তার অবস্থা দেখে বুঝতেই পারে নি এমন দশা কি করে হতে পারে। কথা বলার মত অবস্থা এলানের ছিল না। তার তখনও জ্ঞান ফেরেনি। মিজান বাসায় ফিরে অজ্ঞাতনামা হিসাবে পুলিশে একটা খবর পাঠিয়েছিল। জুলেখার ভয় ছিল, কিন্তু এলানের জীবনের উপর কোন ঝুঁকি সে নিতে পারে না।
জুলেখার নানীর বাড়ীটা খুঁজে পেতে একটু সমস্যা হল। নানী থাকত চারদিকে নারকেল গাছে ঘেরা ছোট ছোট খান দুই মাটির ঘরে, উপরে পাতার ছাউনি। এক সময় তার বেশ কিছু জমি জমা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে নানা কারণে বিক্রী করতে করতে এই ভিটে বাড়ী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তার আঙ্গিনার এক পাশে বেশ কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। সেখানে আট-দশটা গরীব পরিবারের বাস। তাদের কোন জমি জিরেত নেই। নানী তাদেরকে থাকতে দিয়েছিল। তারা যতদিন চায় এখানে বসবাস করতে পারবে। এই তথ্য সে পেল সেখানকার এক বাসিন্দার কাছে। বুড়ী চোখে বিশেষ দেখে না কিন্তু জুলেখা এবং তার নানীর কথা তুলতে খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে লাগল। তার কাছ থেকেই জানা গেল জুলেখার বাবার বাড়ীর পুরানো কাজের মহিলা, যে নাকি জুলেখার দাই মা, নানীর ভিটে বাড়ীতেই থাকে। সে কয়েকটা গৃহস্থ বাড়ীতে কাজ করে। ফিরতে বিকেল হতে পারে। রহমত যদি চায় তাহলে নানীর বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে

পারে। বুড়ী তাকে পানি–টানি দিতে পারবে কিন্তু আর কিছু বাড়িতে নেই যে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবে। কাছের আরোও কতগুলো কুটির থেকে বেশ কয়েকটা ধুলি ধূসরিত বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারাই খুব উৎসাহ ভরে রহমতকে নানীর বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। অপেক্ষা করা ছাড়া রহমতের আর তেমন কিছুই করার নেই। দাই মার সাথে আলাপ করে যদি নতুন কিছু জানা যায়। এদিকে অকারনে ঘোরাফেরা করার কোন অর্থ হয় না। গ্রামের মানুষজন সন্দেহভাজন হয়ে উঠতে পারে।

ঘন্টা খানেকও যায় নি একটা রুক্ষদর্শন যুবক বড় বড় পায়ে হেঁটে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। "আপনি আমার সাথে আসেন।"
রহমত এই যুবকটিকে আগে কখনও দেখে নি। সে অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"
"দোকানে। সামনের মোড়ে। বাবর ভাই ডাকছে।" যুবকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল।
"বাবর ভাই কে?"
"বড় পার্টির নেতা। তাড়াতাড়ি আসেন, রাগ হয়ে গেলে সমস্যা। মাথার ঠিক থাকে না।"
রহমতের কাছে ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না কিন্তু তারপরও না যাওয়াটা আরোও ঝুঁকিপূর্ণ মনে হল। হয়ত তার গাড়ী দেখে কৌতূহলী হয়েছে। পরিচয় জানতে চায়। নেতা গোছের মানুষ হলে সাঙ্গ পাঙ্গ নিশ্চয় আছে। সে যুবকটাকে অনুসরণ করে হেঁটে প্রায় শ' দুই গজ দুরের একটা ইটের দেয়াল দেয়া বাড়ীর সামনে এলো। বাড়ীটার সামনের অংশে খুচরা জিনিষ পত্রের দোকান। পেছনে একটা ঘরে পার্টির অফিস। সে গাড়ী নিতে চেয়েছিল, যুবকটা মানা করেছে। ঘুরে পেছনের পার্টী অফিসে ঢুকতে পাঁচ ছয় জন যুবককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজনের পোষাক আষাক বেশ দামী মনে হল, প্যান্ট শার্ট পরেছে, হাতে নতুন ঘড়ি, পায়ে সুন্দর জুতা। সে একটা ভারী কাঠের চেয়ারে আয়েস করে বসে আছে। বাকীরা লুঙ্গী আর শার্ট পরনে। এরা সবাই দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল যে লোকটি বসে আছে সেই এদের নেতা – খুব সম্ভবত বাবর ভাই।
রহমত ভেতরে ঢুকতে লোকটি তাকে হাতের ইশারায় বসতে বলল। রহমতের কেন যেন মনে হল, সে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সে নীরবে বসল। তাকে কঠিন দৃষ্টিতে দেখল লোকটা। "আমি বাবর। এখানকার সরকারী পার্টির যুব নেতা। আপনি কে? এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?"
রহমত বিনীত কণ্ঠে বলল, "আমি জুলেখার স্বামীর বন্ধু। তার দাই মার সাথে একটু দেখা করতে এসেছি।"
"জুলেখা তো বিয়ের পর কানাডা চলে গেছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"
"জ্বী, কানাডা থেকে।"
বাবর চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল না তার কথা সে বিশ্বাস করেছে।
"দাই মার সাথে দেখা করার কি দরকার?"
"জুলেখা ভাবীর কিছু মানসিক সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। দাই মা যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারে।" রহমত সত্যি কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিল। লোকটার হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে না সে রহমতকে খুব একটা পছন্দ করছে।
"জুলেখা ফিরে আসবে নাকি?" বাবরের কণ্ঠে কাঠিন্য।

"জ্বী না। আমরা ওখানেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। সেই জন্যেই গ্রামে এসে খোঁজ খবর করছি। যদি কেউ কিছু জানাতে পারে।"
"জুলেখার বাবার বাড়ী গিয়েছিলেন কেন? সেতো ভুতের বাড়ী।"
"ভেবেছিলাম যদি তার কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হয়, তারা হয়ত কিছু বলতে পারবে। ওখানে কয়েক জনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারাই আমাকে এখানে পাঠায়।"
আপনমনে মাথা দোলাল বাবর। "সত্যি কথা বলছেন তো? আপনার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?"
"না ভাইয়া। আর কি উদ্দেশ্য থাকবে?"
মোবাইল ফোন বের করল বাবর। "পুরো নাম বলেন আর কানাডায় কোন শহরে থাকেন বলেন।"
বলল রহমত। সার্চ করল বাবর। রহমতের ফেসবুক একাউন্ট আছে। বিভিন্ন ব্যবসা করে। নানান দিক থেকে তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য চলে এলো, ছবি সহ। দেখে মাথা দোলাল বাবর। যে যুবকটি তাকে ডেকে এনেছিল তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওনার সাথে যা। দাইমার সাথে আলাপ শেষ হলে উনি যেন কোন ঝামেলা ছাড়া এখান থেকে ফিরে যেতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখবি।"
রহমতের দিকে ফিরল বাবর। "দাই মার সাথে কথা হলে সোজা কানাডা ফিরে যাবেন। এখানে আমরা জুলেখাকে চাই না। সে এই গ্রামে অনেক সমস্যা করেছে। আর না। বুঝেছেন?"
শান্ত ছেলের মত মাথা দোলাল রহমত। এই বিপদ থেকে ছাড়া পেলেই সে বাঁচে। এই লোকটা কেন জুলেখার ব্যাপারে এতো উদবিগ্ন সে ঠিক বুঝতে পারছে না।
প্রথম যুবকটার সাথে ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল রহমত। বাবর অফিস ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঘাবড়ে গিয়ে হাত নাড়ল রহমত। বাবরও ছোট করে পালটা হাত নেড়ে একটা সিগ্রেট ধরাল। কোথাও একটা প্যাঁচ আছে, মনে মনে ভাবল রহমত। এই লোকটা কি জুলেখার ব্যাপারে কিছু জানে? নাকি সে অন্য কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?
দাই মার ঘরে ফিরে এসে আবার উঠোনে একটা পাটিতে বসল রহমত। যুবকটা একটু দূরে একটা নারকেল গাছের নীচে ছায়ায় হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতার উপর বসল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকেই পর্যবেক্ষন করছে। রহমত তার দিকে তাকাতেও সে চোখ ফিরিয়ে নিল না। তাকে এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করল সে। বয়েস হয়ত আঠার-উনিশ হবে, পোড়াটে বাদামী গায়ের রঙ, রোগাটে শরীর কিন্তু দেখে বলশালী মনে হয়। মাথায় ঘাড় সমান লম্বা চুল, দাড়ি – মোচ এখনও বেশ পাতলা, হয়ত কালে ভদ্রে শেভ করে।
"তোমার নাম কি?"
"নাসের।"
"তুমি কি এই গ্রামেই থাক?"

মাথা দোলাল নাসের। হ্যাঁ। আর কি জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল রহমত। উলটা পালটা কিছু জিজ্ঞেস করে সে ছেলেটাকে সন্দিহান করে তুলতে চায় না। ছেলেটা নিজেই বলল, "জুলেখা বু কেমন আছে?"
"ভালো। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। তোমরা তো সবাই জানোই মনে হচ্ছে।"
"তার উপর জ্বীনের আছর আছে। মেয়ে জ্বীন। নাম চাঁদনী। মহা শয়তানী। সবাই তাকে ভয় পেত। কিন্তু জুলেখা বু ছিল একেবারে ফেরেশতার মত। তার মুখে একটা মন্দ কথা কেউ শুনবে না। কিন্তু ঐ শয়তানীটা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সে একেবারে পালটে যায়।"
"তুমি জান চাঁদনীর কথা?"
নীরবে মাথা নাড়ল নাসের। মনে হল তার মুখে মেঘের ঘনঘটা নেমে এল। ক্ষনিকের জন্য। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "সবাই জানে। কিন্তু কেউ বরপক্ষকে বলে না। সবাই চায় জুলেখা বু এখান থেকে দূরে চলে যাক, তাহলে চাঁদনীকেও আর আমরা দেখব না।"
"কি করত চাঁদনী?"
নাসের বলল, "ওর অনেক রাগ আর ভীষণ শক্তি। কত তাগড়া জোয়ানকে এক ধাক্কা দিয়ে বিশ ফুট দূরে ছুড়ে ফেলেছে!" তারপর গলা অনেক খানি নামিয়ে বলল, "অনেকে বলে ঐ নাকি জুলেখা বু'র বাবা মাকে মেরেছে। সে নাকি তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ এসে সব দেখে টেখে বলল আত্মহত্যা। আমার মাথা আর মুণ্ডু। চাঁদনী মেরেছে ওদেরকে। শুধু ওরা না, জুলেখা বু'র নানি – তাকেও নাকি চাঁদনীই মেরেছে। জ্বীনদের অনেক ক্ষমতা। অনেক কিছু করতে পারে।"
রহমত অবাক হয়ে বলল, "সে কেন ওদেরকে মারবে?"
তাকে কিচ্ছুক্ষন পরখ করল নাসের। "আপনি সব গল্প জানেন না?"
মাথা নাড়ল রহমত। মনে মনে সে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে আছে। এমন আচমকা এই ছেলের সাথে এভাবে দেখা হবে কে জানত। মনে তো হচ্ছে এই ছেলেই খবরের ডিপো। নাসের উঠে এসে তার পাশে বসল। গলা নামিয়ে বলল, "এই গ্রামে আমাকে অনেকেই চেনে। কেন জানেন? কারণ আমি বাশারের ভাই। বাশার ছিল আমার বড় ভাই। ছয় সাত বছরের বড় হবে, একটু পাগলা পাগলা ছিল। একা একা মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াত, বাঁশী বাজাত, গান বাঁধত। লোকে বলে এই কারণেই তাকে জ্বীনে ধরেছিল। একটা ছেলে জ্বীন। তার নাম ছিল জমিন। চাঁদনী জুলেখা বু কে ধরেছিল সেই ছোটবেলায়। জুলেখা বু একা একা ঘুরত, নিজে নিজে কথা বলত – নানী আর দাইমার মুখে শুনেছি। সুযোগ বুঝে তার উপর ভর করে শয়তানীটা। বাশার ভাইকে জ্বীনে ধরেছিল সাত আট বছর আগে। কপালের কি লিখন, সেই জ্বীনের সাথে চাঁদনীর হল ভাব। প্রেম পীরিতি। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে তো জ্বীণ দেখা দেয় না। তারা দেখল জুলেখা বু আর বাশার ভাইকে।

সবাই বলতে লাগল তাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে। আমরা হলাম দিন মজুর, আর জুলেখা বুরা হল কত নামী দামী পরিবার। কত টাকা পয়সা, ইটের বিরাট বাড়ী।"
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল নাসের। রহমত গভীর আগ্রহ নিয়ে এর পর কি ঘটল শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। নাসের মনে হল কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেল। রহমত তার চিন্তায় ব্যাঘ্যাত ঘটাতে চাইল না কিন্তু আবার তার ভয় হচ্ছে কেউ এসে গেলে নাসের হয়ত তার গল্পের শেষটুকু আর বলতে চাইবে না।
"নাসের! বাকীটুকু শোনাটা আমার খুব দরকার।" সে একরকম কাকুতি করল।
নাসের হতাশ কণ্ঠে বলল, "জুলেখা বু'র বাবা মা তাকে এক রকম জোর করে বিয়ে দিল আমিরগঞ্জের আসলাম ভাইয়ের সাথে। আসলাম ভাই কিছুই জানত না। সে ভালো মানুষ কিন্তু চাঁদনী জমিনের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে না। সেই জন্য সে আসলাম ভাইকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে জুলেখা বু'কে ছেড়ে দিতে। জুলেখা বু বাড়ী ফিরে আসার পর তার বাবা-মা খুব রেগে গেলেন। তারা আমার ভাইকে দোষ দিলেন এই বিয়ে ভাঙার জন্য। অথচ আমার ভাইটা ছিল একেবারে সহজ সরল একটা মানুষ। দিনের বেলা মজুরের কাজ করত মুখ বুজে আর সনধ্যা হলে বনে বাদাড়ে গিয়ে ঘুরত, বাঁশী বাজাত, ওর যা মন চাইত করত। একদিন ওকে বনের মধ্যে ধরল কয়েকটা লোক, ওদেরকে পাঠিয়েছিল জুলেখা বু'র বাবা। বাশার ভাইকে মেরে ফেলার জন্য। তার লাশ পাওয়া গেল দু' দিন বাদে। একটা জলার মধ্যে ভাসছিল। সবাই বলল জ্বীনে মেরেছে। আমরা বিশ্বাস করি নাই। জ্বীন কাউকে মারে না। কখন শুনি নাই। পুলিশ আসল। জুলেখা বু'দের বাসায় তাদের ডাকা হল। তারা আর কখন আসে নাই।"
রহমত ফিসফিসিয়ে বলল, "আর জমিনের কি হল? জুলেখার সাথে যে জ্বীনটার ভালোবাসা ছিল?"
"কেউ জানে না। হয়ত অন্য কাউকে ধরেছে। কিন্তু সবাই জানে চাঁদনীই মেরেছে জুলেখা বু'র বাবা-মাকে। নিশ্চয় জমিনের কিছু হয়েছে তার পর। যার উপর তারা আছর করে, সে মরে গেলে জ্বীনরা কোথায় যায় কে জানে। কিন্তু বাশার ভাই খুন হবার পর আমাদের সংসারটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন মাত্র চৌদ্দ। আমার বাবার শরীরটা ভালো না। কাম কাজ করতে পারে না। মা ছুটা কাজ করে। আমি মজুরি করতে শুরু করলাম। আমার মনের মধ্যে অনেক রাগ। আমার ভাইটা তো কিছু করে নাই। তাকে কেন মারল?" রহমতের একেবারে কানের কাছে এসে বিড়বিড়িয়ে বলল নাসের, "এই জন্য বাবর ভাইয়ের সাথে আছি। জুলেখা বু'দের ঘর বাড়ীর কোন ওয়ারিশ নাই। বাবর ভাই বলেছে কাগজ পত্র বানিয়ে সব নিয়ে নেবে। আমাদের পরিবার পাবে অর্ধেক।"
এবার বাবরের দুশ্চিন্তার কারণটা পরিষ্কার হল রহমতের কাছে। সে নিশ্চয় ভেবেছিল রহমত কোন উকিল টুকিল হবে, জুলেখার সম্পত্তি দেখভাল করতে এসেছে।
নাসের একটু চুপ করে থেকে সতর্ক কণ্ঠে বলল, "আপনাকে এই কথা বলেছি এটা যেন কাউকে ভুলেও বলবেন না। বাবর ভাই আমাকে শেষ করে দেবে। খুব খারাপ লোক।

সবাই বলে সে অনেক মানুষ মেরেছে। নিজের হাতে না। টাকা দিয়ে। অনেক গরীব মানুষ এদিকে। অল্প কিছু টাকার জন্য জীবন নিয়ে নেবে।"
রহমত তাকে আশ্বস্ত করল। সে কাউকে বলবে না। সে নাসেরের হাতে কয়েক হাজার টাকা গুজে দিল। বলল জুলেখার হয়ে সে এটা তাকে দিচ্ছে। নাসেরের চোখ টলমল করে উঠল। বাইরে থেকে এমন কঠিন দর্শন একজন যুবকের ভেতরে এতোখানি তারল্য থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে রহমতের বিশ্বাস হত না। নাসের একটু ধাতস্থ হতে রহমত জানতে চাইল, "নাসের, তোমার কি মনে হয় দাই মা আমাকে নতুন কিছু বলতে পারবে?"
নাসের একটু ভেবে বলল, "সবাই বলে দাইমা একমাত্র মানুষ যে জুলেখা বু সম্বন্ধে সব কিছু জানে। আর জানত নানী। কিন্তু তাকে তো চাঁদনী শয়তানীটা মেরেছে। গলা চেপে। নানী হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। সুস্থ মানুষ কেন ঐভাবে মরবে?"
রহমতের মাথায় একটা চিন্তা চিড়িক দিয়ে ওঠে। সেটা বাবরের কাজ না তো? জুলেখার সম্পত্তি বাগাতে হলে নানীকে সরানোটা দরকার ছিল। কিন্তু সব না জেনে কিছু আন্দাজ করাটা ঠিক হবে না। আর তাছাড়া সে এইসব খুন খারাবী নিয়ে ভাবতেও চায় না। তার এখানে করনীয় কিছুই নেই।

দাই মা ফিরল দুপুরের একটু পরেই। সে রহমতের বয়েসী হবে। ষাট ছুই ছুই। কিন্তু শরীর এখনও বেশ শক্তপোক্ত। বেশ একটা দাপট নিয়ে হাঁটা চলা করে। রহমতের গাড়ী তার বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কপাল কুচকাল। ভেতরে এসে রহমতকে স্বয়ং তার উঠোনে নাসেরের পাশে বসে থাকতে দেখে সে থমকে গেল।
"নাসের, তুই এখানে কি করিস?"

নাসের সংযত কণ্ঠে বলল, "ইনি জুলেখা বু'র স্বামীর বন্ধু। তোমার সাথে কথা বলবেন। বাবর ভাই বলেছে কথাবার্তা হলে ওনাকে নিরাপদে যাবার ব্যাবস্থা করতে।"
দাই মা বিড়বিড় করে বলল, "তুই কোন দুঃখে ঐ শয়তানটার সাথে পড়ে আছিস আল্লাই জানে।" এবার রহমতের দিকে ফিরল সে। "জুলেখা আপনাকে আমার কথা বলেছে?"
মাথা নাড়ল রহমত। "আমি যে এখানে এসেছি জুলেখা ভাবী জানে না। আমরা তার চিকিৎসা করাতে চাই। সেই জন্য খোঁজ খবর করছি। শুনলাম আপনি হয়ত কিছু জানতে পারেন।"
দাই মা নাসেরের দিকে তাকাল। "তুই বাশারের কথা সব বলেছিস?"
নাসের নিঃশব্দে মাথা দোলাল।
"তাহলে তো সব শুনেছেনই," রহমতকে উদ্দেশ্য করে বলল দাই মা। তার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছিল। একটা চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে গেল সে। একটা কাঁচের গ্লাশে কলসি থেকে পরিষ্কার পানি এনে রহমতের সামনে রাখল। "একটু পানি খান। বাসায় আর কিছু নাই। নাসের কয়টা ডাব পেড়ে দিবি?"

রহমত দ্রুত আপত্তি করল। "আমি কিছু খাব না। আমার পেটে অসুবিধা হয়।"
দাই মা কিছু একটা চিন্তা করল। "আপনার নাম কি?"
"রহমত আলী।"
"আপনি জুলেখার বর মিজানের বন্ধু? তাদের বিয়ের সময় আমি ছিলাম। বেশী মানুষকে বলা হয় নাই। বিয়েটা খুব চুপচাপ হয়েছিল। আচ্ছা আপনি ঘরের ভেতরে আসেন। আপনাকে আমি কিছু কথা বলব। নাসের বারান্দায় বয়। দরজাটা ভেড়ান থাক। কেউ এলে শব্দ করিস।"

দাই মাকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে ঢুকল রহমত। পানিটা সে খেল না। এইসব জ্বীন-ভুত এবং খুন খারাবীর কথা শুনে তার এখন সবাইকেই সন্দেহ হতে শুরু করেছে। কে জানে কার কি মতলব আছে? ঘরটা ছোট। মাটির ঘর। পরিপাটি করে সাজানো। শোয়ার ব্যাবস্থা মাটিতে। একটা তোষক পাতা। সেখানেই বসতে হল রহমতকে। একটা জানালা আছে, কাঠের পাল্লা দেয়া। সেটা খুলে দিল দাই মা। ভেতরে কিছু আলো আসছে। একটা মোড়া নিয়ে কিছু দূরত্ব রেখে বসল সে।
"নাসেরের মুখে তো সব শুনেছেন। আমি আপনাকে যেটা বলব, সেটা আর কেউ জানে না। জুলেখার চিকিৎসা যদি করাতে চান, তাহলে একজন মানুষকে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাকে না পেলে কোন লাভ নেই। কিন্তু আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, আমার মুখ থেকে যা শুনবেন, আপনার বন্ধু ছাড়া আর কাউকে বলবেন না।"

রহমতকে কথা দিতে হল। কৌতুহলে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুড়ী গলা নামিয়ে বলল,"তার নাম হচ্ছে মোল্লা, মোল্লা ইমাম। তার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে জ্বীন পোষ মানাতে পারে, তাড়াতে পারে, দাস করতে পারে। জ্বীনের উপর তার অনেক ক্ষমতা। সবার থাকে না। কারো কারো থাকে। জুলেখার চিকিৎসার জন্য মোল্লাকে নিয়ে এসেছিল ওর বাবা। দূর থেকে। যেন গ্রামের কেউ এই ব্যাপারে কিছু না জানে। তার বাবা, মা আর আমি ছাড়া আর কেউ কিচ্ছু জানে না। মেয়েটাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওর বাবা,মা আমাকে বিশ্বাস করত। জানত মরে গেলেও আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হবে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল বুড়ী। "আসলামের সাথে বিয়ের কয়েক দিন আগে মোল্লাকে আনা হয়েছিল। রাতে। সে অনেক তুক তাক করে চাঁদনীকে তাড়ালো। আমরা ভাবলাম জুলেখা এবার সুখে থাকবে। কিন্তু চাঁদনী খুব শয়তান জ্বীন। সে আমাদের সবাইকে ধোঁকা দেয়। আমরা ভেবেছিলাম সে চলে গেছে, আসলে যায় নি। অভিনয় করেছিল। আসলামের সাথে বিয়ের পর সেটা ধরা পড়ল। বেচারা আসলাম বাধ্য হয়ে জুলেখাকে তালাক দিল। জুলেখার বাবা ভীষণ রেগে গেল। মোল্লাকে বলল জমিনের একটা ব্যাবস্থা করতে। যদি জমিনকে সরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে চাঁদনী হয়ত নিজেই চলে যাবে। বনের মধ্যে বাশারকে কয়েক জন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ধরে মোল্লা। জমিনকে তাড়ানোর জন্য তাকে

মারধোর করে। বাশারের বুকের দোষ ছিল। হার্ট ফেল করে। হতভাগা। জ্বীনের জন্য জীবনটা দিল। কিন্তু মোল্লা একটা কাজের কাজ করে। সে জমিনকে বন্দী করে তার সাথে নিয়ে যায়। কেউ জানে না জমিন কোথায়, কিভাবে আছে।"
রহমত চমকাল। "জমিন কি তাহলে মোল্লার দাস হয়ে আছে?"
"হ্যাঁ। তার পরই জুলেখার বাবা-মাকে বিষ দিয়ে মারে চাঁদনী"।

সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না রহমত। এই মহাবিশ্বে কতটুকুই বা সে জানে?
"মোল্লাকে কোথায় খুঁজে পাব?" জানতে চাইল সে।
"জানি না," মাথা নাড়ল বুড়ী। "শুধু এইটুকু মনে আছে সে উত্তরের যাদবপুর নামে কোন গ্রাম থেকে এসেছিল।"
উত্তরের যাদবপুর? শুধু এই টুকুর উপর ভরসা করে কি কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? উত্তর বলতে কত উত্তর? এই গ্রামের উত্তর নাকি পুরো বাংলাদেশের উত্তর? মনে হল না বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে। রহমত তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।
নাসের তার গাড়িতে করে বাজার পর্যন্ত এলো। তাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে হোটেলের পথ ধরল রহমত। তার মাথায় চিন্তার ঝড়। উত্তরের মোল্লাকে সে কি করে খুঁজে পাবে? অবিনেশ কি কোন কাজে আসবে?

অবিনেশকে হোটেলের ডেস্কেই পাওয়া গেল। রহমতকে দেখেই সে বিশাল এক গাল হাসি দিল। "কোথায় ছিলেন আপনি সারা দিন? জামালপুরে? যে কাজে এসেছিলেন, সেটা হল?"
রহমত দাঁড়িয়ে গেল। "কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু আপনার একটু সাহায্য লাগবে মনে হচ্ছে।"
অবিনেশ খুশী হয়ে গেল। "বলেন কি! আপনার কোন কাজে আসতে পারলে খুব ভালো লাগবে। আপনি মানুষটা ভালো। বলেন, কি করতে পারি?"
রহমত দ্বিধা করছে দেখে গলা নামিয়ে যোগ করল, "গোপন কথা হলে আপনার কামরায় গিয়ে আলাপ করা যায়। দেয়ালেরও কান আছে।"
তাকে সাথে করে নিজের কামরায় এনে দরজা লাগিয়ে দিল রহমত। "দেখুন অবিনেশ, ব্যাপারটা একটু নাজুক। আপনাকে বললে আপনি আবার আমাকে পাগল টাগল ভাববেন না।"
অবিনেশ হাসি মুখে বলল, "বয়েস তো কম হল না। পাগল জীবনে অনেক দেখেছি। আরোও দেখব। কিন্তু আপনি যে তাদের একজন নন, সে আমি প্রথন দেখাতেই বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।"
"আমি একজন মানুষকে খুঁজছি। তার নাম মোল্লা ইমাম। সে জ্বীনের ওঝা। আপনার কি বিশ্বাস আমি জানি না। আমারটাও জানতে চাইবেন না। কিন্তু নিতান্ত বিপদে পড়েই এখানে এসেছিলাম। আমার বন্ধু একটি কম বয়েসী মেয়েকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে

যায়। মেয়েটির কিছু একটা সমস্যা আছে। সবাই বলছে তার উপর জ্বীনের আছর আছে। এই মোল্লা সাহেবকে আমার দরকার। জামালপুরে ঐ মেয়েটির খুব ঘনিষ্ট এক আত্মীয়সম মহিলা আমাকে বলেছে, মোল্লা ইমাম আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু তার সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য আমার কাছে নেই। শুধু জেনেছি সে উত্তরে যাদবপুরে থাকে। কোন উত্তর, কোন যাদবপুর – আমার কোন ধারনা নেই।"

সব শুনে অবিনেশ কিছুক্ষন আপন মনে ভাবল। "গ্রামাঞ্চলের মানুষ জ্বীন-পরী খুব গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। ভগবানের দুনিয়ায় অনেক কিছুই সম্ভব। আমাকে দেখে যাই মনে হোক, আমি আবার বিজ্ঞান অন্ত প্রাণ। কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে না পারলে বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ থাক। আপনার দরকার মোল্লা ইমামকে খুঁজে বের করা। তার নামও আমি কখন শুনিনি, যাদবপুর বলে কোন জায়গাও এই অঞ্চলে আছে বলে জানি না। কিন্তু, আমি একজনকে চিনি যার জ্বীনের ওঝা বলে কিছু পরিচিতি আছে। তার সাথে একটু আলাপ করে দেখি। যদি কিছু জানতে পারি তাহলে আপনাকে জানাব।"

অবিনেশ চলে যাবার আগে জানতে চাইল, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে? যদি চান আমি রুম সার্ভিসের ব্যাবস্থা করতে পারি।"

রহমত বাইরে গিয়ে খাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। শহরটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর। একটু হেঁটে দেখতে চায়। অবিনেশ চলে যেতে গোছলে চলে গেল। মিজানের ওখানে কি হচ্ছে কে জানে? আজকে যা জেনেছে, সেটুকু বন্ধুকে টেক্সট করে দিল। ফোন করতে ভয়ই হয়। জুলেখা কাছাকাছি থাকলে কি সন্দেহ করে বসবে কে জানে? তার সামনে মিজান মন খুলে কথাও বলতে পারবে না। কি যে বিপদে পড়া গেল! এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ কি? মেয়েটাকে এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার তো কোন প্রশ্নই আসে না। হয় সে নিজে মরবে, নয়ত অন্যদের মারবে।

সতের

অফিসে পৌঁছে রহমতের টেক্সট পড়ল মিজান। রহমত অল্পের মধ্যে নতুন তথ্য যা পেয়েছে জানিয়েছে। বাস্তব – অবাস্তব নিয়ে আর মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না মিজান। যদি মোল্লা ইমাম এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে তাহলে তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তার আসা-যাওয়ার খরচ মিজান দেবে, সেটা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তার ভিসার ব্যবস্থা কি করে করা যাবে সেটা একটা চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু আগে তাকে খুঁজে পাওয়াটা প্রয়োজন। পরে এসব নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা করা যাবে। তার হয়ত এতো দূরে পাড়ি জমানোরই দরকার হবে না। যারা জ্বীন পোষে তারা নাকি দূরে বসেই অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারে। মোল্লার ক্ষমতা কতখানি কে জানে?

কাজের ফাঁকে সুযোগ বুঝে রহমতকে একটা ফোন দিল। তখনও ঘুমাতে যায়নি সে।

রাত দশটার মত বাজছে বাংলাদেশে। সারা শহর একেবারে সুনসান করছে। তার

কামরায় একটা টেলিভিশন আছে। সেটাই দেখছিল রহমত। মিজানের কাছে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব বিস্তারিত বর্ণনা করল। অবিনেশ এখনও তাকে কিছু জানায় নি। যে ওঝার সাথে সে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল তাকে ফোন করে পাওয়া যায় নি। বোধহয় কোথাও জ্বীন ঝাড়াতে গেছে। মেসেজ রেখেছে অবিনেশ। কখন কল ব্যাক করবে কে জানে? রহমত অবশ্য দৃঢ় সংকল্প করেছে মোল্লার হদিস না নিয়ে সে কোথাও যাচ্ছে না। এতো দূর এসে পিছিয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না।
রহমতকে ঘুমাতে যাবার সুযোগ দিয়ে কাজে ফিরে গেল মিজান। মালেক এবং জিনিয়া এখনও কোন কিছু জানায় নি। একবার ফোন করবে কিনা ভাবল। পরে মত পাল্টাল। বার বার ফোন করলে ওদের দাম বেড়ে যাবে। যা সিদ্ধান্ত নেবার নিক। বাসায় আপাতত শান্তিতেই আছে মিজান। সে তার মত থাকে, জুলেখা নিজের মত। সাইকিয়াট্রিস্টের খবর নিয়েছে সে। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু কিছুদিন সময় লাগবে। তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পুর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক। কোন পুলিশি ঝামেলা হয় নি কারণ এলান চায় নি। সে কাউকে দোষারোপও করে নি। মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে মিজান। ঠিক করেছে আর কিছুদিন পরে গিয়ে তাকে দেখে আসবে।
কাজ সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল হল। ইদানীং জুলেখার সাথে প্রায় কথা বার্তা হয়ই না। আগের মত এখন আর অফিস থেকে তাকে ফোন করে না মিজান। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়। জুলেখার জন্য তার চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ফোন করে কি কথাই বা বলবে?
বাসায় ফিরে তার অবাক হবার পালা। সমস্ত বাড়ী পরিপাটি করে গুছিয়েছে জুলেখা। অনেক পদের রান্না করেছে। টেবিলে প্লেট পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছে – চারটা। মিজান ভাবল হয়ত মালেক এবং জিনিয়া এসেছে। কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না। তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে দেখে জুলেখা বলল, "এখনও আসে নি। চলে আসবে। আমরা এক সাথে খাব।"
"ফোন দিয়েছিল নাকি?" মিজান কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়।
তার প্রশ্নের উত্তর দেয় না জুলেখা। মিষ্টি হেসে বলল, "চলে আসবে। আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসেন।"
কথা না বাড়িয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল মিজান, পিছু ডাকল জুলেখা। "শোনেন! ওরা আমাকে পছন্দ করবে তো?"
মাথা দোলাল মিজান। "অনেক পছন্দ করবে।"
জুলেখা লাজুক গলায় বলল, "আমি কিন্তু আপনার সাথে এক ঘরে থাকব না। চাঁদনী খুব রাগ করবে। ওদেরকে আবার কিছু বলবেন না।"
মাথা নাড়ল মিজান। বলবে না। উপরে এসে ফোনটা চেক করল। কল লগ দেখল। সকাল থেকে উলটো পালটা কিছু ফোন এসেছে, বোধহয় টেলিমার্কেটারদের কাছ থেকে। মালেক কিংবা জিনিয়ার নাম্বার দেখল না। জুলেখা কেন ধরে নিচ্ছে ওরা আজকে

আসবে। তবে কি চাঁদনী তাকে কিছু জানিয়েছে? তার কি সত্যিই কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে? দেখা যাক। সে গোছল করতে গেল।
আধা ঘন্টা পরে যখন পোষাক পরে নীচে নেমে এলো, লিভিংরুমে মালেক এবং জিনিয়াকে জুলেখার সাথে বসে আলাপ করতে দেখে তার বুক ধ্বক করে উঠল।
"তোরা?"
জিনিয়া সহজ কণ্ঠে বলল, "চলে এলাম বাবা। জুলেখার সাথে কথা হচ্ছিল। ও তো বলছে এই বাড়ী নাকি ওর খুব পছন্দ!"
মিজান দ্বিধা করে বলল, "ও কিন্তু তোদের সম্পর্কে মা হয়, না?"
জুলেখা দ্রুত বাঁধা দিল। "আমিই ওদেরকে বলেছি আমাকে নাম ধরে ডাকতে। এখানে তো সবাই সবাইকে নাম ধরেই ডাকে। আর আমি তো ওদের সৎ মা। এসো, তোমাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দেই। তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এলে ডিনার দিয়ে দেব। তোমরা তো এদেশে বড় হয়েছ। নিশ্চয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও?"
মালেক হেসে বলল, "তুমি চিন্তা কর না জুলেখা। আমাদের অত ক্ষুধা লাগে নি।"
জুলেখা হাসি মুখে বলল, "ক্ষুধা না লাগলেও আজ তাড়াতাড়ি খেতে হবে। এতো কষ্ট করে রান্না করেছি। গরম গরম না খেলে ভালো লাগবে না। চল, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেই। বাক্স কোথায়?"
জিনিয়া বলল, "গাড়ীতে। নিয়ে আসি। আয় ভাইয়া।"
মালেক বোনকে অনুসরণ করে বাইরে গাড়ীতে গেল তাদের বাক্সপেটরা আনতে। জুলেখা মিজানের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচাল। "কি, বলেছিলাম না আসবে? ওরা খুব সুন্দর আর ভদ্র। ওদেরকে আমার খুব ভালো লেগেছে!"

মিজান মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল। জুলেখা এতো খুশী হবে সে আন্দাজ করে নি। হয়ত এটাই জুলেখার প্রকৃত রূপ। লক্ষী আর মায়াময়ী একটা মেয়ে। কিন্তু চাঁদনী তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। ছেলেমেয়ে দুটো কোন বিপদে না পড়লে হয়। এলানের কথা মনে হল। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে বেচারার কি দুর্দশা হল!

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। জুলেখার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে মালেক এবং জিনিয়া। এদেশে বড় হলেও নায়লা তাদেরকে একরকম জোর করেই মশল্লা দেয়া খাবার খেতে শিখিয়েছে। বাংগালীর ছেলেমেয়েয়ারা শুধু বিদেশী খাবার খাবে, এটা তার সহ্য হত না। সবাইকে ডেক-এ নিয়ে বসাল জুলেখা, চা বানিয়ে নিয়ে এল। চমৎকার বাতাস বইছে, শেষ বেলার অবশিষ্ট আলোটুকু দূরের আকাশে এখনও আলতো করে লেপ্টে আছে। গাঢ় বেগুণী রঙের মেঘে আধারের ইঙ্গিত।
"একটু পরেই চাঁদ উঠবে," জুলেখা একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল। "আমি প্রতিদিন রাতে এখানে বসে জ্যোৎস্না দেখি। কি যে ভালো লাগে!"
মালেক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "মাও খুব জ্যোৎস্না পছন্দ করত! "

জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। মা আবার গান গাইত। 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' | জোর করে সবাইকে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে গান শোনাত। তখন খুব বিরক্ত লাগত।" হঠাৎ থেমে গেল সে| তার গলা ভিজে এসেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,"এখন খুব মিস করি মাকে। তার গাওয়া একটা গান পর্যন্ত রেকর্ড করে রাখিনি। রাখলে এখন মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম।" তার কণ্ঠস্বর বুজে এলো।
মালেক বোনের পিঠে হাত বোলাল। "মন খারাপ করিস না। আমি তো মা'র গান পরিষ্কার শুনতে পাই। রেকর্ডের দরকার হয় না।"
মিজান বলল, "আমার কাছে হয়ত থাকতে পারে। ভিডিওগুলো সব বের করে দেখতে হবে। "
জিনিয়া বাঁকা গলায় বলল, "তোমাকে দেখতে হবে না। আমিই খুঁজে বের করব| ভিডিওগুলো সব কোথায় রেখেছ?"
"আমার স্টাডিতে। আলমারীটার মধ্যে| চাবি পাশের ড্রয়ারে।"
জুলেখা মৃদু গলায় বলল, "জিনিয়া, তোমার মায়ের গানগুলো দিয়ে আমি তোমার জন্য একটা ডিভিডি বানিয়ে রেখেছি। দশটা গান পেয়েছি। কি সুন্দর ছিল নায়লা ভাবী! তাকিয়ে থাকার মত।"
মালেক এবং জিনিয়া অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। জিনিয়া বলল,"সত্যি! তুমি কি করে জানলে আমি মায়ের গান শুনতে চাই?"
মুচকি হাসল জুলেখা। "তুমি ছোটবেলায় ঘুমানোর সময় তোমার মাকে বলতে গান গাইতে। তোমার বাবা সেটাও রেকর্ড করেছিলেন। খুব কিউট ছিলে তুমি। তোমরা দু'জনাই।"
মালেক বলল, "আমাকে খুশী করার জন্য কিছু বলতে হবে না। আমি যে দেখার মত কিছু নই, সেটা আমি জানি। দেখছ না, এখনও একলা।"
জুলেখা চটুল গলায় বলল, "সেটা নিশ্চয় তোমার কারণেই। খুব খুঁতখুঁতে বোধহয়। ঠিক বলেছি?"
জিনিয়া তাকে সমর্থন করল, "একেবারে ঠিক বলেছ। কাউকেই তার পছন্দ হয় না। কেউ বেশী আধুনিক, কেউ বেশী উগ্র, কেউ বেশী জ্ঞানী – কি খুঁজছে নিজেই জানে না।"
আপত্তি জানাল মালেক। "আরে, বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছু না। প্রেমে না পড়ে বিয়ে করতে চাই না।"
জিনিয়া বলল, "প্রেমে পড়তে হলে তো চেষ্টা করতে হবে। ঘরে একা একা বসে থাকলে তো আর প্রেম হবে না।"
"হবার হলে এমনিই হবে," মালেক লাজুক গলায় বলল। "বলে কয়ে প্রেমে পড়া যায় না। প্রথম দেখাতেই হয়ে যায়।"
"ঐ আশাতেই থাক তুই," জিনিয়া ছদ্ম রাগ দেখাল। "বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস খেয়াল আছে? ত্রিশ তো হল। আর কত দিন তার পথ চেয়ে থাকবি?"
"এই আলাপ রাখ," মালেক বোনের মাথায় একটা হাল্কা চাটি দেয়।

জুলেখা কুলকুলিয়ে হেসে ওঠে। "তোমাদের দুজনকে দেখে খুব ভালো লাগছে। আমার কোন ভাই বোন নেই।"
আলোর শেষ চিহ্ন মুছে যেতে চাঁদের রুপালী আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। পুর্ণীমা হতে এখনও কয়েক দিন বাকী। কিছুক্ষণ নীরবে সেই অপুর্ব সুন্দর দৃশ্যটা উপভোগ করল ওরা।
জিনিয়া বলল, "অনেক দিন পর আবার আমরা তিনজন একসাথে এভাবে বসলাম।"
মিজান শুকনো গলায় বলল, "তোদেরকে খুব মিস করেছি রে। দু'জনে যে যার মত চলে গেলি।"
জিনিয়া খোঁচা দিল, "তাতে তোমার তো খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। জুলেখার মত সুন্দরী, যুবতী বউ আছে তোমার!"
খিল খিল করে হাসল জুলেখা। "এই, জঙ্গলে যাবে তোমরা? চাঁদের আলোয় বনের মধ্যে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। একটা আলো আধারীর খেলা হয় গাছের পাতায় পাতায়। যাবে?"
মিজান বাঁধা দিল, "এই রাতে না যাওয়াটাই ভালো..."
জিনিয়া বলল, "কেন বাবা? আমি আর ভাইয়া তো কত গেছি। মনে নেই তোমার? আমরা যখন টিন এজার ছিলাম। মাও তো মাঝে মাঝে যেত আমাদের সাথে। ভাইয়া, ওয়ালনাট গাছের নীচের গুহাটার কথা মনে আছে তোর? ছোটবেলায় আমরা ওখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম আর বাবা আমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেত। এতো বোকা বানাতাম বাবাকে আমরা!" মন খুলে হাসছে জিনিয়া। খুব ভালো লাগছে মিজানের। ছেলেমেয়ে দুটো কাছে থাকলে বাড়ীটার আবহাওয়াই পালটে যায়। জুলেখার সাথে তাদের ভাব হয়েছে দেখে আরোও ভালো লাগছে। এটা তার কল্পনারও বাইরে ছিল।
মালেক বলল, "চল, হেঁটেই আসি একটু। পুরানো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। বাবা, তুমিও চল।"
জুলেখা ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে। জিনিয়াও তার সঙ্গ নিল। মিজান বলল, "তোরা যা, আমি একটু বসে থাকি এখানে। বেশী দেরী করিস না।"
ওরা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নীচের ঘাসে নেমে গেল। সবার আগে চলছে জিনিয়া। একটু পেছনে জুলেখা এবং তার ঠিক পেছনে মালেক। জিনিয়া লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে, গুনগুনিয়ে একটা গানও গাইছে। উত্তরের ঝর্নাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। চাঁদের আলোয় ওদের তিন জনকে খুব সুন্দর লাগছে। জিনিয়া বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মালেক এবং জুলেখা পাশাপাশি হাটছে, ধীরে ধীরে। দূর থেকেও বুঝতে পারছে মিজান, ওরা কথা বলছে, মাঝে মাঝে নীচু গলায় হাসছে। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটল। খামাখা কত ভয় পেয়েছিল সে। ভেবেছিল জুলেখার সাথে কত কি সমস্যা হবে ভাই বোনের। অথচ দেখ, কত সহজে বন্ধু হয়ে গেছে ওরা। বয়েসের একটা ব্যাপার আছে। অকারণে এতো দিন রাগ করেছিল দুই ভাইবোন। ওদেরই ক্ষতি হয়েছে। পরক্ষনেই আরেকটা চিন্তা তাকে গ্রাস করল। সন্দেহ নেই, এখন যে মেয়েটিকে ওরা দেখছে সে

হচ্ছে জুলেখা। চাঁদনী হঠাৎ কোথায় উধাও হল কে জানে? কিন্তু সে যখন ফিরে আসবে তখন কি হবে?

একটু পরেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ওরা। ঘন গাছপালার ভেতরে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল যেন। মনে মনে একটু অস্থির বোধ করছে মিজান। চাঁদের আলো থাকলেও বনের মধ্যে নজর বেশী দূর চলে না। ওদের একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া, জুলেখার সাথে ওদেরকে এভাবে যেতে দেয়াটাও হয়ত ঠিক হয় নি। যদিও এখানেই বড় হয়েছে ওরা, এই বন-জঙ্গল, ঝর্না, পায়ে চলা পথ সবই ওদের নখদর্পনে, কিন্তু অনেক দিন হল এভাবে ওরা এই পথে হাঁটে নি, বিশেষ করে রাতে। জুলেখা মাঝে মাঝেই যায়। সে সাথে থাকায় একদিকে সাহস পাচ্ছে, অন্যদিকে ভয়ও হচ্ছে। যদি কোন কারণে চাঁদনী ফিরে আসে, তখন কি হবে কে জানে? মিনিট পনের পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ডেকের উপর হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করল মিজান। তার ইচ্ছে হচ্ছে সেও ওদের পিছু পিছু যায়। যতই সময় যাচ্ছে ততই অস্থিরতা বাড়ছে তার। পনের থেকে পঁচিশ, পয়ত্রিশ, চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। ওদের ফিরে আসার কোন লক্ষন নেই। মিজান জিনিয়াকে একটা টেকস্ট পাঠাল। - 'কোথায় তোরা? এখন ফিরছিস না কেন?'

মিনিট খানেক পেরিয়ে গেল। কোন উত্তর এলো না। এবার মালেককে টেকস্ট করল। - 'মালেক, বাসায় ফিরে এস'।

এবারেও কোন উত্তর এলো না। আর ধৈর্য রাখতে পারল না মিজান। জিনিয়াকে ফোন করল। ফোন বাজছে। ধরল না কেউ। চারবার বাজার পর ভয়েস মেইলে চলে গেল। ঘামতে শুরু করেছে মিজান। তার দুঃস্বপ্নই কি শেষ পর্যন্ত সত্যি হল? মালেককে ফোন করতে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা মেসেজ এলো। চার-পাঁচটা ছবি পাঠিয়েছে জিনিয়া। আলো আধারীতে খুব পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, সে ওয়ালনাট গাছটাতে চড়ে, একটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে, দুই হাত শূন্যে তুলে হাসছে, মাটি থেকে ঠিক কত উঁচুতে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐ গাছটাকে খুব ভালো করেই চেনে মিজান। সবচেয়ে নীচু ডালটাই ফুট দশেক উঁচু। জিনিয়া গাছে চড়তে পছন্দ করত। ঝটপট ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঠে যেতে পারত। কিন্তু বড় হবার পর সে কখন ঐ গাছে ওঠে নি। ছেলের উপর রাগ হল মিজানের। মালেকের উচিৎ ছিল জিনিয়াকে থামানো। পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

মনস্থির করে ফেলল মিজান। ফ্লাশ লাইটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল বেসবল ব্যাটটাও নেবে, পরে সিদ্ধান্ত পালটাল। তাকে ব্যাট হাতে দেখলে জিনিয়াটা আবার হাসাহাসি শুরু করবে। দেখা যাবে ছবি তুলে সারা দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। পায়ে জুতা গলিয়ে, ফ্লাশ লাইটের আলো চারদিকে ফেলতে ফেলতে, জোর কদমে ওয়াল নাট গাছটার দিকে হাঁটতে থাকে মিজান। কিছু কিছু জায়গায় এখনও পানি জমে আছে। প্যান্টটা ভিজল। তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। হাঁটতে হাঁটতেই জিনিয়াকে টেকস্ট করল – 'যলদি নীচে নাম। পড়ে যাবি'।

কোন উত্তর এলো না। হাঁটার জোর বাড়াল মিজান। পানির কলকল ছুটে যাবার শব্দ কানে আসছে। পুকুরের পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে আলো ফেলছে সে। অন্ধকার তার পছন্দ নয়। রাতে এই জঙ্গলে সে কবে শেষ এসেছে মনে করতে পারে না। কাছাকাছি পৌঁছে নাম ধরে কয়েকবার ডাকল মিজান। কোন জবাব এলো না। ওয়ালনাট গাছটার নীচে গিয়ে কাউকে দেখল না । চারদিকে আলো ফেলে ভালো করে দেখল। তাকে আসতে দেখে চুপটি করে কোথাও লুকিয়ে যায়নি তো? গুহাটার ভেতরেও খুঁজল। কারো কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তবে কি ওরা ফিরে গেল? যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফেরে নি। ফিরলে মিজানের সাথে দেখা হত। নিশ্চয় ঘুরে জঙ্গলের অন্যদিক দিয়ে বের হয়েছে। কম করে হলেও এক কিলোমিটার বেশী হাঁটা পথ। জঙ্গলও ওদিকটাতে ঘন। কি করবে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করল মিজান। ওদের পিছু পিছু না যাওয়া ছাড়া উপায় কি? মাঝপথে রণে ভংগ দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব না । ছেলেমেয়ে দুটোর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। ফ্লাশ লাইট বাগিয়ে ঘুর পথেই যাত্রা করল মিজান। সাহস পাবার জন্য একটা মোটাসোটা লাঠিও হাতে তুলে নিল।

শ' খানেক গজও যেতে পারে নি, ভেজা,পিচ্ছিল মাটিতে পা হড়কে ধপাস করে পড়ল, ফ্লাশ লাইট ছিটকে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে গড়াতে গড়াতে ফুট দশেক দুরের এক বিশাল গাছের গুড়িতে জোরে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে দু' চোখে অন্ধকার দেখল সে।

ঠিক কতক্ষন গেছে মিজান জানে না। চোখ খুলে দেখল চারদিকে অন্ধকার। উপরে, গাছের ডগায় চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি। মাথা ঝেড়ে ওঠার চেষ্টা করতে গেল, পারল না। মাথাটা ঘুরে উঠল। তার বয়েস হচ্ছে। নিজের কাছে স্বীকার করল। পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটাকে বের করল। পাওয়ার নেই। নিশ্চয় নিচে পড়ার সময় শরীরের নীচে চাঁপা খেয়ে কিছু একটা গেছে। মাটিতে আছড়ে পিছড়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেই সময় জিনিয়া এবং মালেকের কণ্ঠ কানে এল। "বাবা! বাবা!"

মিজান চীৎকার করে উত্তর দিতে গিয়েও পারল না, মাথাটা আবার ঘুরে উঠল, ধপাস করে মাটিতে পড়ল সে। দু' চোখে আবার অন্ধাকার নেমে এল।

যখন চোখ খুলল, মিজান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। ঘড়ি দেখল। রাত বারোটা। চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নীচে নামল। এখনও দূর্বল লাগছে, কিন্তু হাঁটা চলা করতে সমস্যা হল না। ভেড়ানো দরজাটা খুলে বাইরে করিডোরে পা রাখল। জুলেখার কামরা থেকে খুব হৈ চৈয়ের শব্দ কানে এল। মনে হচ্ছে জিনিয়া এবং মালেক তার সাথে খুব চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। নিঃশব্দে হেঁটে ঘরের ভেতর উঁকি দিল মিজান। মেঝেতে বসে তিনজন ক্যারাম খেলছে। কত কাল পরে ক্যারাম বোর্ডটা বের হল। কোথায় ছিল তার মনেও নেই। ছোট থাকতে মায়ের সাথে খুব খেলত দুই ভাইবোন। মিজান খেলাধুলায় কখনই খুব একটা আগ্রহী ছিল না। ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক। ওকে দেখে দৌড়ে এল জিনিয়া। "বাবা! উঠে গেছ তুমি? এমন সমস্যা কর না? তোমাকে জঙ্গলের মধ্যে কে যেতে বলেছে? তোমাকে খুঁজে পেতে আমাদের কত সমস্যা হয়েছে জান?"

মিজান গম্ভীর গলায় বলল, "তুই গাছে উঠেছিলি কেন?"
"তো কি হয়েছে? আমি তো সব সময়েই গাছে উঠতাম। আজকে উঠলাম তোমাকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্য।" খিল খিল করে হাসল জিনিয়া। তার সাথে গলা মেলাল জুলেখা। নীল রঙের একটা শাড়ী পরেছে সে। চুল খোপা করেছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে তাকে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মত।
মালেক উঠে এল। "বাবা, তুমি বিশ্রাম নাও। মাথায় একটু ব্যাথা পেয়েছ বোধ হয়। খুব খারাপ না। একটু ফুলে গেছে। চল, আমি তোমাকে তোমার ঘরে দিয়ে আসি। একটা লম্বা ঘুম দাও, সকালে উঠে ভালো অনুভব করবে।"

ছেলেকে বাঁধা দিল মিজান। "তোকে আসতে হবে না। আমি এখন ভালো আছি। তোরা খেল। আমি একটা ব্যাথার অষুধ খেয়ে বিছানায় চলে যাচ্ছি।"
জুলেখাকে আরেক নজর দেখে নিজের ঘরে ফিরে গেল মিজান। জুলেখা তার দিকে হাসি মুখে একবার তাকাল। কিছু বলল না। তাকে দেখে খুব সুখী মনে হচ্ছে। প্রতিদিন যদি তাকে এইভাবে দেখতে পেত তাহলে মিজান আর কিছু চাইত না। জিনিয়া ভাইকে বসতে বলে মিজানের সাথে এলো। অষুধ খাওয়াল, বিছানায় শোয়াল, ভালো করে চাদর গুজে দিয়ে গুড নাইট বলল। যাবার আগে লাইট নিভিয়ে, দরজা টেনে দিয়ে গেল। চাঁদের

আলো পর্দা উপচে ভেতরে এসে পড়েছে। আনমনে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মিজান। জুলেখাকে এনেছিল নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করতে, ভুলেই গিয়েছিল জুলেখার নিঃসঙ্গতা কে দূর করবে?

আঠার

পরদিন দুপুরের দিকে অবিনেশের ফোন এলো। রহমত হোটেলের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ সারছিল। আগের দিন সারাটা দিন অবিনেশের ওঝার জন্য অপেক্ষা করেছে, কোন লাভ হয় নি। বদমাস ব্যাটা যোগাযোগ করে নি। ইন্টারনেটে গিয়ে কিছু খোঁজ করেছে। লাভ হয় নি। শহরের মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ কিছু বলতে পারে নি।
অবিনেশ ফোনেই চেঁচিয়ে বলল, "রহমত ভাই, খবর তো পাওয়া গেছে। যলদি হোটেলে ফিরে আসেন। আলাপ আছে।"
বোঝা গেল ভালো খবর আছে। খাওয়া দাওয়া ফেলে ছুটল। হোটেলে ঢুকতেই অবিনেশের সাথে দেখা। সে তার অপেক্ষাতেই ছিল। গলা নামিয়ে বলল, "ব্যাটার সাথে কথা হয়েছে। মোল্লাকে চেনে। বলল সে নাকি ওঝাদের বাপ। আপনার কামরায় যান, আমি আসছি।"
রহমতের প্রায় পিছু পিছু এলো অবিনেশ। বোঝা গেল খবরটা না দেয়া পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছে না। কামরায় ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এক গাল হাসি নিয়ে বলল, "আপনার ভাই

কপালটা ভালো, আমার হোটেলে এসে উঠেছিলেন। আমি না থাকলে মোল্লার হদিস পেতেন?"

রহমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করল না। "যাদবপুরটা কোথায় জানা গেছে?"

ফিক করে হাসল অবিনেশ। "কিসের যাদবপুর? কোন যাদবপুর-টুরে আপনার যেতে হবে না। আমার ওঝা মোল্লাকে খুব ভালো মত চেনে। খুব সম্মান করে। তার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য জেলায়। জুলেখার বাবা মতি আলী যখন একজন ভালো ওঝার খোঁজ করছিলেন, এই লোকই মোল্লাকে খবর দেয়। বুঝলেন ব্যাপারটা?"

অবিনেশ দাঁত বের করে হাসছে, কৃতিত্বের হাসি। রহমতকে মনে মনে স্বীকার করতে হল, ভদ্রলোক একটা কাজের কাজ করেছে। এখন মোল্লাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানলেই সে তার হিসাব কিতাব চুকিয়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, এখানে হাবার মত বসে থাকতে তার ভালো লাগছে না। এই মোল্লা ব্যাটাকে পেলেই তো হল না, তাকে কিভাবে কানাডা নেয়া যাবে সেটাও একটা ভাবনার বিষয়।

রহমত তাড়া দিল, "কি জানলেন বলুন দাদা। কি খবর পেলেন? মোল্লা ইমামকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

অবিনেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, "ভগবানের কি কৃপা! আপনার মোল্লা ইমা, গত বছর আমেরিকা চলে গেছে এক মসজিদের ইমাম হয়ে। তার এলাকার কিছু মানুষ এক শহরে নতুন মসজিদ বানিয়েছিল। তার এদিকে এতো নাম ডাক। তাকে ইমামের কাজ দিয়ে নিয়ে গেছে। এবার বলুন, এটা ভালো হল না খারাপ হল?"

রহমত হাসল। "খবর তো খুবই ভালো। কিন্তু আমেরিকায় কোথায় থাকে? সেসব কিছু বলতে পারল?"

"টেক্সাসে। ডালাসে। ঠিকানা টা বলতে পারে নি কিন্তু ওখানে আর কয়টাইবা মসজিদ আছে? এ তো মুসলিম দেশ না যে মোড়ে মোড়ে মসজিদ থাকবে। ঠিক বলেছি কিনা?" তার কথা মানতেই হল। ওখানকার ইসলামিক কোন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করলে তারা হয়ত মোল্লার খোঁজ দিতে পারবে। ইন্টারনেটে গিয়ে সামান্য খুঁজতেই একটা সংগঠনের ফোন নাম্বার পাওয়া গেল। কিন্তু টেক্সাসে এখন রাত। মনে হয় না কাউকে পাওয়া যাবে। তবুও কল করল। কেউ ধরল না। ভয়েস মেইলে চলে গেল। একটা মেসেজ রাখল রহমত। তার ফোন নাম্বারটা রেখে দিল। 'মোল্লা ইমামকে খুবই প্রয়োজন। যদি তার খবর জানা থাকে তাহলে রহমতকে যেন একটা খবর দেয়া হয়। জীবন মরনের ব্যাপার'।

অবিনেশের হোটেলের বিল সব শোধ করে, দিদারকে মোটা অংকের বখশিশ দিয় গাড়ী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল রহমত। এখানকার কাজ তার শেষ হয়েছে। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে টরন্টো ফিরবে নাকি ডালাস যাবে মোল্লাকে খুঁজে বের করতে। মোল্লার সাথে যোগাযোগ করতে না পারা পর্যন্ত ক্ষান্ত দিলে চলবে না।

ঢাকা পৌঁছাতে রাত হল। একটা ভালো হোটেলে গিয়ে রুম নিল। অবিনাশের হোটেল রাজা রানীর তুলনায় স্বর্গ। তবে হোটেল যেমনই হোক, অবিনাশ মানুষটা চমৎকার। আবার কখন গেলে সে নির্ঘাত তার হোটেলেই গিয়ে আস্তানা গাড়বে।
মাত্র হাত মুখ ধুয়ে রুম সার্ভিস অর্ডার দেবে, এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। অচেনা নাম্বার। স্থানীয় নয়। ধরল। "হ্যালো!"
"আপনি রহমত সাহেব বলছেন?" একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।
"জ্বী। আপনি?" রহমত আশা করছে টেক্সাসের ইসলামিক কেন্দ্র থেকে কেউ হবে।
"আমি মোল্লা ইমাম বলছি। আপনি সেন্টারে একটা মেসেজ রেখেছিলেন। আমাকে কেন খুঁজছেন বলুন তো?"
রহমতের সারা মুখ নিঃশব্দ হাসিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। তার কপাল দেখা যাচ্ছে ক'দিন ধরে খুব ভালো যাচ্ছে। সে দ্রুত বলল, "মোল্লা সাহেব, আপনাকে আমাদের ভীষণ দরকার। বেশ কিছুদিন আগে আপনি একটি মেয়ের চিকিৎসা করেছিলেন..."
"জুলেখা। জুলেখার কথা বলছেন?"
"আপনার মনে আছে তাহলে?"
এক মুহূর্তের নীরবতা। "আমি জেনেছি ও বিয়ে করে টরন্টো এসেছে। চাঁদনী নিশ্চয় এখনও ওর সাথেই আছে। অসম্ভব পাজী জ্বীন। আমি জীবনে খুব কম হার মেনেছি। কিন্তু তার মধ্যে চাঁদনী একজন।"
রহমতের বুক ভাঙার জোগাড় হল। মোল্লা নাকি ওঝাদের বাপ। সে যদি হার মেনে থাকে তাহলে আর কার কাছে যাওয়া যাবে। "আপনি চাঁদনীকে তাড়াতে পারেননি?"
"পারলে তো আপনারা কোন সমস্যায় পড়তেন না," অন্য দিক থেকে শান্ত কণ্ঠের উত্তর এল। "জুলেখার জীবনটাও এমন ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হত না।"
রহমত কণ্ঠস্বরে খানিকটা আকুতি মিশিয়ে বলল, "আপনার সাহায্যের আমাদের খুবই দরকার। জুলেখা আমার বন্ধুর স্ত্রী। তাকে নিয়ে আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি। আমি গ্রামে পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আপনার খবর পেলাম।"
"নিশ্চয় দাই মার কাছ থেকে জেনেছেন। মতি মিয়া – জুলেখার বাবা, খুব গোপনীয়তা চেয়েছিলেন। জুলেখা কোথায়?"
"এজাক্সে - টরন্টোর কাছাকাছি একটা শহর। আপনি কি কিছুই করতে পারবেন না?"
একটু নীরবতা। "হয়ত পারব। গতবার যখন চেষ্টা করেছিলাম, আমার ব্যার্থ হবার পেছনে জুলেখারও একটা বড় ভুমিকা ছিল। চাঁদনীর সাথে সে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নিজেই তাকে যেতে দিতে চায় নি। সেক্ষেত্রে জ্বীন তাড়ানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে জ্বীন যদি দুষ্ট হয় । কিন্তু আমি আরেকবার চেষ্টা করতে চাই। তাছাড়া..."
মোল্লাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে রহমত বলল, "তাছাড়া?"
"আমার হাতে একটা তুরুপের তাস আছে এখন। আমাকে আপনার বন্ধুর ঠিকানা দিন। সামনে পুর্ণীমা আছে। সেই সময়ে একটা চেষ্টা করা যায়।"

রহমত অবাক হয়ে বলল, "পুর্ণীমা থাকলে কি সুবিধা?"
"চাঁদনী খুব রোমান্টিক। পুর্নীমার রাতে সে মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। আমার ধারণা তাকে তাড়ানোর সেটাই সবচেয়ে ভালো সময়। তার শক্তি এবং ক্ষমতা হয়ত একশ' ভাগ থকবে না।" মোল্লা বলল।

রহমত একটু দ্বিধা করে বলল, "শুনলাম চাঁদনীর প্রেমিককে আপনি বশ করেছিলেন। সেটা কি সত্য?"

"আটকে রেখেছি," মোল্লা বলল। "তার নাম জমিন। আমার তুরুপের তাস। গ্রামে গিয়ে আর কি শুনেছেন?"
রহমত একটু ভাবল। বাশারের প্রসঙ্গ তোলাটা কি ঠিক হবে? তার মৃত্যুর জন্য মোল্লা কত টুকু দায়ী ছিল বলা শক্ত। সে-ই ভয়েই কি সে বাংলাদেশ ছেড়েছে? প্রসঙ্গটা আপাতত চেপে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল সে। মোল্লা উধাও হয়ে যেতে পারে।

তার দীর্ঘ নীরবতা দেখেই কিছু একটা আন্দাজ করল মোল্লা। "জানি কি ভাবছেন। কিন্তু বাশারের মৃত্যুতে আমার কোন হাত ছিল না। জমিনকে আমি যখন বশ করি, বাশার তখনও সুস্থই ছিল। আমি চলে আসার পর বাবরই তাকে মেরেছে। মতি মিয়ার ভাড়াটে গুন্ডা। "

রহমত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। নাসেরের কথা মনে হল। বেচারা জানেও না বাবরই ওর ভাইয়ের খুনী। রহমতের কিছুই করার নেই।
"আপনি কি আসবেন?" রহমত জানতে চাইল।
"হ্যাঁ। চাঁদনীর একটা ব্যাবস্থা আমাকে করতেই হবে। তার জন্য জুলেখার জীবনটা নষ্ট হচ্ছে।" মোল্লার কণ্ঠে দৃঢ়তা। মনে হল সে সত্যিই সাহায্য করতে চায়।

রহমত তাকে নিজের এবং মিজানের ঠিকানা দিল। দু' দিন পর টরন্টো পৌঁছাবে সে। মোল্লা তখনই আসবে। রহমতকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করল সে। চাঁদনী সমস্যার সমাধান সে এবার করেই ছাড়বে।

উনিশ

রাতে ঘুমাতে পারল না মালেক। মিজান শুতে যাবার পর জুলেখার ঘরে সে এবং জিনিয়া আরও ঘণ্টা খানেক ছিল। কিছুক্ষন কেরাম খেলা চলে, কিছুক্ষন ছবির এলবাম দেখা হয়, নায়লার গানের ভিডিও দেখা হয়। এখানে আসবার আগে কল্পনাতেও ভাবে নি মালেক এমন চমৎকার সময় কাটবে তাদের। বাবার কথা শুনে যা মনে হয়েছিল বাস্তবে তার কোন নিদর্শনই দেখে নি সে। এতো অল্প সময়ের পরিচয়েও তার মনে হচ্ছে সে যেন এই মেয়েটিকে কত দিন ধরে চেনে! নিজের কাছে সত্যটা স্বীকার করতে তার কষ্ট হলেও মনে হচ্ছে এমনই একটা মেয়েকে সে সারা জীবন ধরে খুঁজছিল। শান্ত, ধীর, মায়াময় কিন্তু

প্রানোচ্ছল, প্রকৃতি প্রেমিক। জুলেখার সাথে প্রথম দেখাতেই তার কি যেন এক অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেছে। কাল রাতে জিনিয়া থাকলেও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সে লক্ষ্য করেছে জুলেখা তাকে আড় চোখে খেয়াল করছে। সে নিজেও জিনিয়ার অগচোরে জুলেখাকে দেখেছে। আকাশী নীল শাড়িতে এতো সুন্দর লাগছিল! সারা রাত বিছানায় ছটফট করেছে। যতখানি এই অবোধ ভালো লাগাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে, ঠিক ততখানিই অপরাধবোধে ভুগেছে। জুলেখা পৃথক কামরায় থাকে, যার অর্থ মিজানের সাথে তার হয়ত শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু জুলেখার প্রতি তার দূর্বলতার কথা মিজান যদি ঘুনাক্ষরেও টের পায় তাহলে সে নিশ্চয় অসম্ভব কষ্ট পাবে।
পাশের ঘরেই জিনিয়া শুয়েছে। একটু পর পরই তার নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে মালেক। ঘুমের মধ্যে খুব নড়াচড়া করে জিনিয়া, সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। প্রায়ই জোরে জোরে কথাও বলে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক হাসি ঠাট্টা হত। জিনিয়া অবশ্য কখনও স্বীকার করত না। প্রমাণ করবার জন্য মালেক একবার ভিডিও করল। সেটা দেখে জিনিয়া ঠোঁট উলটে বলল, "বানোয়াট ভিডিও"।
জিনিয়ার পরের ঘরটা জুলেখার। সে কি শুয়েছে? মেয়েটাকে আবার দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে। মনে মনে অসম্ভব লজ্জিত বোধ করছে। এই বয়েসে এ কি ছেলামানুষী অনুভূতি! এখানে বেশীদিন থাকাটা ঠিক হবে না। সময়ের সাথে সাথে তার দূর্বলতা আরোও বাড়তে পারে। কিন্তু ঝট করে চলে যাওয়াটাও সহজ হবে না। বাবা মন খারাপ করবে। জিনিয়া ক্ষেপে যাবে। সে-ই তাকে নিয়ে এসেছে। সহজে যেতে দেবে না।
হঠাৎ দরজায় একটা টোকা পড়ল। নিজের অজান্তেই ঘড়ির দিকে তাকাল মালেক। রাত তিনটা। এই সময়ে কে আসবে? বাবা? হয়ত আবার ঘুম ভেঙে গেছে। মালেকের সাথে কথা বলতে চায়।
"কে?" গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।
কোন উত্তর এলো না কিন্তু এবার দুটা মৃদু টোকা পড়ল। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল মালেকের। সে যা ভাবছে তা কি হতে পারে? জিনিয়া নয়। সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মিজান নয়। হলে এতক্ষনে নিজের পরিচয় দিত। দ্রুত বিছানা ছাড়ল। দরজাটা সামান্য খুলতেই জুলেখাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নীল শাড়ীটা এখনও পরে আছে, চুলের খোপা ছেড়ে দিয়েছে। কালো চুলের রাশী পিঠময় ছড়ানো। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে মালেকের। জুলেখা এতো রাতে এখানে কেন? মালেকের মনের কথা কি সে পড়ে ফেলেছে?
জুলেখা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। করিডোরে নাইট লাইটটা জ্বলছে। সেই আলোতেও তার গভীর কালো চোখের কৃষ্ণতা মনে দোলা দিয়ে যায়। তার শরীরের মিষ্টি একটা গন্ধ মালেকের সব ইন্দ্রিয়কে ছুঁয়ে যায়। সে কোন রকমে ফিসফিসিয়ে বলে, "জুলেখা!"
"ঘুম আসছে না!" জুলেখাও ফিসফিসিয়ে বলে।

"আমারও না।" মালেক লজ্জিত কণ্ঠে বলে।
কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। "তোমার বাবার সাথে আমার কোন দৈহিক সম্পর্ক হয় নি," হঠাৎই বলে জুলেখা।
মালেক কি বলবে বুঝতে পারে না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।
"আমার জীবনটা অভিশাপে ভরা," বিড়বিড়িয়ে বলে জুলেখা। "তোমরা সবাই তার ভাগী হলে। তুমিও। তোমার কিছু হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"
তার মনের মধ্যে যে আবেগের ঝড় চলছে, জুলেখাও যে তার অংশীদার, জেনে নিজেকে আর ততখানি অপরাধী মনে হয় না মালেকের। তার মনে হয় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটির সাথে তার জীবন যেন একই ছন্দে বাঁধা পড়ে গেছে। তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সব যেন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল। জুলেখার একটা হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে এনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে। "এসব কি বলছ, জুলেখা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"
তার হাতের ভেতরে জুলেখার হাতখানা আবেগে থর থর করে কাঁপছে। মালেকের চোখে চোখ রাখল সে। "তোমার বাবা তোমাকে সব বলে নি?"
"কি বলেনি?" মালেকের কণ্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।
জুলেখা এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। "থাক, তুমি নাই বা জানলে। আমার অভিশাপ আমাকেই বহন করতে হবে।"
মালেক ফিসফিসিয়ে বলল, "দুটি মন যখন কাছাকাছি আসে, নিশ্চয় নিয়তির কোন উদ্দেশ্য থাকে। আমাকে সব খুলে বল।"
জুলেখার সমস্ত শরীর কাঁপছে। "কেন এলে তুমি? মনে হয় যেন আমার সারা জীবন তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম।" মালেকের বুকে মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। নিঃশব্দে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মালেক। কিছু বলে না।
হঠাৎ করেই দরজা খুলে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে যায় জুলেখা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে মালেক। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবার আগে মালেকের দিকে নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে জুলেখা, আলতো করে হাত নাড়ে। মালেক বিছানায় ফিরে যায়। তার মনের জমাট বাঁধা অপরাধবোধের পাশাপাশি অসম্ভব ভালো লাগার একটা অনুভূতি প্রজাপতির মত পাখা মেলে খামখেয়ালির মত উড়তে থাকল। এই অভিনব অনুভুতিটাকে সে অনেকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল।

পরবর্তি দুটা দিন যেন ফুড়ুত করে উড়ে গেল। মিজান বাসাতেই ছিল। তার শরীরের ব্যাথা বেদনা কিছু কমলেও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে। ছেলেমেয়েরা থাকায় জুলেখার সময় কাটছে চমৎকার। তাকে নিয়ে মিজানের চিন্তার কোন কারণ নেই। ভেবেছিল মাইক এসে ছাদের খুঁটিনাটি কাজগুলো করে দিয়ে যাবে। সে

এলো না দেখে ফোন করল মিজান। ধরে নি। ব্যাটা বোধহয় আবার মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছে কাজটা খুব জরুরী নয়। পরে করলেও চলবে।
শনিবারে মালেক এবং জিনিয়ার অফিস ছুটি। তারা জুলেখাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেল। মলে যাবে, বাইরে খাবে, মুভি দেখবে – অনেক প্ল্যান। জিনিয়া তার একটা জিন্সের ট্রাউজার এবং শার্ট পরিয়েছে জুলেখাকে। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। মুগ্ধ হয়ে দেখেছে মিজান। তারা মালেকের গাড়ীতে উঠে হৈ চৈ করতে করতে চলে গেল।

রহমতকে ফোন লাগাল মিজান। তার ফ্লাইট পরদিন ভোরে। তার আগে সুবিধামত কোন ফ্লাইট পায় নি। সোমবার সকালে টরন্টো পৌঁছাবে। মোল্লা আসবে সোমবার রাতে। এজাক্সেই কোন একটা হোটেল উঠবে। রহমতের সাথে যোগাযোগ করবে। পুর্নিমা আসছে। তখনই নাকি সবচেয়ে দুর্বল থাকে চাঁদনী। সেই রাতেই মোল্লা তার মুখোমুখি হবে।
মালেক এবং জিনিয়া আসার পর যা যা ঘটেছে বন্ধুকে জানাল মিজান। জুলেখাকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অনভিপ্রেত কিছু হয় নি। সেক্ষত্রে তাদের কি আরকেটু অপেক্ষা করা উচিৎ? জুলেখা সুখী থাকলে চাঁদনী হয়ত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মোল্লার কি কিছু করবার সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে? রহমত অবিশ্বাস নিয়ে বলল, চাঁদনী নিজের থেকে কখন জুলেখাকে ছেড়ে যাবে না। সে আনন্দে আছে দেখে ক'টা দিন একটু চুপচাপ আছে। আবার হঠাৎ করে ছোবল দেবে।

বন্ধুর কথা মেনে নিল মিজান। মোল্লাকে যেহেতু পাওয়া গেছে, এই সমস্যা চিরতরে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। দু'জনে মিলে বিস্তারিত পরিকল্পনা করল। খুব সতর্ক থাকতে হবে। চাঁদনী যেন ঘুনাক্ষরেও টের না পায়। মিজান অনিশ্চিত বোধ করছে। ওঝাদের কর্মকান্ডে তার কখনই প্রগাড় বিশ্বাস ছিল না। তাদের সম্বন্ধে অনেক মন্দ কথা শুনেছে। মোল্লার হাতে জুলেখাকে ছেড়ে দিতে তার মন সায় দিচ্ছে না। সে কি ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করবে জানতে চেয়েছিল। রহমত বলতে পারে নি। চাঁদনীকে বিতাড়িতে করতে গিয়ে জুলেখাকে সে কোন শারীরিক নির্যাতনের শীকার হতে দিতে পারবে না। তেমন কোন সম্ভাবনা দেখলে সে সাথে সাথে মোল্লাকে থামিয়ে দেবে।
রাতে বেশ দেরী করে ফিরল মালেকরা। মাঝে একবার ফোন করে বাবার খবর নিয়েছে জিনিয়া। তখনই জানিয়েছিল তারা মুভি দেখতে যাবে। ফিরতে দেরী হবে। রাত এগারোটার তারা যখন ফিরল না, বাধ্য হয়ে ফোন করল মিজান। কেউ ধরল না। চিন্তায় পড়ে গেল। কোন বিপদে পড়ে নি তো ওরা? চাঁদনী কিছু করেনি তো? পুলিশে খবর দেবে? কি বলবে? অস্থির হয়ে সারা বাড়ীময় পায়চারী করতে লাগল মিজান।

তারা ফিরল রাত একটায়। মিজান তখনও জেগে আছে দেখে জিনিয়া খুব রাগারাগি করল। মিজানের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জানা গেল মুভি দেখার পর জিনিয়াই ওদেরকে

নিয়ে গেছে একটা ড্যান্সিং ক্লাবে। এতো শব্দের মধ্যে ফোনের রিং শোনা তো দুরের কথা, পাশের মানুষ চেঁচিয়ে কথা বললেও শোনা যায় না।
মালেক হেসে বলল, "বাবা, জুলেখার কান্ড দেখলে তুমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে। মনে হচ্ছিল যেন ওকে আমরা মঙ্গল গ্রহে নিয়ে গেছি। দুই কানে হাত দিয়ে সারাক্ষণ আমার পেছনে লুকিয়ে থাকল। ভয় হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যায় কিনা।"

জুলেখা লজ্জা পেয়ে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল। জিনিয়া বলল, "বাবা, ড্যান্স ফ্লোরে কি হয়েছে শোন। আমরা ওকে জোর করে নিয়ে তুলেছি। নাচতে তো পারে না, ভাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এক লোক এসে ওর সাথে নাচার চেষ্টা করছে। ইয়া লম্বা, চওড়া। রেগে গিয়ে জুলেখা তাকে একটা ধাক্কা দিল। ব্যাটা বোধহয় মাতাল ছিল। একেবারে উল্টে পাল্টে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সবাই লোকটাকে নিয়ে এমন হাসিঠাট্টা শুরু করল যে বেচারা দৌড়ে পালাল।"
মালেক হাসতে হাসতে বলল, "জুলেখা কিন্তু তেমন জোরেও ধাক্কা দেয় নি। ও যেমন রোগা, ওর ধাক্কা খেয়ে কেউ এমন ছিটকে যেতে পারে ভাবাই যায় না। ওর গায়ে ভালোই জোর আছে। দেখে বোঝা যায় না।"
মিজান মৃদু কণ্ঠে বলল, "ওকে নিয়ে তোদের ক্লাবে যাওয়া উচিৎ হয় নি। গ্রাম থেকে এসেছে। এই সব কখন দেখেছে? ভবিষ্যতে কোথাও যাবার আগে আমাকে একটু জানাস। আমিও চিন্তার মধ্যে ছিলাম। রাত একটা বাজে, সমানে ফোন করছি, কেউ ধরছিস না। আরেকটু হলে আমার হার্ট ফেল হত।"
জিনিয়া খোঁচা দিয়ে বলল, "হার্টের যদি এমন খারাপ অবস্থা তাহলে এমন কচি মেয়েকে বিয়ে করেছিলে কেন? এরপর তোমাকে নিয়ে ড্যান্স ক্লাবে যাবে।"
ভ্রুকুটি করে নিজের ঘরে ফিরে গেল মিজান। কিছু বলল না। মেয়েটা যে এসেছে, তাতেই সে খুশী। তার হুল ফোটান কথাবার্তা গায়ে মাখার কোন দরকার নেই। যেমন মেজাজ, কোন কথায় রাগ হলে এখনই জিনিষ পত্র গুছিয়ে রওনা দেবে।
জিনিয়া ক্লান্ত ছিল। নিজের কামরায় গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। জুলেখা পোষাক পালটে নীচে গিয়ে দেখল মালেক ব্রেকফাস্ট কাউন্টারে চুপচাপ বসে আছে। ওকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
"ঘুমাবে না?" জুলেখা মৃদু গলায় বলল।
মাথা নাড়ল মালেক। "ঘুম আসবে না। কাল সারা রাত ঘুমাতে পারি নি।"
জুলেখা ঠোঁট টিপে হাসল। "কেন?"
মালেক ফিসফিসিয়ে বলল, "মনে হয় প্রেমে পড়েছি।"
জুলেখা মেঝেতে চোখ রেখে বলল, "আমারও ঘুম আসে নি কাল। একদম না।"
পেছনের স্লাইডিং ডোরে ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো উপচে পড়ছে ভেতরে। রান্নাঘরের আলোটা জ্বলছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা নিভিয়ে দিল মালেক। আঁধারে ঝিলিক দিয়ে উঠল রুপালী জ্যোৎস্না। জুলেখা চকিতে একবার উপরের দিকে তাকাল। বোধহয় নিশ্চিত হতে চাইল মিজান কিংবা জিনিয়া তাদেরকে দেখছে কি না। তারপর

ছোট ছোট পায়ে হেঁটে গিয়ে স্লাইডিং ডোরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পর্দাটা সরিয়ে দিল। বন্যার পানির মত ছুটে এলো মায়াবী আলোর রাশি, মুহূর্তের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

"কি সুন্দর, তাই না?" বিড়বিড়িয়ে বলল জুলেখা।
মালেক তার পাশে এসে দাঁড়াল। "আজ কি পুর্নিমা?"
মাথা নাড়ল জুলেখা। "না। কাল পরশু হবে।"
"বাইরে হাঁটতে যাবে?"
"এখন? উনি এখনও ঘুমান নি। জিনিয়াও জেগে আছে। ওরা দেখবে না?"
মেনে নিল মালেক। ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। "পরে যাবে? সবাই ঘুমিয়ে গেলে?"
মালেকের চোখে চোখ রাখে জুলেখা। "এটা অন্যায়, তাই না?"
মালেক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বন্ধুত্বের মধ্যে তো কোন অন্যায় নেই। আছে?"
ম্লান হাসল জুলেখা। "আমার খুব কাছে যারা আসে, তারা সবাই কষ্ট পায়।"
মালেক মৃদু গলায় বলল, "আমি তো ছেলে মানুষ নই। আমাকে নিয়ে ভয় পেও না।"
জুলেখা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলতো করে মালেকের হাত ধরে। "তোমার সাথে আমার আগে দেখা হল না কেন?"
হেসে ফেলল মালেক। "কারণ তুমি ছিলে বাংলাদেশের কোন একটা গ্রামে, আর আমি ছিলাম কানাডায়।"
জুলেখা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে চাঁপা স্বরে বলল, "ঘন্টা খানেক পরে নীচে এস। হাঁটতে যাব।"
পা টিপে টিপে উপরে উঠে গেল জুলেখা। তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় হারিয়ে যায় মালেক। এই আচমকা বন্ধুত্বের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই বন্ধুত্বে উষ্ণতার সাথে সাথে রয়েছে আগুণের উত্তাপ। তাদের ঘনিষ্টতা কোন অনাকাংখিত দিকে মোড় নেবার আগেই এই সম্পর্কের ইতি টানতে পারলে ভালো হত, কিন্তু তার মন তা চায় না। এই পরিনত বয়েসে যে অপূর্ব অনুভূতি তার সমস্ত হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছে, তাকে সে হেলায় হারাতে চায় না।

মালেক নিজের কামরায় এসে বিছানায় শরীরটা একটু এলিয়ে দিয়েছিল। আগের দিন রাতে বিন্দু মাত্র ঘুম হয় নি। তার পর সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করেছে। ক্লান্ত হয়ে ছিল। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। ঘন্টা খানেক একটু বিশ্রাম নেবে। ততক্ষণে বাবা এবং জিনিয়া ঘুমিয়ে পড়বে। বাইরে এতো সুন্দর জ্যোৎস্না! জুলেখার হাত ধরে আজ সেই জ্যোৎস্নায় সে হাঁটবেই। তার সারা জীবনে সে কোন মেয়ের হাত ধরে এমন ফকফকা চাঁদের আলোয় হাঁটে নি। একটু পর পর ঘড়ি দেখছিল। জুলেখা বলেছিল এক ঘন্টা পরে নীচে যেতে। শুয়ে শুয়ে মেয়েটাকে নিয়ে তার ভাবতে ভালো লাগছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেও না। হঠাৎ উষ্ণ একটা হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল। কোন শব্দ করার আগেই ওর ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁইয়ে ওকে আওয়াজ করতে মানা করল আগুন্তুক। চোখ খুলতে

দেখল - জুলেখা! ওর পাশে বসে আছে। পর্দাগুলো সরিয়ে রেখেছিল মালেক। চাঁদের আলোয় অপূর্ব সুন্দর লাগছে জুলেখাকে। তার শরীরের খুব হাল্কা একটা গন্ধ নাকে আসছে, ভালো লাগছে। ভীষণ আপন আপন লাগছে মেয়েটাকে। মুহূর্তের জন্য মিজানকে তার ভয়ানক হিংসা হয়। এই মেয়েটি কেন মালেকের প্রমিকা, মালেকের স্ত্রী হতে পারে না?

মালেক বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "ওরা ঘুমিয়েছে?"

জুলেখা ফিসফিসিয়ে বলল, "তুমি অনেক ক্লান্ত। ঘুমাও। আমরা কাল হাঁটতে যাব।"

মাথা নাড়ল মালেক। "না, চল যাই। ঘুমিয়েছি। এখন ভালো লাগছে।"

দু'জনে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। পেছনের দরজা খুলে ডেক-এ বেরিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর অনুভূতি গ্রাস করল মালেককে। একটি প্রিয় মানুষের উপস্থিতি, একটুখানি বন্ধুত্ব সব কিছু কেমন আচমকা পালটে দিতে পারে – তার নিজের কাছেই বিশ্বাস হয় না।

জুলেখা তার হাত ধরেছে। তার মধ্যে কোন সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, যেন এই ছেলেটাকে সে কত যুগ যুগ ধরে চেনে, একে সে তার সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে। "কোন দিকে যাবে?"

"তুমি যেদিকে নিয়ে যাবে।" মালেক মন্ত্র মুগ্ধের মত বলল।

"চল, ঝর্নাটার পাশে গিয়ে বসব।" মালেকের হাত ধরে টানল জুলেখা। উত্তর দিকে কিছুদূর এগিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু পাইনের ভেতর দিয়ে গিয়ে ছোটখাট একটা ঢাল বেয়ে নামতেই পানি বয়ে যাবার কুলুকুলু শব্দটা কানে এলো। কিছু ঝোপঝাড় পেরিয়ে, সাবধানে আরেকটু নীচে নামতে পানির পাশে চলে এলো ওরা। একটা বড়সড় পাথরের দিকে মালেককে টানল জুলেখা। পাশাপাশি বসল দু' জন। পানিতে পা ডুবিয়ে দিল। পানি এখনও শীতল, কিন্তু পায়ে ছোঁয়াটা ভালো লাগছে। মালেকের শরীরে হেলান দেয় জুলেখা। মালেকের ভালো লাগে। তার খুব ইচ্ছা হয় এক হাত বাড়িয়ে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরে এই মায়াবী মেয়েটাকে, কিন্তু সাহস হয় না। জুলেখা যেন তার মনের কথা পড়তে পারে। সে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। গলা বাড়িয়ে মালেকের গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ায় জুলেখা। সেই উষ্ণ স্পর্শে সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুত বয়ে যায় মালেকের। দুই হাতে জুলেখাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে তাকে ভরিয়ে দেবার ইচ্ছাটাকে প্রবল মনবল খাটিয়ে চাঁপা দেয়। যেটুকু আপন গতিতে আসে, ততটুকুই সে নেবে। লোভে পড়ে সবটুকু হারাতে চায় না।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল জিনিয়ার। কিছু একটা শব্দ শুনে থাকবে। কেউ কি দরজা খুলল? কিছুক্ষন কান পেতে চুপচাপ শুয়ে থাকল। হাল্কা পায়ের শব্দ কানে এলো। দু' জোড়া। কেউ কি দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল? তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে শুরু করল। বাবাকে ডাকবে? নাকি পুলিশে ফোন করবে? পাশের কামরাতেই মালেক আছে। তার ঘুম পাতলা। ডাকলেই উঠে পড়বে। কিন্তু তার আগে একটু নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল পায়ের শব্দগুলো পেছনে ডেকের দিকে চলে গেল। স্লাইডিং ডোরটা খুলল এবং বন্ধ হল। যার একটাই অর্থ হতে

পারে। বাসার ভেতর থেকে কেউ বাইরে গেল। একজন নয়, দু'জন। আরোও মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর যখন কোন শব্দ কানে এলো না, তখন চুপি চুপি বিছানা ছাড়ল জিনিয়া। যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের করিডোরে এসে দাঁড়াল। মালেকের দরজাটা ভেড়ানো। কৌতুহলী হয়ে হাল্কা করে ঠেলা দিল। ভেতরে কেউ নেই। বিছানা ফাঁকা। বাথরুমে গেছে? বাথরুমটা করিডোরের এক দিকে। দরজাটা হাঁট করে খোলা। সেখানে কেউ নেই। আচমকা একটা উদ্ভট চিন্তা এলো তার মাথায়। কেন যেন মনে হল জুলেখার কামরাও ফাঁকা। দরজার নবটা ঘুরিয়ে সামান্য ধাক্কা দিতে খুলে গেল সেটা। জিনিয়া নরম গলায় 'জুলেখা' বলে ডাকল। কোন উত্তর এলো না। ভেতরে ঢুকে চারদিকে নজর বোলাল। ফাঁকা। জুলেখাও তার ঘরে নেই।

জিনিয়ার বুকটা ধক করে উঠল। কেন যেন আজ সারাদিনই তার মাথায় এই আজব চিন্তাটা ঘুরছিল। তিনজনে এক সাথে ঘুরলেও মালেক এবং জুলেখার মধ্যে কিছু একটা চলছিল। সে ওসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে চায় নি, কিংবা হয়ত তেমন একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা ভাবতেও চায়নি। চুপি চুপি নীচতলায় চলে এলো। স্লাইডিং ডোরের পর্দাটা সরিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল। চাঁদের আভায় সমস্ত প্রাঙ্গণটা যেন আলোয় আলোরন্য হয়ে আছে। অনেক দুরের বস্তুও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মালেক এবং জুলেখাকে পাইনের বনের ভেতর দিয়ে হাত ধরে চঞ্চল পায়ে হেঁটে যেতে দেখল সে। ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেল দু'জন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ওদিকটাতে গেলে ঝর্নার পাশে গিয়ে বসার সুন্দর জায়গা আছে। নিশ্চয় সেখানেই যাচ্ছে। একটা চাঁপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল জিনিয়া। এটাই স্বাভাবিক। মালেক একটা অসম্ভব ভালো ছেলে, যার সমস্ত হৃদয় একট চমৎকার মেয়েকে ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই চমৎকার মেয়েটি যদি জুলেখা হয়, তাহলে সে যে প্রেমে পড়ে যাবে তাতে অবাক হবার কি আছে? জুলেখার মধ্যে কোমলতা, লাজুকতা এবং শান্ততার যে অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে, সেটা তার সহজ সুন্দর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে মালেকের কাছে যে অসম্ভব রকম কামনীয় করে তুলবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নিজের কাছে স্বীকার করতে কষ্ট হলেও জিনিয়াকে মানতে হয়, জুলেখার সাথে তাদের মায়ের যেন কি একটা মিল আছে। সরলতা এবং কমনীয়তার পাশাপাশি একটা দৃঢ়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

চুপি চুপি নিজের কামরায় ফিরে এলো জিনিয়া। এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? জিনিয়া তাদের বাবার বিবাহিত স্ত্রী। বয়েসের তারতম্য, মানসিক বিভেদ, তাদের পৃথক ঘরে বসবাস – এসব সত্বেও নিজের বাবার আইনসংগত স্ত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হলে সেটা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। বাবা তাদেরকে আসতে বলেছিল একটু মানসিক সমর্থন পাবার জন্য, আর এ কি নতুন জটিলতার সৃষ্টি হল! নিজের ভাইয়ের উপর সে রাগ করতে পারে না। সারা জীবন দেখছে এই মানুষটাকে। এমন ভালো মানুষ দ্বিতীয়টা হয় না। জুলেখার মত একটি মেয়ের প্রেমে পড়ার জন্য সে তাকে দোষারোপ করতে পারে না। কিন্তু জুলেখার উপর তার বেশ রাগ হয়। বয়েসী একজন লোককে সে কেন বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল জিনিয়া জানে না। হতে পারে বিপাকে পড়ে করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন সে একজনের বিবাহিত স্ত্রী। মালেকের সাথে

এতখানি ঘনিষ্ট হওয়াটা কি তার ঠিক হচ্ছে? জানাজানি হলে কি লজ্জার ব্যাপারটাই না হবে! বাবার সামনেই বা দাঁড়াবে কোন মুখে?
বোধহয় তার চলাফেরার শব্দে মিজানের ঘুম ছুটে গিয়ে থাকবে। বিছানায় শুয়েই গলা উঁচিয়ে ডাকল, "জিনিয়া, তুই কি হাঁটাহাঁটি করছিস?"
জিনিয়া উঠে মিজানের ঘরে এসে ঢুকল। নিশ্চিত হতে চাইল মিজান যেন আবার কৌতূহলী হয়ে বিছানা ছেড়ে না ওঠে। "একটু পানি খেতে গিয়েছিলাম, বাবা। তুমি ঘুমাও। কিছু লাগবে?"
মিজান বললেন, "না রে। যা, ঘুমা।"
মিজানের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল জিনিয়া। তার মাথাটা ভালো লাগছে না। এ কি সমস্যা? এতো মেয়ে থাকতে মালেক এই মেয়েটার প্রেমেই পড়ল? বেয়াক্কল!

বিশ

মিজান ভেবেছিল পরদিন সবাই মিলে বাসাতেই কিছুক্ষন সময় কাটাবে। ছেলে মেয়েরা আসার পর জুলেখাকে নিয়েই তারা ব্যাস্ত, বাবার সাথে মন খুলে কথা বলার সুযোগই হয় নি। কিন্তু সকালে নাস্তা পর্ব চুকতেই মালেক ঘোষণা দিল, আজ তারা তিনজন মিলে টরন্টো ঘুরবে। সে এবং জিনিয়াও অনেক দিন হল বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে যায় নি। জুলেখাকে দেখানোর অছিলায় তাদেরও আরেক বার দেখা হয়ে যাবে। তার ইচ্ছা CN Tower, মিউজিয়াম, নাথান ফিলিপস চত্তর এবং একুরিয়াম দেখা। একটা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে জুলেখাকে খাওয়াতে চায় সে। খুব মজা হবে। মিজানের অনুমতির অপেক্ষা করে নি জুলেখা। সে বাইরে যাবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগের দিন তাকে কিছু জামা কাপড় কিনে দেয়েছিল মালেক। সেখান থেকে বেছে বেছে একটা সুন্দর ম্যাক্সি পরেছে, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে মেলে দিয়েছে পিঠময়, মুখে হাল্কা মেকআপও করেছে। মিজান তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। জুলেখাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে সেও ছেলেমেয়েদের সাথে দল বেঁধে বেড়াতে যায়। জুলেখার হাত ধরে টরন্টো শহরের রাস্তায় রাস্তায় বুক ফুলিয়ে হাঁটে। তার নিজের কাছেই একটু লজ্জা লাগে। মানুষের প্রেমে পড়ার বোধহয় কোন বয়েস নেই। একটু মন খারাপ করে নিজের স্টাডিতে গিয়ে কম্পিটারে খবর পড়তে লাগল সে। তাকে সাথে নেবার ওদের কোন আগ্রহ নেই। সেধে যেতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে চায় না সে। বড় অপমান হবে। যাক, ওরাই গিয়ে ঘুরে আসুক। জুলেখার সময়টা ভালো কাটুক। কাল কি হবে কে জানে? জিনিয়া কাউকে বুঝতে না দিলেও মালেক এবং জুলেখার প্রতিটা নড়া চড়া, চাহনি, কথাবার্তা সে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। সবার দৃষ্টির আড়ালে পরস্পরের দিকে তারা কি গভীর আবেগ নিয়া তাকাচ্ছে, সেটা তার নজরে এড়ায়নি। কোন সন্দেহ নেই, মাত্র কয়েক দিনেই তারা দু'জন পরস্পরের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে দু'

জনকে দুইটা থাপ্পড় দিয়ে এই মোহভঙ্গ করে। এতো প্রেম করার সখ থাকলে ডিভোর্স কর, তারপর যা ইচ্ছা কর। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে! ছিহ!
বাইরে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে দু' জনার যে অফুরন্ত আগ্রহ দেখা গেল তা থেকেই আন্দাজ করল জিনিয়া, তারা বাসার বাইরে পরস্পরের সাথে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করছে। জিনিয়া তাদের সাথে লটকে থাকলে তাদের কথাবার্তা, চলাফেরায় অসুবিধা হবে। বুঝতে দেবে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিশ্চিয় ভাববে জিনিয়া সাথে না থাকলেই ভালো হত। এভাবে কোথাও যাওয়া যায়? সে না যাবারই সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক গাড়ীতে উঠবার আগে শরীরটা ভালো লাগছে না বলে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ বাইরে যাবে না। বিশ্রাম নেবে। তার অনুপস্থিতিতে তাদের আনন্দ যে কতখানি কম হবে সেই ফিরিস্তি দিতে দিতে মালেক এবং জুলেখা একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে মুখ ভ্যাংচাল জিনিয়া। ঢং করার জায়গা পায় না।
ওরা চলে যাবার পর মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য জোরাজুরি করল মিজান। কাছেই একটা ওয়াক ইন ক্লিনিক আছে। ডাক্তারগুলো খুব ভালো। বাবাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে ঠান্ডা করেছে জিনিয়া। দু' জনে পুরানো দিনের এলবাম বের করে কিছুক্ষন ছোটবেলার ছবি দেখল। মায়ের কথা হল। ইচ্ছে করে জুলেখার কথা তুলল না। বোঝাই যাচ্ছে এই অল্প বয়স্ক মেয়েটিকে নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য বিয়ে করে আরোও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে মিজান। হাতের নাগালের মধ্যে থেকেও সে লক্ষ যোজন দূরে।
ঠিক হল দুপুরে কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবে। তৈরী হয়ে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল মিজান। জিনিয়া গোছল সারতে গেছে। তার ঘন্টা খানেক লাগে গোছল পর্ব সারতে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল মিজান। রহমতের ফোন এলো। "মোল্লা ইমাম তো এসে গেছে রে," তার কণ্ঠে চাঁপা উত্তেজনা।
মিজানের হার্ট বিট বেড়ে গেল। সত্যি সত্যিই জ্বীন ঝাড়ানোর চেষ্টা করা হবে, এটা যেন এতক্ষন সে ঠিক উপলব্ধি করে নি। কয়েক দিন ধরে যে জুলেখাকে সে দেখছে, এই জুলেখা তো যে কারো স্বপ্নের রানী হতে পারে। তার তো কোন সমস্যা নেই। সেই ক্রুদ্ধ, সহিংস চাঁদনীর কোন দেখা নেই । এই সবের কি আর কোন দরকার আছে?
রহমত তার নীরবতা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে থাকবে। "কি ব্যাপার বলত? তুই কিছু বলছিস না কেন?"
মিজান কি করবে ভাবছে। জিনিয়া যে কোন সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার কথা শুনে ফেললে সমস্যা হবে। সে বাসার বাইরে চলে এলো। "মালেক এবং জিনিয়া আসার পর জুলেখা খুব ভালো আছে। কোন সমস্যাই করে নি।"
রহমত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "তুই কি ভাবছিস চাঁদনী ওকে ছেড়ে চলে গেছে? চিন্তাও করিস না। শয়তানীটা চুপচাপ বসে বসে খেলা দেখছে। বন্ধু, এখন আর পিছিয়ে যাবার কথা চিন্তাও করিস না। "
মিজান দ্বিদ্ধান্বিত কণ্ঠে বলল, "আমার ভয় করছে রে।"
"ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি মোল্লার হোটেলে এসেছি। বিস্তারিত আলাপ করবার জন্য। তুই চলে আয়।"
"আমাকে আসতে হবে কেন?"

"মোল্লা চাচ্ছে তুই আয়। তিনজন মিলে পুরো প্ল্যানটা নিচ্ছিদ্র করতে হবে। চাঁদনী আগে থেকে টের পেলে সব ভেস্তে যাবে। মোল্লার প্ল্যান কাজ করবে না। এক্ষুনী চলে আয়।"
জিনিয়া গোছল সেরে বেরিয়েছে। বাবা, বাবা বলে ডাকাডাকি করছে। মিজান বলল, "কিন্তু জিনিয়া বাসায়। ওকে নিয়ে খেতে যাবার কথা। কি করব?"
"ও কি জানে কিছু?" রহমত জানতে চাইল।
"না, ওদেরকে তো এসব নিয়ে কিছুই বলিনি।"
একটু ভাবল রহমত। "সব জানলে জিনিয়াকে কি আমাদেরকে সাহায্য করবে?"
"কি সাহায্য লাগবে?"

"তুই ওকে সাথে নিয়ে চলে আয়। চারজনে বসে খোলামেলা আলাপ করা যাবে।"
জিনিয়া সিঁড়ি বেয়ে নীচতলায় নেমে আসছে। মিজান দ্রুত বলল, "কিন্তু একটা জিনিষ তোর জানা দরকার। ওরা দু' জনাই জুলেখাকে খুব পছন্দ করে। এইসব আধি-ভৌতিক কথাবার্তা ওরা আদৌ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।"
রহমত একটু চিন্তা করে বলল, "তুই ওকে নিয়েই আয়। ও অনেক বুদ্ধিমতী। খুলে বললে নিশ্চয় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝবে।"
জিনিয়া বাইরে বেরিয়ে এসেছে। "বাবা! তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো? আমি তোমাকে সারা বাড়ীতে খুঁজছি।"
মিজান ম্লান হেসে বলল, "তোর রহমত চাচা ফোন করেছিল। একটা জায়গায় যেতে বলছে আমাদেরকে।"
"কোথায়?" জিনিয়া অবাক হল। "কি জন্য?"

"গেলেই বুঝবি। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চল।"
"কি ব্যাপার বল তো?" জিনিয়ার কণ্ঠে কৌতূহল।

"চল, গাড়ীতে যেতে যেতে তোকে সব খুলে বলব," মিজান বলল।

মোল্লা ইমাম এবং রহমতের সাথে আলাপ শেষ করে ফিরতে ফিরতে বিকাল হল মিজানদের। মালেকরা তখনও ফেরেনি। জিনিয়া বাসায় ফিরেই ভাইকে একটা ফোন দিল। কয়েক বার চেষ্টার পর ফোন ধরল মালেক। তারা CN টাওয়ারে ডিনার করছে। ঘন্টা খানের মধ্যেই ফিরে আসবে। আজকের মত বেড়ানো শেষ হয়েছে। পেছন থেকে বাজনার সুললিত শব্দ ভেসে আসছে। জিনিয়া বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল।
মিজান আশেপাশেই ছিল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। "একটু পরেই চলে আসবে," জিনিয়া বলল।
মিজান একটু দ্বিধা করে বলল, "দেখতে দেখতে মালেকের অনেক বয়েস হয়ে গেল, নারে? গার্লফ্রেন্ড, বিয়ে কিছুই হল না এখনও।"

"বাবা, তুমি ওসব নিয়ে ভেব না। ওর যখন সময় হবে নিজেই কাউকে খুঁজে নেবে। মনে আছে, মা ওকে বিয়ে দেবার কত চেষ্টা করেছে। কয়েকজন খুব সুন্দর, শিক্ষিত মেয়েকে ওর সাথে পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দিল। ওনার কাউকেই পছন্দ হয় নি।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে মিজান। "তোর মা খুব ছেলের বউ দেখতে চাইত। আদরের ছেলে। তারপর আবার লাজুক। মনে হয় ভয় পেত না জানি কোন দজ্জালের হাতে গিয়ে পড়ে।"

হাসল জিনিয়া। "পড়লে জেনে শুনেই পড়বে। তুমি ওসব নিয়ে ভেব না।"
জিনিয়া নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল, মিজান পিছু ডাকল। "জিনি, তোর কি মনে হয়, সব ঠিক ঠাক মত হবে তো?"
শ্রাগ করল জিনিয়া। "জানি না, বাবা। মোল্লা লোকটাকে দেখে তো ভালই মনে হল। কিন্তু এই সব ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার আমার বিশ্বাস হয় না। আমার যদি কোন কিছু পছন্দ না হয়, আমি কিন্তু ওকে থামিয়ে দেব। "

মিজান মাথা দোলালো। "ঠিকই বলেছিস। মোল্লার উপর চোখ রাখতে হবে।"
জিনিয়া নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় চিত হয়ে শুল। তার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা চলছে। আগামীকালটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এসপার ওসপার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

মালেক এবং জুলেখা ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বাজল। জিনিয়া লিভিংরুমে বসে টেলিভিশন দেখছিল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। মালেক লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "দেরী হয়ে গেল একটু। জুলেখাকে রাতের টরন্টো শহরটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনও অবশ্য রাস্তা ঘাট তেমন জমজমাট হয়ে ওঠে নি। ওকে গ্রীষ্মের সময় আবার নিয়ে যেতে হবে।"
জুলেখার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে। সে মুখ নীচু করে বলল, "আমি ওকে মানা করেছিলাম। শুনলই না। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?"
জিনিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। জুলেখা সম্বন্ধে সব জানার পর কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া কঠিন। এমন সহজ সরল দর্শন একটা মেয়ের মধ্যে যে একটা কাল নাগিনী লুকিয়ে থাকতে পারে, চিন্তাও করা যায় না। মাল্টিপল পার্সোনালিটি সম্বন্ধে তার কিছু জ্ঞান আছে। জ্বীন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সে ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। পর দিন রাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে।
"বাবা মনে হয় শুয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা গিয়ে চেঞ্জ কর। সারাদিন বাইরে বাইরে," হাসি মুখে তাড়া দিল জিনিয়া।
জুলেখা তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেল। মালেক দরজা বন্ধ করে জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "তুই কি করলি সারাদিন? শরীর ভালো হয়েছে?"
জিনিয়া হাসল। "খুব মজা করে এসে এখন আমার কথা ভাবা হচ্ছে!"
মালেক কাচুমাচু মুখে বলল, "সরি। তোকে রেখে যাওয়াটা উচিৎ হয় নি। কিন্তু কথা দিচ্ছি, এর ক্ষতিপূরণ আমি দেব।"
আদর করে ভাইয়ের পিঠে একটা চাপড় দিল জিনিয়া। "থাক, ক্ষতিপূরণ লাগবে না। তোর মত ভাই হয় না। যা, জামা কাপড় পালটা। চা-কফি খাবি?"

"খাওয়া যায়," মালেক উপরে উঠতে উঠতে বলল। "জুলেখার জন্যও এক কাপ বানা। নীচে বসে কিছুক্ষন গল্প করা যাবে। আজ যা জ্যোৎস্না দেখলাম। আজ নিশ্চয় পুর্ণিমা।"
"কাল," রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল জিনিয়া। রহমত এবং মোল্লার সাথে আলাপের সময় এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। সাধারণত পুর্ণীমা কখন যায় আসে তার খবরও রাখে না সে। রোমান্টিক নয় তা নয়, কিন্তু চাঁদ-টাদ দেখে একেবারে মন প্রাণ কাদা কাদা হয়ে যাবে, তেমনও নয়।
জিনিয়া ওদের তিনজনের জন্যই তিন কাপ কফি বানাল। কড়া করে। আগে মালেক নীচে নেমে এলো। তার একটু পরে এলো জুলেখা। কাপড় পালটে একটা লাল সুতীর শাড়ী পরেছে সে। তার লাবন্য যেন উপচে পড়ছে। মালেক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।
জিনিয়ার উপস্থিতি সে বোধহয় ভুলেই গেল কয়েক মুহুর্তের জন্য। জুলেখা গলা খাঁকারি দিয়ে জিনিয়ার পাশে বসতে বসতে বলল, "সরি জিনিয়া, সারাটা দিন তোমাকে রেখেই ঘুরলাম। খুব খারাপ লাগছিল। সত্যিই। ওকে কতবার বললাম, চল বাসায় ফিরে যাই। আরেক দিন আসবো। বলে, বাবা আছে। জিনিয়ার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি রাগ কর নি তো?"
জিনিয়া কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, "রাগ করব না? আমি এদিকে মন খারাপ করে বসে আছি আর তোমরা দু জনে মিলে খুব ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ। আমার তো হিংসা হবেই।"
জুলেখা করুন গলায় বলল, "আমার কোন দোষ নেই কিন্তু। সব তোমার ভাইয়ের দোষ।"
মালেকের দিকে তাকিয়ে আরেকটা ছদ্ম ভ্রুকুটি করল জিনিয়া। "সে তো আমি জানি। সুন্দরী সঙ্গী পেয়ে নিজের বোনকেও আর পাত্তা দিচ্ছে না। বিয়ে করলে তো আর চিনবেই না। সারাক্ষন শুধু বৌ বৌ করবে।"
মালেক লাজুক হেসে বলল, "ধ্যাত, কি যা তা বলিস! তুই হচ্ছিস আমার ছোট বোন। তোর সাথে বৌয়ের তুলনা চলে নাকি?"
জিনিয়া লক্ষ্য করল জুলেখা হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল। মুহুর্ত আগেও তার সর্বাঙ্গে যে দ্যুতি ছিল হঠাৎ করেই সেটা যেন নিভে গেছে। এই প্রসঙ্গ তোলাটা ঠিক হয় নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য হাসিমুখে বলল, "জুলেখা, তুমি তো কফি খাচ্ছ না। ভালো হয় নি বোধহয়?"
হাসল জুলেখা। "মোটেই না। কফি খুব মজা হয়েছে।"
জিনিয়া নানান বিষয় নিয়ে গল্প করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা দিন তারা কোথায় গেল, কি করল, কি খেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনল। রাত প্রায় দুইটা বেজে গেছে, তখনও সে ওঠার কোন নাম করছে না। মালেক এবং জুলেখা দু' জনাকেই মনে হল অস্থির। ঘন ঘন জানালার কাঁচ ভেদ করে প্লাবনের মত ভেতরে আসা জোৎস্নার দিকে তাকাচ্ছে, যেন ওদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে কোন এক যাদুর বাঁশী। কিন্তু জিনিয়া মনস্থির করেই রেখেছে আজ রাতে সে তাদের নিশীথ মিলনমেলা হতে দেবে না। এই ঘনিষ্ঠতার কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভাইয়ের জন্য তার খুব মন খারাপ হচ্ছে। এতো কাল পর একটা মেয়েকে তার মনে ধরল, কিন্তু জেনে শুনে কেউ সেটাকে সমর্থন করতে পারবে না।

রাত তিনটার দিকেও যখন জিনিয়া শুতে গেল না তখন মালেক বোধহয় আশা ছেড়ে দিল। তার ঘুমও এসেছে। জিনিয়া আরেক কাপ কড়া কফি খাবার প্রস্তাব দিল কিন্তু দু জনের কেউই খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। কিছুক্ষন পর সবাই ঘুমাতে চলে গেল। আজ ইচ্ছা করেই নিজের ঘরের দরজাটা সামান্য খুলে রাখল জিনিয়া। দুই প্রেম পাগল হৃদয়কে ধামা চাঁপা দেবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু একই সাথে তার একটু ভয় ভয়ও করছে। জুলেখার অন্য সত্ত্বা – চাঁদনী- যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে? সে তার কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা তো করবে না? খাটের নীচে একটা লোহার রড লুকিয়ে রেখেছে সে। বিপদে কাজে আসতে পারে। বিছানায় শুয়েও ঘুমাল না। ইচ্ছে করে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, যত খানি সম্ভব শব্দ করা যায় করল, ওরা যেন ধরে নেয় তার ঘুম আসছে না। ভোরের দিকে তার চোখ জোড়া লেগে এল। শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। যাক, রাতটা অন্তত ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে।

একুশ

পরদিন সকাল সকাল উঠল মালেক। সোমবার। তাকে অফিস যেতে হবে। এখান থেকে যেতে বেশ সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি রওনা দেয়া দরকার। জিনিয়া ভেবে রেখেছিল সকালে উঠে সে-ই তার ভাইকে নাস্তা বানিয়ে দেবে। গাধাটা আবার কিছুই পারে না। কিন্তু আগের দিন রাতে সে এতো দেরী করে বিছানায় গেছে যে উঠতেই পারল না। আধা ঘুম আধা জাগরণের মাঝে টুক টাক শব্দ শুনল। মিজান নামাজ পড়তে ওঠে। নিঃশব্দে সে কোন কিছুই কখন করতে পারে নি। তারও বোধহয় মনে ছিল যে আজ মালেক অফিস যাবে। মালেক নিজেও দেরী করে ঘুমিয়েছে, উঠতে তার বেশ কষ্ট হল কিন্তু কাজে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। খুব গুরুত্বপূর্ন কয়েকটা মিটিং আছে। দ্রুত অফিসের পোষাক পরে নীচে নেমে এলো মালেক। ভেবেছিল ফ্রিজ খুলে যা পাবে তাই খেয়ে দৌড় দেবে। কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে দেখল এলাহী কান্ড। মিজান এবং জুলেখা দু'জনাই উঠে গেছে এবং তারা খুব ঘটা করে নাস্তা বানাচ্ছে। আলু ভাজী এবং পরাটা হচ্ছে। বাজারের ফ্রোজেন পরাটা, কিন্তু স্বাদ ভালো। মালেকের খুব পছন্দ।

মিজান বলল, "বয়। গরম গরম খেয়ে যা। তোর পছন্দের খাবার।"

মালেক ব্রেকফাস্ট কাউন্টারে বসে পড়ে। জুলেখা পরাটা ভাঁজছে। আড় চোখে একবার চকিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। ভালো ঘুম হয় নি বোঝাই যায়। এলোমেলো শাড়ীটা কোন রকমে শরীরে লটকানো। চোখ মুখ ফোলা ফোলা, ঘুমের রেশ। এতো মায়াময় লাগছে তাকে! মালেকের ইচ্ছা হয় তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে গভীর একটা শ্বাস নেয়, তার শরীরের মৃদু গন্ধটা সারাদিন মালেকের সঙ্গী হয়ে থাকুক। মিজান নিজেও তার পাশে খেতে বসেছে। জুলেখার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও ভয় হচ্ছে ওর। এমন ঘনিষ্টভাবে দু জন ঘোরাফেরা করছে, বাবা কিছু সন্দেহ করে বসে নি তো? মিজান মালেকের সামনে এক গ্লাশ অরেঞ্জ জুস দিয়ে বলল, "ঠিক

ঠাক মত খাস তো, নাকি শুধু বাইরে বাইরে খেয়েই চলছে? তোর মা থাকতে তো রান্না করে দিয়ে দিয়ে তোর মাথাটা খেয়েছিল। কিচ্ছু শিখিস নি।"
মালেক হু-হা করল। রান্না বান্নার ব্যাপারটা তার আসলেই পছন্দ হয় না এবং তার তেমন দক্ষতাও নেই। বাবা কথাটা নিতান্ত ভুল বলে নি। মা বেঁচে থাকতে রাজ্যের জিনিষ রেঁধে তার ফ্রিজ ভরিয়ে রেখে আসত। মায়ের কথা মনে পড়ে চোখ ভিজে উঠল। তার সব সময় মনেও থাকে না যে মা নেই, আর কখন ফিরে আসবে না। খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেল। তবুও কোন রকমে কিছু খেয়ে উঠে পড়ল।
মিজান বলল, "তোর জুসটা তো খেলি না!"
মালেক দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না , বাবা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখান থেক যেতে অনেক সময় লাগবে। ভীষণ ট্রাফিক।"
জুলেখা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো। "দাঁড়াও!"
দাঁড়াতেই হল। একটা লাঞ্চ বক্স মালেকের হাতে ধরিয়ে দিল। "সব সময় বাইরে খাওয়া ভালো না। ফ্রাইড রাইস, তোমার ফেভারিট।"
মুচকি হাসল মালেক। আগের দিন কথাচ্ছলে বলে ছিল। না নিলে রক্ষা পাওয়া যাবে মনে হল না। দরজা খুলে বাইরে গাড়ীতে উঠল। স্টার্ট দিল। জুলেখা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি হেসে হাত নাড়ল। পালটা হাত নাড়ল মালেক। একটা চাঁপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। এই মেয়েটা যদি তাকে এভাবে প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে মিষ্টি হেসে বিদায় দিত!

জিনিয়ার বিছানা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে নীচে এসে দেখল মিজান আজ অফিসে যায় নি। সে লিভিংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। জুলেখা নিজের ঘরে । দরজা বন্ধ। মিজানের সাথে নীরবে চোখাচোখি হল। জিনিয়া ভোলে নি। এতক্ষন বিছানায় শুয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে কিভাবে কি হবে সেটাই শুধু ভেবেছে। দু'কাপ কফি বানিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে জুলেখাকে উঁচু গলায় ডাকল।
প্রায় সাথে সাথেই নীচে নেমে এলো জুলেখা।
"উঠেছ? ভাল ঘুম হয়েছে?"
"আমার তো ভালই ঘুম হয়েছে। মনে হচ্ছে তোমার হয় নি। কফি খাও।"
দু' জনে রান্নাঘরের ব্রেকফাস্ট কাউন্টারে বসল। "বাবা দেখি অফিসে যায় নি আজকে।"
জুলেখা নীচু গলায় বলল, "হ্যাঁ, ওনার নাকি মাথাটা ধরেছে অনেক। টাইলানল দিয়েছি।"
"হ্যাঁ, বাবার একটু মাথা ব্যাথার সমস্যা আছে। কিন্তু তেমন খারাপ কিছু না।"
"তুমি গেলে না কেন? টায়ার্ড? ভালো হয়েছে যাওনি।"
"হ্যাঁ। সকালে উঠতে ইচ্ছা হল না," জিনিয়া বলল। "তাছাড়া আমার অনেক ছুটি বাকী আছে। আচ্ছা, চল আজকে আমরা দু' জনে মিলে কিছু রান্না করি।" জিনিয়া খুব উৎসাহ নিয়ে বলল।
জুলেখা হাসল। "তুমি কি রান্না করতে পার? তোমার ভাই তো একটা ডিমও ভাজতে পারে না।"

হেসে ফেলল জিনিয়া। "আমি মালেকের মত অকর্মা নই। আমি বাংলাদেশী রান্না খুব একটা পারি না কিন্তু এদেশীয় রান্নায় বেশ পটু।"
"কি রাঁধতে চাও বল। বাজার না থাকলে গিয়ে আনতে হবে। উনি মনে হয় যেতে পারবেন না।" জুলেখা মিজানকে ইঙ্গিত করল।
জিনিয়া উঠে ফ্রিজ খুলে দ্রুত চোখ বোলাল ভেতরে। "যা আছে তাতেই হবে। মুরগীর রোস্ট এবং সুপ বানাবো। দেখ, কেমন মজা হয়।"
জুলেখা হাসতে হাসতে বলল, "আচ্ছা, দেখবখনে।"
কফি শেষ করে দু' জনে ফ্রিজ থেকে জিনিষপত্র বের করে রান্নার প্রস্তুতি নিতে থাকে। জুলেখা নিজে খুব বেশী কথা না বললেও জিনিয়ার কথা মনযোগ দিয়ে শোনে। মাকে নিয়ে, নিজেদের ছোটবেলার নানা স্মৃতি নিয়ে অনেক গল্প করে জিনিয়া। জুলেখা মাঝে মাঝে মালেকের ছোটবেলার কথা জানতে চায়। বোকা বোকা ছিল কিনা? নিশ্চয় অনেক লাজুক ছিল? নানা প্রশ্ন। জিনিয়া মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। দেখা যাচ্ছে শুধু তার ভাই নয়, এই মেয়েটাও প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।
ঘন্টা দুই লাগল রান্না শেষ হতে। জুলেখা ডাইনিং টেবিলে তিন জনের জন্য প্লেট এবং সুপের বাটি দিল। জিনিয়া খাবার পরিবেশন করল। সবার বাটিতে সে নিজের হাতে সুপ ঢেলে দিল। মিজানকে ডেকে আনা হল। খাবার দেখে সে খুশী হল। "অনেক দিন এসব খাওয়া হয় না। তুই বাসা থেকে চলে গিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি।"
জুলেখা জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার উপর রাগ করে চলে গেছ, ঠিক কিনা?"
শ্রাগ করল জিনিয়া। "ঠিক না। একদিন তো যেতেই হবে। বয়েস হয়েছে না? সারা জীবন কি বাবা-মায়ের বাড়ীতে থাকা যায়?"
জুলেখা মৃদু গলায় বলল, " তুমি চলে এসো না। খুব মজা হবে।"
হেসে ফেলল জিনিয়া। "ভাব যখন হল তখন বলা যায় না। চলেও আসতে পারি।"
মিজান হঠাৎ বলল, "কোল্ড ড্রিঙ্কস কিছু আছে? রোস্টেড চিকেনের সাথে ভালো লাগবে।
জুলেখা উঠল। "বেসমেন্টে আছে। আমি নিয়ে আসছি।"
সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে দ্রুত পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের পুঁটলি বের করে জিনিয়ার হাতে ধরিয়ে দিল মিজান। জিনিয়া পুঁটলির ভেতরের গুড়াটুকু জুলেখার সুপের মধ্যে ঢেলে দিয়ে দ্রুত বার দুয়েক ঘুটল। কাগজটাকে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।
জুলেখার ফিরতে প্রায় মিনিটখানেক লাগল। একটা কোকা কোলার দুই লিটারের বোতল নিয়ে ফিরল সে। "দেরী হয়ে গেল। খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"
মিজানকে একটা গ্লাশে খানিকটা ঢেলে দিল। "জিনিয়া, তুমি চাও?"
"পরে নেব। আমি আবার এসব বেশী খাই না। তুমি খেতে বস।" জিনিয়া বলল।
জুলেখা খুব উৎসাহ নিয়ে সুপ খেল। "খুব মজা হয়েছে!"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই শরীর এলিয়ে পড়ল জুলেখার। টেবিলের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ছিল, জিনিয়া এবং মিজান তাকে ধরাধরি করে উপরে মাস্টার বেডরুমে নিয়ে এল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।
"এবার?" জিনিয়া বাবাকে লক্ষ্য করে বলল।
"রহমত আর মোল্লা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে," মিজান নার্ভাসভাবে বলল। "কতক্ষন ঘুমাবে?"
"সাত-আট ঘন্টার মত। কিন্তু ধাক্কা ধাক্কি করলে আগেও তোলা যাবে। মোল্লা রাত নয়টার দিকে শুরু করতে চায়। তখন নাকি আকাশে পূর্ণীমা থাকবে। কি যে করতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। ওলোট পালোট হয়ে গেলে খুব খারাপ হবে, নারে?" মিজান একটা চেয়ারে বসে পড়ল।
জিনিয়ারও নার্ভাস লাগছে। "আমার মনে হয় সব ঠিকঠাক মতই হবে," মিজানকে আশ্বস্ত করবার জন্য বলল সে। "কিন্তু, রহমত চাচা তো জুলখাকে বাঁধতে বলেছিল।"
"আমি ওদেরকে ফোন করছি। ওরা নিজেরা এসে বাঁধুক। ওসব আমি পারব না।"
মিজান ফোন তুলে রহমতকে কল করল। "চলে আয় তোরা। জুলেখা ঘুমিয়েছে।"
রহমত তার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। মোল্লাকে নিয়ে তখনই রওনা দিল।
"আচ্ছা, মালেককে সব বলেছিস তো?" জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বলল মিজান।
"নাহ, বলতে পারিনি," জিনিয়া বিছানায় জুলেখার পাশে বসতে বসতে বলল। "হঠাৎ করে এসব কথা বললে ও হয়ত বিশ্বাস করত না। জানোই তো এসব ব্যাপারে ওর বিশ্বাস কত কম। ধর্ম টর্ম তো মানেই না।"
মিজান ভীত গলায় বলল, "তাহলে ওকে সামলাবি কি করে? ও তো ছয়টার দিকেই অফিস থেকে চলে আসবে। যদি এসব দেখে কোন ঝামেলা করে?"
"চিন্তা কর না। একটু পরে ওকে ফোন করে ব্যবস্থা করছি। মিসিসাগাতে একজন মহিলা আছেন। বাসা থেকে শাড়ী বিক্রি করেন। ভাইয়াকে বলব একটা শাড়ী ঠিক করে রেখেছি। সেখানে গিয়ে আনতে হবে। শাড়ী নিয়ে ফিরতে ফিরতে ন'টা তো বাজবেই।"
"যাবে মনে হয়?"
"বলব জুলেখাকে সারপ্রাইজ দেব। যাবে। তোমাকে খুব নার্ভাস লাগছে। তুমি বরং আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। রহমত চাচা এলে তুলে দেব।"
মিজান আপত্তি করল না। সে চলে যেতে তার শূন্য চেয়ারে বসল জিনিয়া। অঘোরে ঘুমাচ্ছে জুলেখা। হঠাৎ যদি তার ঘুম ভেঙে যায় তাহলে কি হবে? চিন্তাটা চকিতে মাথায় এল। বিপদ হবে। বাবার মুখে যা শুনেছে, চাঁদনী যদি বুঝতে পারে জিনিয়া এর পেছনে আছে, সে নিশ্চয় তার বারোটা বাজাবে। জিনিয়ার নিজেরও এবার একটু ভয় ভয় লাগছে। বাঁধলেই ভালো হত। রহমত চাচা এবং মোল্লা যত তাড়াতাড়ি পৌঁছায় ততই ভালো।

রহমত মোল্লা ইমামকে নিয়ে পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। দরজায় কলিং বেল বাজতেই মিজান ব্যাস্ত পায়ে নীচে নেমে গেল। রহমতদেরকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। "যলদি আয়। আমার ভয় হচ্ছে আবার উঠে না যায়।"

মোল্লা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলল, "পুরো ডোজটাই দিয়েছিলেন তো?"
মিজান মাথা দোলাল। "হ্যা। পনের মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে যায়।"
রহমতের হাতে বেশ কিছু মোটা, শক্তিশালী দড়ি এবং একটা ডাক টেপ। তারা ভেতরে ঢুকতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জিনিয়া। মোল্লা নীরবে কাজে নেমে গেল। প্রথমে ডাক টেপ দিয়ে জুলেখার দু'ই হাত এবং দু'ই পা আটকে দিল, তারপর দড়ি দিয়ে বিছানার সাথে পেঁচিয়ে বাঁধল। জুলেখা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে কোন বাঁধা দিল না। জিনিয়ার এখন মেয়েটার জন্যই খারাপ লাগছে। সে বলল, "এইভাবে বাঁধার কি কোন দরকার ছিল? ওর কোন অসুবিধা হবে না তো?"
মোল্লা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। "জ্বীনের আছর যাদের উপর হয় তাদের শরীরে প্রচন্ড শক্তি থাকে। আপনার বাবা ইতিমধ্যেই সেটা দেখেছেন। ওঝারা যখন জ্বীন তাড়ানোর চেষ্টা করে তখন জ্বীনেরা অসম্ভব রেগে যায়। আর রাগলে তাদের শক্তি আরোও কয়েক গুন বেড়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি কিভাবে তারা মোটা দড়ি ছিড়ে ফেলতে পারে। আর একবার মুক্ত হতে পারলে ওরা হিংস্র হয়ে ওঠে। হাতের কাছে যাকে পাবে তাকে মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারে।"
জিনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এই লোকটার কথা বার্তা শুনে মনে হচ্ছে আজ রাতে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেলেই হয়। এই সব অজাগতীয় ব্যাপার স্যাপার তার কাছে মোটেই ভালো লাগছে না। মালেক সাথে থাকলে ভালো হত কিন্তু জুলেখার সাথে তার সখ্যতার কথা চিন্তা করে তাকে দূরে সরিয়ে রাখাই সাব্যস্ত হয়েছে। জুলেখাকে এভাবে বেঁধে তার উপর অদ্ভুত কোন কিছু করা হচ্ছে দেখলে তার কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে বলার কোন উপায় নেই। কিন্তু ভাইকে যতখানি জানে জিনিয়া, মালেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে এইসব আজগুবি ব্যাপার দেখবে না। ভৌতিক ব্যাপারে তার মোটেই বিশ্বাস নেই। সে মনে করে পৃথিবীতে সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোনটার পেছনেই কোন ভৌতিক স্বত্তার কোন কারসাজী নেই। সবটাই মানুষের কল্পনা।
জুলেখাকে বাঁধা হতে কাছেই চেয়ার নিয়ে বসল ওরা। মিজান চেয়েছিল অন্য কোন ঘরে গিয়ে বসতে কিন্তু মোল্লা আপত্তি করল। সে জুলেখাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। কোন কারনে ঘুম ভেঙে সে নিজেকে যদি এই অবস্থায় আবিষ্কার করে, তাহলে ক্ষেপে গিয়ে কি করবে তার কোন ঠিক নেই। কাছাকাছি থাকলে মোল্লা যথাযথ ব্যাবস্থা নিতে পারবে।
রহমত বলল, "জিনিয়া, মালেকের সাথে কথা হয়েছে?"
সময় দেখল জিনিয়া। বিকাল চারটা। মালেক সাধারণত পাঁচটার দিকে কাজ থেকে বের হয়। "এখন বলব। ওর অফিস থেকে বের হবার সময় হয়েছে।"
মালেকের ফোন নাম্বার ডায়াল করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনিয়া। করিডোরের অন্য প্রান্তে চলে এল। মালেক ফোন ধরেছে। তাকে মিসিসাগার ভারতীয়

ভদ্রমহিলার বাসার ঠিকানা দিল জিনিয়া। সেখানে গিয়ে জুলেখার জন্য খান দুই শাড়ী পছন্দ করে আনতে হবে। জুলেখাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায় সে।
মালেক কোন আপত্তি করল না। সে ডাউনটাউনে কাজ করে। গাড়ী নিয়েই যায়। পাঁচটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে ভয়ানক ভীড় ঠেলে মিসিসাগা গিয়ে শাড়ী নিয়ে এজাক্স ফিরতে ফিরতে তার কতক্ষন লাগবে কে জানে। কিন্তু এমনিতেই সে ভীষণ সহিষ্ণু, তারপর জুলেখাকে খুশী করবার এমন একটা মোক্ষম সুযোগ সে হেলায় হারাবে সেটা হতেই পারে না। সে সহজেই রাজী হয়ে গেল।
জিনিয়া মাস্টার বেডরুমে ফিরে গেল না। মিজান এবং রহমত মোল্লার সাথে সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। মোল্লা লোকটাকে খুব একটা পছন্দ হয় নি জিনিয়ার। কেমন একটা হাব ভাব, ঠান্ডা চোখে তাকায়, মনে হয় যেন সবার মধ্যে দুষ্ট জ্বীণ দেখে সারাক্ষণ। নিজের ঘরে চলে এলো। রাত হতে এখনও বেশ বাকী। সাড়ে আটটার দিকে সূর্য ডোবে। তারপরও কিছুক্ষন অপেক্ষা করতে হবে অন্ধকার হবার জন্য। জ্যোৎস্না যত উজ্জ্বল হবে ততই নাকি ভালো। চাঁদনী সম্বন্ধে মোল্লার যথেষ্ট জ্ঞান আছে মনে হয়। তার কথা অন্ধের মত মেনে নেয়া ছাড়া তাদের এই মুহূর্তে অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু জিনিয়া মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, কোন কিছু যদি তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় তাহলে সে পুলিশে খবর দেবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। নিজের অজান্তেই চোখ লেগে এল।

মিজানের গলা শুনে লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল জিনিয়া। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল সূর্য ডুবে গেছে বেশ আগেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পুর্নিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে।
"ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম," লজ্জিত কণ্ঠে বলল সে।
মিজান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চাঁপা গলায় বলল, "আয়। সময় হয়েছে। মোল্লা রেডী হচ্ছে।"
"জুলেখার ঘুম ভেঙেছে?"
মাথা নাড়ল মিজান। "এখনও না কিন্তু নড়া চড়া করছে। খুব শীঘ্রিই ভেঙে যাবে। শোন, যদি ভয় করে তাহলে তোর ওখানে থাকার কোন দরকার নেই।"
মাথা নাড়ল জিনিয়া। "আমি থাকতে চাই। ভয় করছে না। তুমি ঠিক আছো?"
মিজান ইতস্তত করল। "জানি না। সব ঠিক ঠাক মত হলেই হয়। আয়।"
দু'জনে দ্রুতপায়ে হেঁটে মিজানের কামরায় চলে এল। বিছানায় এখনও একইভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে জুলেখা। নড়বার কোন উপায় তার নেইও। খাটটা সরিয়ে একেবারে জানালার পাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানালার পর্দা সম্পুর্ণ সরিয়ে দেয়া। বিশাল কাঁচের জানালা দিয়ে রুপালী চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে, জুলেখার উপর।
মোল্লা ব্যাস্ত হয়ে পড়ল। একটা ব্যাগ থেকে বিশাল বিশাল কয়েকটা মোমবাতি বের করল। বিছানার কাছাকাছি উঁচু জায়গা দেখে বসাল সেগুলোকে। একটা দেশলাই বের করে জ্বালাল। মিজানকে বলল, "এবার আলোগুলো সব নিভিয়ে দিন। তাহলে জ্যোৎস্নার আলোটা খুব সুন্দর করে ফুটে উঠবে।"

জিনিয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, "তাতে কি লাভ?"
"চাঁদনী ভীষন রোমান্টিক," মোল্লা গম্ভীর গলায় বলল। "প্রতি পুর্নিমায় সে তার প্রেমিক জমিনের সাথে দেখা করত। সে জন্যই জমিন তাকে ডাকত চাঁদনী বলে। তার আসল নাম কি কেউ জানে না। আমি ধারনা করছি এই আলোয় তার পুরানো দিনের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। তার মন দুর্বল থাকবে। সেই সুযোগটা আমি নিতে চাই। চাঁদনী ভীষণ ধুর্ত এবং শক্তিশালী। ওকে হারাতে হলে ওর প্রতিটা দূর্বলতার সুযোগ আমাকে নিতে হবে। "
উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মোমবাতির আলো ম্রিয়মান দেখাচ্ছে, ঘরের মধ্যে একটা ভীতিকর আলো আধারীর সৃষ্টি হয়েছে। এবার মোল্লা সবাইকে অজু করে আসতে বলল। জ্বীন তাড়ানোর প্রধান উপকরন হচ্ছে আল্লাহ-রসুলের নাম এবং কোরানের পবিত্র বাণী। সেই কারনে উপস্থিত সকলের পাক পবিত্র থাকাটা খুবই জরুরী। সবাই দ্রুত অজু করে এলো। হাতে সময় খুব বেশী থাকার কথা নয়। জুলেখা যে কোন মুহুর্তে ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে পারে। জুলেখার বিছানার ঠিক সামনে দাঁড়াল মোল্লা, তার নির্দেশ মোতাবেক পেছনে প্রায় দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়েছে রহমত, মিজান এবং জিনিয়া। কিছু একটা দোয়া পড়ে বার বার ফুঁ দিচ্ছে মোল্লা। নিজের শরীরে, জুলেখাকে লক্ষ্য করে এবং ঘরের বিভিন্ন দিকে। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর, চলন বলনে ভয়ানক স্থিরতা এবং মননিবেশের চিহ্ন, যেন কোথাও কোন ভুল হলে ভয়াবহ কিছু ঘটে যাবে। তার শরীরের আতরের কড়া গন্ধে চারদিকে ভুর ভুর করছে। প্রখর জ্যোৎস্নার আলো এবং মোমবাতির আলো-আধারীতে তাকে রহস্যময়, অজাগতীয় কিছু মনে হচ্ছে।
জুলেখা নড়া চড়া শুরু করেছে। ঘুমের ওষুধের জের কেটে যাচ্ছে। নড়া চড়া করতে গিয়ে অসফল হয়ে চোখ খুলে তাকাল সে। কয়েকটা মুহুর্ত শূণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন কোথায় আছে, কিভাবে আছে বোঝার চেষ্টা করল। তার পর হঠাৎ করেই যেন নজর পড়ল মোল্লার উপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে। "কে? কে আপনি? আমি কোথায়? শুনছেন? আপনি কোথায় গেলেন?"
শেষের উক্তিটুকু যে মিজানকে লক্ষ্য করে করা সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। মিজান দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, রহমত তার হাত চেপে ধরে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, "যাস না। যা করার মোল্লাকে করতে দে।"
মোল্লা শান্ত কণ্ঠে জুলেখাকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি কে? আপনার নাম কি?"
জুলেখা হতবিহবল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে শরীর দুমড়ে মুচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন বুঝল তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সে বিস্মিত হয়ে থমকে গেল। "কি করছেন আমাকে নিয়ে?" অসম্ভব আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সে। "কেন বেঁধে রেখেছেন আমাকে? কে আপনি? আমার স্বামী কোথায়?" হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করল জুলেখা।
জিনিয়া কি করবে বুঝতে পারছে না। জুলেখার অসহায়, ভীত চকিত কান্না শুনে তার মনে হচ্ছে সে ছুটে গিয়ে এই বুজরুকি থামিয়ে দেয়। তার হাবে ভাবে নিশ্চয় কিছু একটা

প্রকাশ পেল কারণ রহমত তার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখল, যেন বলার চেষ্টা করল, চিন্তার কিছু নেই।
মোল্লা বেশ কয়েকবার চার কলেমা পড়ল, জোরে জোরে। তার সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজে ঘরটা ভরে উঠল। তারপর জুলেখার মুখের কাছে গিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে জানতে চাইল, "আপনার নাম বলুন। কে আপনি?"
জুলেখা বিস্ফোরিত চোখ মেলে লোকটাকে দেখছে। তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, হাপরের মত ওঠা নামা করছে বুক। ভীষণ ভয়ে তার মাথা কাজ করছে না। মোল্লা হঠাৎ জোরে ধমকে উঠল। "আপনার নাম বলুন!"
জুলেখা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "জুলেখা! আমার নাম জুলেখা!"
মোল্লা এবার কণ্ঠস্বর নীচু করে বলল, "চাঁদনী কোথায়? আমি চাঁদনীকে চাই।"
জুলেখা সশব্দে কাঁদছে। "আমি জুলেখা। আমি চাঁদনী না। চাঁদনী কোথায় আমি জানি না।"
মোল্লা শান্ত কণ্ঠে বলল, "জুলেখা, আপনি চাঁদনীকে চেনেন?"
জুলেখা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "চিনি। ও আমার বন্ধু। অনেক দিনের বন্ধু।"
"ও কোথায় লুকিয়ে আছে? ওর সাথে আমার কথা আছে।"
"আমি তো জানি না। ও আমাকে কিছু বলে না।" জুলেখার কণ্ঠে কাকুতি।
মোল্লা পেছন ফিরে মিজানের দিকে তাকাল। বিড়বিড়িয়ে বলল, "চাঁদনীকে আনতে হলে আমাকে একটু শক্ত হতে হবে। আপনি ওনার স্বামী। আপনার অনুমতি আমার প্রয়োজন।"

মিজান নিঃশব্দে মাথা দোলাল। সে সম্মত। মোল্লা এবার সুরা ফাতিহা পড়ল। তার সুরেলা কণ্ঠের মুর্ছনা শেষ হতেই প্রচন্ড জোরে ধমকে উঠল, "চোপ বেটি। আমার সাথে ফাজলামী করিস? বের কর চাঁদনীকে। এক্ষুনী!"

জুলেখা বোধহয় এবার অন্য তিনজনের উপস্থিতি টের পেল। সে কাঁতর গলায় বলল,

"আমাকে বাঁচান। কি হচ্ছে এসব? শুনছেন? আমাকে বাঁচান। দয়া করুন।"
মোল্লা জুলেখার গালে একটা জোর চড় বসাল। চটাস করে এতো জোরে শব্দ হল যে

জিনিয়া কেঁপে উঠল। সে অবাক দৃষ্টিতে রহমতের দিকে তাকাল। রহমত তাকে হাত

দেখাল – চিন্তার কিছু নেই। জিনিয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এই লোকটা জুলেখার গালে থাপ্পড় মারছে আর সেটা কোন সমস্যা নয়!
জুলেখা জোরে জোরে কাঁদছে। "আমাকে মারবেন না। আমাকে বাঁচান।"
মিজানের শরীর কাঁপছে। রহমত সেটা বুঝতে পেরে বন্ধুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল। এই সময়ে মোল্লাকে ব্যাঘাত করলে সব ভেস্তে যেতে পারে।
মোল্লা নির্বিকার মুখে জুলেখাকে আরেকটা জোরে থাপ্পড় দিয়ে চীৎকার করে উঠল, "চাঁদনী কোথায়? চাঁদনী?"

আরোও জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল জুলেখা। গোঙ্গানীর মত শব্দ করছে সে। জিনিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল পরিস্থিতি বেশী খারাপের দিকে এগুলে সে কারো কথা শুনবে না। মোল্লাকে থামিয়ে দেবে।

মোল্লা আবার হাত তুলেছিল আরেকটা থাপ্পড় দেবার জন্য, কিন্তু সেই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। জুলেখার শরীর হঠাৎ টান টান হয়ে গেল, তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল, স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ কর্কশ, পুরুষালি হয়ে উঠল। উগ্র কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল সে, "হারামজাদা মোল্লা! তোর এতো বড় সাহস? তুই আমাদের গায়ে হাত দিস? দড়ি খোল। তোকে আমি ছিড়ে টুকরা টুকরা করব।"

মোল্লা ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল। শান্ত গলায় বলল, "চাঁদনী! শেষ পর্যন্ত বের হয়েছিস তাহলে! মনে আছে আমাকে?"

চাঁদনী থক করে এক দলা থুতু ফেলল মোল্লাকে লক্ষ্য করে। মোল্লা সরে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। তার মুখের এক পাশে থুতুতে ভরে গেল। একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। চাঁদনী ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, "তুই একটা হারামী! তোর খোঁজেই এতো দূর এসেছি আমি।"

মোল্লা রুমালটা পকেটে গুজে রাখল। "জমিনকে চাস?"

চাঁদনী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। "তুই ওকে বন্দী করে রেখেছিস। আমি জানি। তোর জন্য আমার জীবনটা নষ্ট হয়েছে। তোকে আমি ছাড়ব না।"

মোল্লা ঠান্ডা গলায় বলল, "তোর জন্য জুলেখার জীবন নষ্ট হয়েছে। তুই ওকে সংসার করতে দিস নি, ওর বাবা-মাকে মেরেছিস। ওর জীবনটা তুই ছার খার করেছিস।"

চাঁদনী তীব্র কণ্ঠে বলল, "জুলেখা আর আমি এখন এক স্বত্বা। আমার জীবন এখন ওর জীবন। ওর বাবা-মাকে মেরেছি, বেশ করেছি। ঐ শয়তানগুলো তোর হাতে আমার জমিনকে তুলে দিয়েছে। তোকে আমি খুঁজে বের করতামই। আমার জমিনকে তুই ছেড়ে দে।"

মোল্লা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে শান্ত গলায় বলল, "তোর জমিনকে আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু একটা শর্তে। তুই চিরকালের জন্য জুলেখাকে ছেড়ে চলে যাবি।"

চাঁদনী এক মুহূর্ত ভাবল। কর্কশ গলায় বলল, "তোকে আমি বিশ্বাস করি না। জুলেখার শরীর ছাড়লেই তুই আমাকে বন্দী করবি। ঠিক যেভাবে জমিনকে নিয়েছিলি। তোর গোলামী আমি করব না।"

মোল্লা ঠান্ডা গলায় বলল, "তুই যদি সত্যিই জমিনকে আবার দেখতে চাস ,তাহলে যা বলছি কর। জুলেখাকে ছেড়ে দে। আমি জমিনকে ছেড়ে দেব। তোরা সুখে শান্তিতে সংসার কর। আমি বাধা দেব না।"

চাঁদনী গলা চড়িয়ে বলল, "আগে জমিনকে ছাড়। তারপর আমি যাবো। তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"জমিনকে যদি ছেড়ে দেই, তাহলে তোরা দু'জন জুলেখার উপর ভর করবি। তোদের দু'জনার বিরুদ্ধে আমি একা পারব না। জুলেখাকে আগে ছাড়। তারপর জমিনকে পাবি। আমার কথা যদি না মানিস, তাহলে কিভাবে মানাতে হয় আমি জানি।"

চাঁদনী ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল, " খবর্দার গায়ে হাত দিবি না। তোদের সব কটাকে আমি শেষ করে দেব। আমাকে বেঁধে রাখতে পারবি তুই? চাঁদনীকে তুই চিনিস না? আগেরবার তাড়াতে পেরেছিলি? এবারও পারবি না। তোর কাছ থেকে আমি আমার জমিনকে ছিনিয়ে নেব। কোথায় পালাবি তুই?"
মোল্লা ভীষণ জোরে ধমকে উঠল, "চুপ শয়তানী! বের হ! এক্ষুনী বের হ! যদি নিজ ইচ্ছায় না বের হস, তোকে আমি জোর করে বের করব। দাঁড়া তুই!"
নিজের থলিটা মেঝে থেকে হাতে তুলে নিল মোল্লা। একটা চিকন বেত বের করল। জিনিয়া এতক্ষন বুক চেপে ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। বেত বের করতে দেখে সে ফিসফিসিয়ে বলল, "লোকটা জুলেখাকে ঐটা দিয়ে মারবে?"
রহমত বলল, "জুলেখাকে নয়। চাঁদনীকে। জুলেখা কিচ্ছু টের পাবে না।"
জিনিয়া ভীত গলায় বলল, "চাঁদনী যদি সত্যিও হয়, শরীরটা তো জুলেখার!"
রহমত মৃদু কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল, "ভাবিস না। জুলেখা এখন ঐ শরীরের গভীরে কোথাও লুকিয়ে আছে। চাঁদনী এখন ওর প্রধান অস্তিত্ব। ধৈর্য ধর। সব ঠিক ঠাক মত হয়ে যাবে।"
বেত দেখেই চাঁদনী চীৎকার করে উঠল, "খবর্দার, মারবি না। খবর্দার! কেটে টুকরা টুকরা করব তোকে আমি। এই দড়ি দিয়ে আমাকে তুই ঠেকাতে পারবি না। শুয়োর!"
মোল্লা বেত তুলে জুলেখার পায়ের তলায় চটাস করে একটা আঘাত করে। সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে জুলেখার। ব্যাথায় গুঙিয়ে ওঠে চাঁদনী। আবার আঘাত করে মোল্লা। "যাবি কিনা বল?"
চাঁদনী পাগলের মত চীৎকার করছে, "জমিনকে ছাড় আগে। তাহলে যাবো। জমিনকে ছাড়।"
আবার আঘাত করল মোল্লা। "আগে জুলেখাকে ছাড়। আর কোনদিন ঢুকবি না। তোর জবান চাই আমি। জবান ভাঙলে অনন্তকাল দোযখে পুড়ে মরবি।"
চাঁদনী পাগলের মত ছটফট করছে। হাত এবং পায়ের দড়ি ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ভয়ংকর রাগে ফুঁসছে সে। খাঁটটাকে ঝাঁকি দিয়ে শুন্যে তুলে ফেলছে। কিন্তু বাঁধন ছিড়তে পারছে না। আবার একটা আঘাত করল মোল্লা। জিনিয়া লক্ষ্য করল জুলেখার একটা পায়ের পাতা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর সহ্য করতে পারল না সে। তীব্র গলায় বলল, "অনেক হয়েছে। বন্ধ কর এইসব। ঐ লোকটা যেন জুলেখার গায়ে আর হাত না দেয়।"
মিজানকে অসহায় মনে হল। সে রহমতের দিকে তাকাল। মোল্লা এক মুহূর্তের জন্য ওদের দিকে তাকিয়ে ভর্তসনা করল , "চুপ করুন আপনারা।"
জিনিয়া এগিয়ে এল। "আপনি বন্ধ করুন এইসব। একদম মারবেন না আর। এসব কি করছেন আপনি?"
মোল্লা রহমতের দিকে তাকাল। রহমত জিনিয়াকে হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এল। "মা, এই সময় সমস্যা করিস না। বিশ্বাস কর, চাঁদনীকে এইভাবে ছাড়া ভাগানো

যাবে না। এটাই আমাদের একমাত্র উপায়। একটু রক্ত পড়ছে কিন্তু ওটা দু' দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু চাঁদনী না যাওয়া পর্যন্ত জুলেখা স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারবে না।"
জিনিয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ঘটনা এইভাবে মোড় ঘুরে যাবে এটা সে মোটেই ভাবে নি। মালেককে সরিয়ে দেয়াটা তার ঠিক হয় নি। মিজানের পক্ষে এটা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সে মনস্থির করে ফেলল। মালেককে ফোন লাগাল। কয়েক বার বাজতে ফোন ধরল মালেক। "ভাবিস না, শাড়ী এনেছি।"
জিনিয়া কঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু উত্তেজনা আটকানো গেল না। "ভাইয়া, বাসায় ফিরতে কতক্ষন লাগবে?"
সতর্ক হয়ে পড়ল মালেক। "মিনিট দশেক। সামনেই এজাক্সের একজিট। কেন রে?"
"যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়। জুলেখাকে এক মৌলভী এসে জ্বীন ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওকে মারছে সে। রক্ত বের করে দিয়েছে।"
মালেক অবাক হয়ে বলল, "কি বলছিস এসব? দুষ্টামী করছিস?"
জিনিয়া দ্রুত বলল, "না, সত্যি বলছি। বাবার ধারনা জুলেখার উপর জ্বীনের আছর হয়েছে। শয়তানের আছর। তার নাকি কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। শরীরেও ভীষণ জোর। রহমত চাচা গ্রামে গিয়ে অনেক উদ্ভট গল্প শুনে এসেছে তার সম্বন্ধে। এখন মোল্লা নামের এক লোককে নিয়ে এসেছে। সে নাকি জ্বীন ঝাড়তে পারে। আমার কাছে এসব ভালো লাগছে না।"
কথাগুলো মাথায় ঢুকতে বোধহয় একটু সময় লাগল মালেকের। হঠাৎ এই জাতীয় একটা কিছু শুনবার জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হল না। সে গাড়ীর গতি অনেক বাড়িয়ে দিল। "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"
জিনিয়া ফোন রেখে দিয়ে ছটফট করতে লাগল। বাবার ঘর থেকে মোল্লার চীৎকার, জুলেখার বেদনাকাতর আর্তনাদ এবং একটু পর পরই চাঁদনীর কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠের হুংকার শোনা যাচ্ছে। মোল্লা তার বেত চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘর থেকেও বেতের আঘাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জিনিয়া। মালেক পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে। সে চারদিকে তাকাল যদি আক্রমণ করবার মত কিছু পাওয়া যায়। কলম, হ্যাঙ্গার, বই ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। তার পর হঠাৎ মাথায় এলো রান্নাঘরে অনেক সব্জী কাটার ছুরি আছে। সে একরকম ছুটে নীচে চলে এল। রান্নাঘরে কোথায় কি থাকে মোটামুটি জেনে গেছে সে। একটা ড্রয়ারে নানা সাইজের ছুরি রাখা আছে। সে মাঝারী সাইজের ধারালো একটা ছুরি হাতে তুলে নিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে জুলেখার উপর এই নির্যাতন সহ্য করতে পারবে না। রহমত চাচা এবং বাবা কেন মোল্লাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দিচ্ছে সে জানে না, কিন্তু জুলেখাকে রক্ষা করবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো সে। মিজানের ঘরে চলে এলো। ভেতরে ঢুকতে দেখল মোল্লা বেত হাতে জুলেখার উপর ঝুঁকে পড়েছে। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে কথা বলছে। "এবার তোর হাতে মারব। এখনও বলছি, ভালোয় ভালোয় যা। আমার হাত থেকে আজ তোর রক্ষা নাই।"

জুলেখার কান্না ভেজা কণ্ঠ শোনা গেল। "আমাকে আর মারবেন না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বাঁচান আপনারা।"
মিজান নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কিন্তু এগিয়ে যাবার তার সাহস নেই। মোল্লা গর্জে উঠল, "বাইর হ, হারামজাদী। নইলে তোর জমিনকে আমি শেষ করে দেব। সেটাই তুই চাস, ঠিক কিনা?"
মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বর পালটে গেল জুলেখার। তার মুখে বীভৎস হিংস্রতা ফুটে উঠল। মোল্লার কণ্ঠকে ছাপিয়ে গর্জে উঠল সে, "তুই বাঁচবি না। আমার জমিনের কিছু হলে তোদের সবাইকে আমি মারব।"
মোল্লা জুলেখার শরীরে ঠাস করে বেতের বাড়ি বসিয়ে দিল। চীৎকার করে ব্যাথায় ককিয়ে উঠল জুলেখা। জিনিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুরি হাতে এগিয়ে গেল মোল্লার দিকে। "সরে যান। সরে যান, বলছি। ওর গায়ে আর একবারও যদি মেরেছেন তাহলে আমিও আপনাকে ছুরি মারব।"
উদ্দত ছুরি দেখে মোল্লা দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। জিনিয়া বিছানার সামনে ছুরি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মোল্লা সতর্ক গলায় বলল, "এটা ঐ চাঁদনীর কাজ। সহজ, সরল মানুষদেরকে ও সহজেই ভুলিয়ে ফেলতে পারে। ওনাকেও ভুলিয়েছে। রহমত ভাই, ওনাকে তাড়াতাড়ি সরান, নইলে চাঁদনী এরপর কি করে বসবে কে জানে।"
রহমত এগিয়ে এল। "মা, ভুল করিস না। এই সবই চাঁদনীর খেলা। ও জুলেখার গলায় কথা বলছে। জানে, জুলেখার গলা শুনলে তোর মন নরম হবে। আমার কথা বুঝতে পারছিস?"
জিনিয়া মাথা নাড়ল। "না, বুঝতে পারছি না। এইসব আমার ভালো লাগছে না। দরকার হয় তাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। ওঝায় হবে না। তোমরা সবাই চলে যাও।"
জুলেখা করুন ফলায় বলে উঠল, "আমাকে বাঁচাও, জিনিয়া। ঐ লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে বাঁচাও!"
মিজান ক্লান্ত গলায় বলল, "এটাতো জুলেখারই গলা। এটা তো চাঁদনী না। জিনিয়া তো ঠিকই বলেছে।"
মোল্লা কঠিন গলায় বলল, "আপনিও ঐ শয়তানীর ফাঁদে পা দিয়েছেন? এই সবই ওর ছলনা। আমাকে আর একটু সময় দিন। আমি ওকে বের করে ছাড়বই। ওর প্রেমিক আমার হাতে। জ্যোৎস্নায় ও দূর্বল। এই সুযোগ হেলায় ফেলায় হারিয়ে গেলে বিশাল একটা ভুল হবে। দয়া করে ওনাকে সরতে বলুন। বিশ্বাস করুন, এটা আমাদের সবার নিরাপত্তার ব্যাপার। সুযোগ পেলে ও আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে।"
সদর দরজায় আচমকা কলিং বেল বেজে উঠল। জিনিয়া চমকে উঠে বলল, "ভাইয়া এসে গেছে। বাবা, দরজা খুলে দাও।"
মিজান দ্বিধা করছে দেখে সে নিজেই ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু পর মহূর্তে থমকে দাঁড়াল। জুলেখাকে একা ফেলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ইতিমধ্যে ওদেরকে চমকে দিয়ে আবার তারস্বরে বেজে উঠল কলিং বেল। বাজতেই থাকল। মোল্লা জিনিয়ার ইতস্ততভার সুযোগ

নিল। দু' পা সামনে এগিয়ে এসে চটাস করে জিনিয়ার ছুরি ধরা হাতে সে বেত দিয়ে জোরে একটা বাড়ি দিল। ব্যাথায় ককিয়ে উঠল জিনিয়া। তার হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে পড়ে গেল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মোল্লা। রহমত এগিয়ে আসছিল জিনিয়াকে ধরার জন্য কিন্তু জিনিয়া শরীর বাঁকিয়ে তার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল। দরজাটা খোলা দরকার। মালেককে দরকার। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে দরজা খুলল। ছিটকে ভেতরে ঢুকল মালেক। তার ঠিক পেছনেই মাইক।

মালেক সংক্ষেপে বলল, "মাইককে খবর দিয়েছিলি নাকি? ও দেখি ড্রাইভয়েতে গাড়ী রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জুলেখা কোথায়? উপরে, বাবার ঘরে? মাইক, আমার সাথে এসো।"

জিনিয়াকে পেছনে ফেলে দু' জনে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উপরে উঠে গেল। জিনিয়া দরজাটা বন্ধ করে ওদের পিছু নিল। মাইকের হঠাৎ এই সময়ে এখানে আসার ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। যতদূর জানে মিজান তাকে আজ আসতে বলে নি। তবে কি সত্যি সত্যিই চাঁদনীর কোন ক্ষমতা আছে। মিজানের কাছে শুনেছে চাঁদনী একবার মাইকের জীবন বাঁচিয়েছিল। তখনই কি মাইকের সাথে তার একটা যোগাযোগ তৈরী হয়? সেটা কি সম্ভব? মাইক হয়ত এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছে মিজানের সাথে দেখা করে যাবে।

ওরা মিজানের ঘরে এসে ঢুকতে সেখানে এলাহী কান্ড ঘটে গেল। মালেক মোল্লাকে বেত হাতে জুলেখার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোল্লা মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে গেল। তার শরীরের উপর চড়াও হয়ে মুখে ধাঁই ধাঁই করে কয়েকটা ঘুষি চালাল মালেক, মোল্লার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল। রহমত মোল্লাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসছিল, মাঝপথে মাইক তাকে থামিয়ে দিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা দিল। বেসামাল হয়ে পেছনে কয়েক পা গিয়ে মেঝেতে ধপাস করে পড়ল রহমত। মিজান জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বিড়বিড়িয়ে বলল, "মাইক এখানে কি করছে? তুই ডেকেছিলি? "

জিনিয়া মাথা নাড়ল। মাইক মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা লক্ষ্য করেছে। নীচু হয়ে সেটাকে তুলে নিল সে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জুলেখার বাঁধন কাটতে শুরু করল। মালেক মোল্লাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাইকের সাথে হাত লাগাল সে। তাকে দেখেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জুলেখা। "মালেক, তুমি এসেছ! ঐ লোকটা আমাকে মারছিল। আমি কিচ্ছু করিনি। বিশ্বাস কর।"

জুলেখাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিছানা থেকে নীচে নামতে সাহায্য করল মালেক। নরম গলায় বলল, "আমি এসে গেছি। আর কোন চিন্তা নেই। কেউ তোমাকে আর ব্যাথা দেবে না।"

মোল্লা মুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। সে কাতর গলায় বলল, "আপনি কত বড় ভুল করছেন আপনার কোন ধারনা নেই। জুলেখার ভেতরে একটা ডাকিনী বাস করে। ওকে নিয়ে যাবেন না...প্লিজ!"

রহমতও উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যোগ করল, "বাবা মালেক, তুমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানো না..."

মালেক রাগী গলায় বলল, "জিনিয়ার মুখে সব শুনেছি। এই সব ভৌতিক কেচ্ছা আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? ওর যদি মানসিক অসুবিধা থাকে ও মানসিক ডাক্তারের কাছে যাবে। এই সব ঝাড় ফুঁক চলবে না। ঐ লোকটাকে এক্ষুনী চলে যেতে বলেন। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।"

মালেকের শরীরে ভর দিয়ে খাট থেকে নেমে এলো জুলেখা। তার শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। গালে স্পষ্ট শুকনো অশ্রুর দাগ। অনেকক্ষণ একইভাবে শুয়ে থাকায় তার হাত পা দূর্বল বোধ হচ্ছে। পড়ে যাচ্ছিল। মালেক তাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল। জিনিয়া আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিল। মুহূর্তে চাঁদের রুপালী আলো ছাপিয়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে চারদিক প্লাবিত হয়ে গেল। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জুলেখা। তার আচমকা পরিবর্তন মালেক খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু মোল্লা করল। সে চীৎকার করে উঠল, "অনেক ভুল করলেন। এবার সবাইকে ভুলের মাশুল দিতে হবে।"

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই জুলেখা একটা অভাবনীয় কাজ করল। সে এক হাতের আলতো ধাক্কায় মালেককে ফুট দশেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। তার সারা মুখে ক্ষনিক আগের সেই করুন ভাবের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে ভয়ানক হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। দুই চোখে প্রতিশোধের আগুন। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, "এবার কোথায় যাবি তুই?"

মোল্লার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু সে জানে তার কাছে তুরুপের তাস আছে। প্রচন্ড রেগে থাকলেও ঝট করে তার কোন ক্ষতি চাঁদনী করবে না। মোল্লার হাতে বন্দী হয়ে আছে জমিন। মোল্লা বুক টান টান করে দাঁড়াল। "আমার কিছু হলে তোর জমিনকে তুই কোন দিন পাবি না।"

প্রচন্ড রাগে ফুঁসছে চাঁদনী, চাপা গর্জনের শব্দে যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে ঘরটা, দুই চোখে উপচে পড়ছে ঘৃণা আর ক্রোধ। কিন্তু ঝট করে মোল্লাকে আক্রমণ করল না সে। হাতের কাছে একটা চেয়ার পেয়ে সেটাকে উঁচুতে তুলে প্রচন্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল চেয়ারটা। আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠল মেঝে। এক পা এক পা করে এগিয়ে মোল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মোল্লা বেপরোয়ার মত তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠোঁটের ফাকে বিদ্রুপের হাসি। "মার! মার আমাকে! তোর জমিনকে সাথে নিয়ে মরব আমি। তখন কেঁদে কেঁদে মরবি তুই। হাঃ হাঃ হাঃ..."

দুই হাতে মোল্লার কাঁধ চেপে ধরল চাঁদনী, মোল্লার মাংশের মধ্যে তার নখ ডেবে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন যে কোন মুহূর্তে হাড্ডি গুড্ডি গুড়িয়ে ফেলবে। গর্জে উঠল সে, "ছেড়ে দে জমিনকে। ছেড়ে দে।"

"তুই জুলেখাকে ছাড় আগে," মোল্লা এই অবস্থাতেও সাহস বজায় রেখে চিৎকার করে পালটা দাবী করে।

রাগে এবং হতাশায় ধাক্কা দিয়ে মোল্লাকে পেছনে ছুড়ে দেয় চাঁদনী। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেও ঝট করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায় মোল্লা। তার মুখে তুবড়ির মত ছুটছে কোরানের বাণী। আবার চাঁদনীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে হুঙ্কার দিল, "থাম! তোর জমিনের সাথে কথা বল। জমিন! বোঝা ওকে। ওর মাথার ঠিক নেই এখন।"

রাগে ফুসতে ফুঁসতে মোল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চাঁদনী, মোল্লাকে আঘাত করবার জন্য আবার হাত তুলেছিল। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে মোল্লা খুব শান্ত, স্থির এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কণ্ঠে কথা বলে উঠল, "চাঁদনী! ভালো আছিস তুই? কত দিন পরে দেখলাম তোকে!"

চাঁদনী পাথরের মত জমে গেল। তার উদ্যত হাতজোড়া শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল। মুখের ভাবে একটু আগের ক্রুদ্ধতা মুছে গিয়ে সেখানে অবিশ্বাস এবং মমতার এক দুর্বোধ্য ছায়া পড়ল। সে ফিসফিসিয়ে বলল, "জমিন! এটা কি সত্যিই তুমি?"

জমিন মৃদু হাসল, "আমাকে চিনতে পারছিস না? এই কটা বছরেই ভুলে গেলি?"

চাঁদনী আরেক পা এগিয়ে গেল। "ভুলে গেছি? কি বলছ তুমি? তোমার জন্য আমি কি না করেছি?"

জমিন বলল, "আমি সব জানি। মোল্লা আমাকে বলেছে।"

"তোমার কি অনেক কষ্ট হয়েছে? মোল্লা কি তোমাকে অনেক যন্ত্রনা দিয়েছে?" চাঁদনীর কণ্ঠে বেদনা, দৃষ্টি টলমল।

"খুব একা আমিরে," জমিনের কণ্ঠে বেদনার ছায়া। "আমাকে কোথায় যেন আটকে রেখেছে। না পারি পালাতে, না পারি থাকতে। চারদিকে শুধু শূন্যতা। আর পারছি না। আমাকে বাঁচা তুই। আবার আমরা জ্যোৎস্নায় ছুটা ছুটি করে খেলব। মনে আছে, জামালপুরে, চাঁদনী রাত গুলোতে কত আনন্দে কাটত আমাদের।"

আবেগে থর থর করে কাঁপছে চাঁদনী। "ঐ দিনগুলো আবার কি ফিরে পাব আমরা? বাশারকে ওরা মেরে ফেলল। তোমাকে এই শয়তানটা বন্দী করল। আমাদের দুইটা জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিল।"

এক লহমার মধ্যে পরিস্থিতি আবার পালটে গেল। মোল্লা চাঁদনীর দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ সামনে এক পা বাড়িয়ে ডান হাত দিয়ে তার গলা শরীরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল। শ্বাস নেবার জন্য হাস ফাঁস করছে চাঁদনী। তার মুখ দিয়ে গোঙ্গানীর মত শব্দ বের হচ্ছে। মোল্লা রহমতকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলল, "ডাক টেপটা নিয়ে আসেন। জলদি ওর হাত পা বাঁধেন। সময় নষ্ট করবেন না। ওকে কতক্ষন ধরে রাখতে পারব জানি না।"

রহমত ডাক টেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, মাইক তার মুখে সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। ছিটকে মেঝেতে গিয়ে পড়ল রহমত, যন্ত্রনায় ককাতে লাগল।

মিজান দিশেহারা হয়ে বলল, "মাইক, কি করছ? মোল্লাকে সাহায্য কর, প্লিজ"

জুলেখার শরীরটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন নেতিয়ে পড়ছে। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে শব্দ হচ্ছে। দুর্বল দুই হাত দিয়ে মোল্লার শক্তিশালী হাতটাকে তার শ্বাসনালী থেকে সরানোর ব্যার্থ চেষ্টা করছে সে।

জিনিয়া চীৎকার করে বলল, "ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ওকে মেরে ফেলবে তো!"
মোল্লা চীৎকার করে বলল, "মরবে না। ওকে না থামালে ও আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে। মিজান সাহেব, ডাক টেপ দেন।"
জিনিয়া মালেকের দিকে তাকাল। সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, যেন এই সবের কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। ভাইয়ের পিঠে জোরে একটা ধাক্কা দিল জিনিয়া। "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না, ভাইয়া! ওকে বাঁচা!"
মালেকের যেন হঠাৎ করে হুশ ফিরে এলো। সে দ্রুত পায়ে মোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। তার ঠিক পেছনেই মাইক। মালেক পেছন থেকে মোল্লার গলা চেপে ধরল। "ছাড়েন ওকে!"
মোল্লা তাকে লক্ষ্য করে সজোরে কনুই চালাল। পাজরের নীচে আঘাত খেয়ে ব্যাথায় ককিয়ে উঠল মালেক। মোল্লার গলা থেকে তার হাত খসে পড়ল। কিন্তু মাইককে সামাল দিতে পারল না মোল্লা। ধাই করে তার পিঠের উপর পর পর দুইটা ঘুষি বসাল মাইক। দম বন্ধ হয়ে এলো মোল্লার। জুলেখার গলা থেকে তার হাত সরে এলো। পিঠ চেপে ধরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে মোল্লা। মাইক এক হাতে তাকে পেছনে টেনে এনে তলপেটে আরেকটা ঘুষি বসাল। কোঁত করে একটা শব্দ করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল এবার মোল্লা, ব্যাথায় গুঙিয়ে উঠল।
মোল্লার ফাঁস থেকে ছাড়া পেয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল জুলেখা, মালেক লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। হাপরের মত শ্বাস নিচ্ছে জুলেখা, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জিনিয়া ছুটে এলো। "জুলেখা ঠিক আছে তো?"
মালেক বলল, "হ্যাঁ। শ্বাস নিচ্ছে। বেঁচে আছে!"
জিনিয়া বলল, "বিছানায় শুইয়ে দাও ওকে।"
মালেক জুলেখাকে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথেই শরীর ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জুলেখা। ঝটকা মেরে মালেকের হাত সরিয়ে দিল। তার চোখে মুখে আবার রুক্ষতা এবং কণ্ঠে কর্কশতা ফিরে এল। জান্তব ক্রোধে গর গর করে উঠল সে, "মোল্লা! কি ভেবেছিলি তুই? আমাকে ভুলিয়ে বন্দী করবি? আমার জমিনকে ফিরিয়ে দে নইলে মর।"
মোল্লা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার তার দু' চোখে ভয়। চাঁদনীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক বারে কয়েক ধাপ করে সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে যাচ্ছে। চাঁদনী তার পিছু নিল। জিনিয়া চীৎকার করে বলল, "ভাইয়া, ওর সাথে যাও। ও তোমার কথা শুনবে।"
মালেক অনেকটা যন্ত্রের মত চাঁদনীর পিছু নিল। তার সংগ নিল মাইক। মিজান হাত বাড়িয়ে ছেলেকে থামানোর চেষ্টা করল। "তুই যাস না বাব! এসব আধি ভৌতিক ব্যাপারে নিজেকে জড়াস না।"
মালেক বাবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মিজান মাইককে লক্ষ্য করে বলল, "ওকে থামাও মাইক। ওর ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"
মাইক নিস্পৃহ দৃষ্টিতে মিজানের দিকে তাকাল। তারপর তার মুখ বরাবর একটা ঘুষি হাকাল। মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখল মিজান। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল,

মুখে গরম কিছুর ছোঁয়া। মুখ বেয়ে পানির মত গড়িয়ে নামছে রক্ত! তার বোধহয় নাক ভেঙে গেছে। কিছু চিন্তা করতে পারছে না সে। রহমত এবং জিনিয়া দৌড়ে এল তার দিকে। মাইক নির্বিকার মুখে মালেকের পিছু পিছু চলে গেল।
রহমত মিজানের মুখে একটা তোয়ালে চেপে ধরল। "উঠে বয়। রক্ত পড়া থেমে যাবে। মাইকের কিছু একটা হয়েছে। মনে হয় চাঁদনী ওর উপরেও আছর করেছে।"

মিজানের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। সে গুঙিয়ে উঠল, "মালেককে ধর। ওর মাথার ঠিক নেই এখন।"

জিনিয়া ইতস্তত করে বলল, "ভাইয়া জুলেখাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, বাবা। ওরা দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে!"
মিজান ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। বিড়বিড়িয়ে বলল, "কি বলছিস?"
জিনিয়া রহমতের হাতে মিজানকে ছেড়ে দিয়ে নীচে ছুটল। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নীচে নামতে গিয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ল। ব্যাথায় কাতরে উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়িয়ে সদর দরজা দিয়ে ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই চোখে পড়ল মাইক। ড্রাইভওয়ের ঠিক মাঝখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার দিকে তাকাতে মুহূর্তের জন্য মালেকের গাড়ীটাকে ভীষন জোরে ছুটে যেতে দেখল জিনিয়া। মোল্লার গাড়ীটা নেই। সে নিশ্চয় ভেগে গেছে। ধারনা করল মোল্লার পিছু নিয়েছে মালেক এবং চাঁদনী। দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে ড্রাইভওয়ের উপর ধপাস করে বসে পড়ল জিনিয়া। তার নিজেকে পাগল পাগল লাগছে। ঘটনা এমন একটা অদ্ভুত দিকে মোড় নেবে সে ঘুনাক্ষরেও ভাবে নি। মাইক এখনও বোকার মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
জিনিয়া ডাকল, "মাইক!"
মাইক ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে ফিরল। "কি জিনিয়া?"
"ভাইয়া গেছে ওর সাথে?"

মাথা দোলাল মাইক। "হ্যাঁ। জুলেখা বলল, গাড়িতে ওঠ। মালেক উঠল। তারপর ঐ লোকটার পিছু নিয়ে চলে গেল।"
জিনিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বাবাকে মারলে কেন তুমি?"
বোকার মত মাথা নাড়ল মাইক। "মেরেছি? বলতে পারব না। একটু আগে কি হয়েছে আমার কিচ্ছু মনে আসছে না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত লাগছে।"

রহমত এবং মিজান খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে এসেছে। মিজান তার মুখের উপর তোয়ালেটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরে আছে। "কোথায় গেল ওরা?" রহমত জানতে চাইল।
মাইক আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা দেখাল। "মোল্লা আগে গেল। ওরা দু'জন পেছনে।"

জিনিয়া বলল, "বাবা, পুলিশে খবর দাও। আমার মন বলছে ভাইয়ার একটা বিপদ হতে পারে।"

রহমত ফোন বের করল। "আমি ফোন করছি। জিনিয়া, তোমার বাবাকে নিয়ে এমারজেন্সীতে যেতে হবে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।"
ওরা সবাই জিনিয়ার গাড়ীতে উঠল। গাড়ী চালিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালের দিকে রওনা দিল জিনিয়া। রহমত গাড়ীতে উঠে পুলিশে ফোন দিল। তাদেরকে এমারজেন্সীতে আসতে অনুরোধ করল। জিনিয়া মালেকের সেল ফোনে ফোন করল। ফোন বাজছে। কেউ ধরল না।

বাইশ

ঠিক কতক্ষন গাড়ী চালিয়েছে খেয়াল নেই মালেকের। মোল্লার পেছন পেছন অন্ধের মত জুলেখার নির্দেশে গাড়ী ছুটিয়ে দিয়েছিল সে। মোল্লা হাইওয়ে ৪০১ এ উঠল, পশ্চিম মুখে, মন্ট্রিয়লের দিকে। পাগলের মত গাড়ি চালাচ্ছিল মোল্লা। স্পিড লিমিটের অনেক উপরে। মালেক সাবধানী ড্রাইভার। ক্লিন রেকর্ড। কিন্তু জুলেখা যখন তার দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, "ওকে ধর। জোরে চালাও" তখন সে সম্মোহিতের মত তার নির্দেশ মেনে নিয়ে গাড়ীর গতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন্টায় এক শ' পঞ্চাশ কিলোমিটারের উপর গতি উঠে গেল ওর। সে জানে ধরা পড়লে পুলিশ গাড়ী সহ তাকে জেলে নিয়ে তুলবে। কিন্তু জুলেখার নির্দেশ সে অমান্য করতে পারল না। জুলেখা নাকি চাঁদনী? তার মাথা আদৌ কাজ করছে না। ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারে তার আদৌ বিশ্বাস নেই। সুতরাং মোল্লার কর্মকার্য তার কাছে সম্পুর্ণ বানোয়াট মনে হয়েছে। কিন্তু জুলেখার মধ্যে যে তার দেখা নরম-সরম, মায়াবতী মেয়েটা ছাড়াও আরেকটা কঠিন, রাগী এবং মারমুখি সত্বা আছে, সে ব্যাপারে তার সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সত্বা থেকে জুলেখাকে কি করে রক্ষা করা যায়? সাইকিয়াট্রিস্টরা কি ওকে সাহায্য করতে পারবে না?
এতক্ষন নিঃশব্দে গাড়ী চালিয়েছে মালেক। তার পাশে বসে বেশ কিছুক্ষন আপন মনে গজরিয়েছে জুলেখা, তার অস্বাভাবিক কর্কশ, উগ্র কণ্ঠে। মোল্লাকে পেলে সে ছিড়ে ফেলবে। জমিনকে না ছাড়লে মোল্লার বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই। তারপর নীচু গলায় কিছুক্ষন কাঁদল। মালেক কি বলবে বুঝতে পারে নি। যে মেয়েটি তার পাশে বসে আছে, তাকে সে চেনে না। তার সাথে বলার মত কোন কথা তার নেই। সে আশায় আশায় আছে, হয়ত রাগ পড়ে গেলে জুলেখার আসল সত্বা বেরিয়ে আসবে।
ব্রকভিল পেরিয়ে গেল ওরা। মাঝারী আকারের একটা শহর। রাস্তায় এখনও অনেক গাড়ী। ৪০১ ব্যাস্ত হাইওয়ে। মোল্লা সামনেই কোথাও আছে। কতখানি এগিয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কে জানে এদিকে কোথায় চলেছে সে? মালেক কোন বিপদে পড়বে নাতো?

গাড়ীর স্পিডোমিটারে চোখ গেল মালেকের। একশ ষাট। এদিকটাতে রাস্তায় হাইওয়ে পেট্রল কম। ধরা খাবার সম্ভাবনা কম। মোল্লা খুব সম্ভবত আরোও জোরে চালাচ্ছে কারণ তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে। দূর থেকে কোন পেট্রল কার দেখলে স্পীড কমিয়ে দেবে। অনেক সময় পুলিশ লুকিয়ে থাকে। প্রায় মিনিট পনের বিশ কোন কথা কিংবা শব্দ করে নি জুলেখা। তার দিকে ঝট করে একবার তাকাল মালেক। খুব শান্ত মুখে নিজের আসনে বসে সোজা সামনের অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। "জুলেখা!" সে আস্তে আস্তে ডাকল।

"হু," জুলেখা মৃদু গলায় উত্তর দিল। "ভয় পেও না। আমি জুলেখা।"

"চাঁদনী কোথায়?" দ্বিধা ভরে জানতে চাইল মালেক।

"আছে, আমার সাথেই আছে। এখন চুপচাপ আছে। ইচ্ছে হলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল জুলেখা। "আমার শরীর, মন আর আমার নিয়ন্ত্রনে নেই। চাঁদনী সব দখল করে নিয়েছে। চাইলেও ওকে আমি থামাতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মধ্যে যেন দুইটা মানুষ বাস করছে। দু' জন সম্পূর্ণ দুই রকম। শুধু একটা মিল আছে। আমরা দু জনাই খুব রোমান্টিক।"

"ঠিক বলেছিস!" একটা কর্কশ কণ্ঠ হঠাৎ কথা বলে উঠল। চমকে উঠল মালেক। চাঁদনীর গলা।

"এখন আমি কথা বলছি। তুই চুপ কর," জুলেখা চাঁপা গলায় বলে, তার স্বাভাবিক, সুললিত কণ্ঠস্বরে।

মালেকের শরীর ছমছম করে ওঠে। অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে একটি মানুষের শরীর থেকে দুটি অস্তিত্বের এই কথপকথন তার কাছে অজাগতীয় মনে হচ্ছে।

মালেক ফিসফিস করে বলল, "জুলেখা, আমি কি থামব? এভাবে আর কতক্ষণ যাবো?"

উৎকট গলায় ধমকে উঠল চাঁদনী, "চুপ করে গাড়ী চালা! মোল্লাকে ধরতে না পারলে তোর ঘাড় ভাঙব আমি।"

জুলেখা তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করল, "খবর্দার ওর গায়ে হাত দিবি না তুই!"

চাঁদনী গর গর করে উঠল। "শুধু নিজের কথা ভাবছিস? আমার জমিনের কি হবে? ঐ শয়তানটার হাত থেকে ওকে আমার বাঁচাতেই হবে।"

জুলেখা চাঁপা স্বরে বলল, "জমিন!জমিন!জমিন! তোর জন্য আমার জীবনটা শেষ হল। তোর জন্য বাশার মরল। আমার বাবা মা কে মারলি। আমার সংসার ভাঙল। একটা বুড়া মানুষকে বিয়ে করলাম। আর কত জ্বালাবি তুই আমাকে?"

এবার গর্জে উঠল চাঁদনী, "সব ভুলে গেছিস তুই? মনে আছে, ছোট বেলায় তোকে সবাই বলত পাগলী। একা একা ঘুরে বেড়াতিস। তোকে দেখলে সবাই হাসত। তখন আমি তোর বন্ধু হয়েছিলাম। আমি তোর সাথে খেলতাম, গাছে চড়তাম, সাঁতার কাটতাম, মাছ ধরতাম। কেউ তোকে খারাপ কিছু বললে তাকে ধরে এমন পেটাতাম যে ভয়ে কেউ তোর কাছে পর্যন্ত আসত না। ভুলে গেছিস সব?"

জুলেখার গলাও চড়ল এবার। "তুই ভুলে যাস না সারাজীবন ধরে তুই যা চেয়েছিস তাইই হয়েছে। বাশারের সাথে আমার কিচ্ছু ছিল না, তারপরও তোর জমিনের জন্য তার সাথে

দিনের পর দিন চাঁদনী রাতে বনে জঙ্গলে গিয়ে অভিসার করেছি। সারা গ্রামের মানুষ জেনে গেল। আমার বাবা মায়ের কত অপমান হয়েছিল তুই জানিস?"
চাঁদনী চীৎকার করে বলল, "জমিনকে ঐ শয়তানটার হাতে কারা তুলে দিয়েছিল? কি দোষ ছিল ওর? আমাকে ভালোবেসেছিল?"

জুলেখার গলায় রাগ এবং ক্ষোভ। "সেই জন্য তুই তো তাদের শাস্তি দিয়েছিস। জীবন দিয়ে তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তারা। তোর জমিন তো বেঁচে আছে। অথচ জমিনের জন্য বাশার নামের একটা সরল ছেলের জীবন শেষ হয়েছে। তার জন্য তোর একটু খারাপ লাগে না?"
দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল চাঁদনী, "তোর মত এতো দরদী প্রাণ না আমার। আমি পাষান, আমি স্বার্থপর। হয়েছে এবার? আমার ভালোবাসার লোকটাকে আমার চাই। নইলে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেব না।"
জুলেখা ফোঁস করে উঠল, "চাই না তোকে আর আমি। যা, চলে যা। আমার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়েছিস তুই। আর না। বের হয়ে যা।"
চাঁদনী খেঁকিয়ে উঠল, "এখন তোর দরকার নেই বলে আমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিবি আর আমি চলে যাব? কোথাও যাব না। কি করবি তুই? তোর ক্ষমতা আছে আমাকে তাড়ানোর?"
জুলেখার কণ্ঠে এবার রাগের চেয়ে কাকুতি ঝরে পড়ে। "চাঁদনী, বন্ধ কর এই পাগলামি। ভুলে যা জমিনকে। চল, বাড়ী ফিরে যাই। মালেকের কোন ক্ষতি হলে আমি তোকে ছাড়ব না।"
মালেকের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর গলায় হুংকার দিল চাঁদনী, "গাড়ী যদি থামে, তুই মরবি। মোল্লাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যত দিনই লাগুক।"
জুলেখা কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ থেকে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "চাঁদনী, তুই আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিস।"
তাকে ভ্যাংচাল চাঁদনী। "তোর ধৈর্যের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমার উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। চুপ করে থাক।"
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল জুলেখা। একটা হাত রাখল মালেকের হাতে। "এই কটা দিনেই তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমাকে ভুলে যেও না।"

মালেক জুলেখার দিকে তাকাল। "জুলেখা, আশা ছেড় না। চাঁদনীকে তুমি হারাতে পারবে। আমি আছি তোমার পাশে।"

মাথা নাড়ল জুলেখা। "পারব না। ওর অনেক ক্ষমতা। আমার সাধ্য নেই ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার। জমিন মুক্তি পেলেও চাঁদনী আমাকে ছেড়ে যাবে না।"
সামনেই একটা বাঁক। পর পর বেশ কয়েকটা ট্রাক আসছে উলটো দিক থেকে। রাস্তায় চোখ রাখল মালেক। এতো গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে, সামান্য মনযোগ হারালে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া খুবই সম্ভব।

ঘটনাটা ঘটল এক লহমার মধ্যে। এমন কিছু ঘটতে পারে কল্পনাতেও ভাবে নি মালেক। হঠাৎ তার গালে এক ঝলক বাতাসের ঝটকা লাগতে পাশ ফিরে জুলেখার দিকে তাকাল সে, বিস্ফোরিত চোখ মেলে দেখল নিজের বেল্ট খুলে ফেলেছে জুলেখা; দরজা খুলে চোখের পলকে গাড়ির বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গেল মালেক, এক হাত বাড়িয়ে জুলেখাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করল, পারল না। তার গাড়ী ভারসাম্য হারিয়ে বিপরীত দিকে থেকে এগিয়ে আসা একটা ট্রাকের শরীর লক্ষ্য করে ছুটে গেল। ট্রাকের মাঝবয়েসী, মহিলা ড্রাইভার চেষ্টা করল সংঘর্ষ এড়ানোর কিন্তু লাভ হল না। প্রচন্ড জোরে ট্রাকের শরীরে আছড়ে পড়ল মালেকের গাড়ীটা, পরমুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার পাশের অগভীর খাদে ছিটকে পড়ল। এয়ারব্যাগটা খুলে গিয়ে মালেকের মাথাটাকে গুড়িয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেও ধাক্কায় ইঞ্জিনের একটা অংশ সামনে এগিয়ে এসে তার পায়ের নিম্নাংশের হাড় ভেঙে দিল। জ্ঞান হারাল সে।

ট্রাক ড্রাইভার কড়া ব্রেক কষে ট্রাকটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হল। লাফিয়ে নীচে নেমে এলো সে। দলা মলা পাকানো ধাতব গাড়ির ধ্বংশাবশেষ দেখেই সে বুঝল গাড়ীর যাত্রীদের জীবনের আশংকা আছে। সাথে সাথে পুলিশে ফোন করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রথম পুলিশের গাড়ী এসে হাজির হল। পরবর্তি পনের মিনিটের মধ্যে আরোও তিনটি পুলিশের গাড়ী এবং দুটি ফায়ার ট্রাক এসে গেল। রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হল দু'দিকেই। গাড়ীর ছাদ কেটে সংজ্ঞাহীন মালেককে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় ঘন্টা খানেক পর দুর্ঘটনার স্থান ভালো করে পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে একজন পুলিশ কনেষ্টবল আবিষ্কার করল একটি তরুণী মেয়ের মৃত দেহ। দুর্ঘটনার স্থান থেকে প্রায় তিন শ গজ দূরে।

মিজান তার লিভিংরুমে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এক পাশে বসে আছে রহমত, অন্য পাশে জিনিয়া। তাদের মুখোমুখি সোফায় বসে আছে বেশ লম্বা, সুট প্যান্ট পরিহিত একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। তার নাম পিটার হাওয়ার্ড। সে স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। তার হাতে একটা নোটবুক এবং কলম। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু তথ্য লিখে রাখছে সে।

"আপনার ছেলের অবস্থা এখন কেমন?" পিটার সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ভালো," মৃদু কণ্ঠে বলল মিজান। "ওর পায়ের অপারেশন হয়েছে। স্টেবল।"

"আমি গতকাল দেখতে গিয়েছিলাম," পিটার বলল। "খুবই দুঃখজনক। কিন্তু পুরো ঘটনাটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি বলছেন আপনার স্ত্রীর উপর ভুতের আছর ছিল। ব্যাক্তিগতভাবে আমি ওসবে বিশ্বাস করি না কিন্তু আপনাদের কথা যদি মেনেও নেই, আপনার স্ত্রীর এভাবে আপনার ছেলে মিস্টার মালেকের সাথে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না।"

জিনিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "ডিটেকটিভ, তোমাকে তো আমরা সবই বলেছি। মোল্লা যখন পালিয়ে যায়, জুলেখা তার পিছু নেয়। আমার ভাই জুলেখার পিছু নেয়। তারপর সে জুলেখাকে নিয়ে মোল্লাকে অনুসরণ করে। মাইকও তোমাকে একই কথা বলেছে।"

মাথা দোলাল পিটার। "তার কথার কতটুকু মূল্য আছে, সন্দেহ। সে তো অর্ধেক দিন মাতালই থাকে মনে হল। যাইহোক, সমস্যা হয়েছে, এই মোল্লা লোকটাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তার গাড়ীর লাইসেন্স নাম্বার তোমরা আমাকে দিতে পার নি। তার যে আমেরিকান ঠিকানা দিয়েছ সেটা একটা মসজিদের ফোন নাম্বার। ফোন করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। আবার চেষ্টা করব।"

রহমত বলল, "আমরা তোমাকে মিথ্যা বলছি না। ওখানে ফোন করেই আমি তার সাথে প্রথম যোগাযোগ করি। হোটেলে খবর নিলেই জানতে পারবে মোল্লা সেখানে দু রাত ছিল।"

পিটার সমঝদারের মত মাথা দোলাল। "খোঁজ নেব। আমার আসল চিন্তা হচ্ছে ওর নিরাপত্তা নিয়ে। তোমাদের কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আচ্ছা, পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে। পেয়ে যাব।"

রহমত বলল, "জুলেখার লাশ আমরা কবে পাব? তাকে কবর দিতে হবে।"

"পোস্ট মর্টেম হবে, তার পর পাবে। কয়েক দিন লাগতে পারে। আচ্ছা, মিসেস জুলেখাকে কি তোমরা ডক্টর এলানের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে?" পিটার জানতে চাইল।

মাথা দোলাল মিজান। "হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?"

পিটার নোট বই খুলল। "ফোন করেছিল। তোমাদের উচিৎ ছিল আমাকে আগেই জানান। যাই হোক, কাগজে খবরটা পড়ার পর সে নিজেই ফোন করে আমার খোঁজ করে। তার মুখেই শুনলাম, তোমার স্ত্রীর মানসিক অসুখ ছিল। ডি-আই-ডি, ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসর্ডার। তোমাদের উচিৎ ছিল আবার তার কাছে নিয়ে যাওয়া। এইসব ভুতের ওঝাদেরকে বিশ্বাস করাটা ঠিক নয়। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য সেই হয়ত দায়ী, যদিও গাড়ী থেকে তার লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। পোস্ট মর্টেম হলে আরো ভালো করে বোঝা যাবে।"

পিটার উঠে দাঁড়াল। "আমাকে যেতে হবে এখন। দয়া করে কয়েকটা দিন টরন্টো ছেড়ে কেউ বাইরে যেও না। আসি।"

রহমত গেল পিটারকে এগিয়ে দিতে। সে ফিরে আসতে জিনিয়া বলল, "মোল্লা কোথায় গেল?"

রহমত শ্রাগ করল। "জানি না। হয়ত আমেরিকা ফিরে গেছে। আমি ভাবছি, চাঁদনীর কি হল?"

জিনিয়া চাঁপা গলায় বলল, "জুলেখার সাথে সেও কি মারা গেছে?"

রহমত মাথা নাড়ল। "বলার কোন উপায় নেই। কিন্তু মৃতদেহের মধ্যে তারা আছর করতে পারে না, যদি সে বেঁচেও গিয়ে থাকে, অন্য কোন জীবিত মানুষের শরীরকে বেছে নিয়েছে।"

মিজান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল। বিড়বিড়িয়ে বলল, "জুলেখার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। নিষ্পাপ একটা মেয়ে, এভাবে চলে গেল।"

জিনিয়া বাবার পিঠে আলতো করে হাত রেখে সান্তনা দেবার চেষ্টা করল। কিছু বলল না।

তেইশ

এক মাস পর।
মালেক হাসপাতাল থেকে তার বাবার বাসায় এসে উঠেছে। জিনিয়া সেখানেই ছিল। মিজানের এই অবস্থায় সে তাকে একা ফেলে চলে যেতে চায় নি। মালেকের দুটি পা-ই হাঁটুর নীচে ভেঙ্গে যায়। অপারেশন করে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে। অন্তত মাস খানেক বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে সে শুধু জুলেখার সাথে তার কয়েকটি অসম্ভব সুখময় দিনের কথা স্মরণ করে। কেউ সামনে না থাকলে নিঃশব্দ কাঁদে। জুলেখার গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যটা সে মানশ্চক্ষে বার বার দেখে। পাশে বসে থেকেও সে তাকে বাঁচাতে পার নি। এই অপরাধ বোধ থেকে সে কি করে পরিত্রাণ পাবে?

একটা চিঠি এলো মেইলে। উপরে লেখা 'মিজান পরিবার'। কোন ফিরতি ঠিকানা নেই। মিজান, মালেক এবং জিনিয়ার সামনে খাম খুলে চিঠিটা বের করল। তার কেন যেন মনে হয়েছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। একা একা খোলার সাহস হয় নি। সাদা পৃষ্ঠায় বল পেন দিয়ে লেখা কয়েকটা লাইন। নীচে বড় বড় করে লেখা 'চাঁদনী'। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়েও জিনিয়ার হাতে তুলে দিল মিজান। তার শরীর কাঁপছে। জুলেখা নেই কিন্তু সেই অভিশাপটা এখনও বেঁচে আছে। এই সম্ভাবনার কথা তাদের সবারই মনে হয়েছে কিন্তু কেউ বোধহয় ভাবে নি সেটাই সত্যি হয়ে যাবে। জিনিয়া জোরে জোরে পড়ল...

আমার নতুন বন্ধু হয়েছে বেটসি। বয়েসটা একটু বেশী কিন্তু ভীষণ সাহসী। বিশাল ট্রাক চালায়। জুলেখার মত নরম সরম না। জুলেখা এমন একটা কাজ করবে, চিন্তাও করি নি। বেটসিকে না পেলে সেই রাতে ওর সাথে আমারও সমাপ্তি হত। সেটাই চেয়েছিল জুলেখা। এতো বছরের বন্ধুত্ব! কে জানত এভাবে শেষ হবে। ওর কথা খুব মনে পড়ে। ও ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।
ভালো থেক তোমরা।

বিঃদ্রঃ মোল্লাকে খুঁজে পেয়েছি। জমিনকে সে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে কি করব জানি না। ভাবছি।

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল মিজান। "জুলেখা চলে গেল, আর শয়তানীটা বেঁচে গেল! ও কি আবার এখানে ফিরে আসতে পারে?"
জিনিয়া ভ্রু কুঁচকাল। "এখানে কেন আসবে? জমিনকে তো পেয়েই গেছে। মোল্লাকে নিয়ে কি করবে মনে হয়?"

মিজান কাঁধ ঝাঁকাল। "আল্লাই জানে। আমদের কি পুলিশে খবর দেয়া উচিৎ? কিন্তু কে এই বেটসি? চিঠিতে কোন ঠিকানাওতো নেই।"
মালেক গম্ভীর গলায় বলল, "যে ট্রাকটার সাথে আমার এক্সিডেন্ট হয়েছিল, তার ড্রাইভার ছিল বেটসি।"
মিজান এবিং জিনিয়া দু'জনাই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, যেন জানতে চাইছে, এখন তাদের কি করণীয়। মালেক চাঁপা স্বরে বলল, "ডিটেকটিভ পিটারকে একটা ফোন দাও। চিঠিটা হাতে পেলে যা করার সেই করবে।"
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল জিনিয়া। তাদেরকে চিঠি পাঠানোর কি দরকার ছিল চাঁদনীর? ডিটেকটিভ পিটারকে এই চিঠি দিলে সে বেটসিকে খুঁজে বের করবেই। যার অর্থ, চাঁদনীর হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই।